

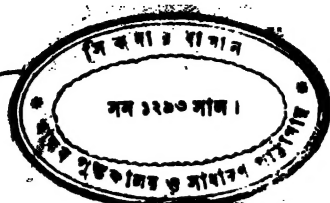




228.00  
21

— 21/10/2021

৫২০/২



২য় ভাগ।

১২৯৪ সাল

১ম খণ্ড।

## দ্বিতীয় বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল ; সুতরাং বেদবাসের জীবনেরও এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই একটি বৎসর আমরা যথান্যথা পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বেদবাসের সেবা করিয়াছি এবং তাহার জন্য আশাতিত ফলও পাইয়াছি। আমরা কখন ভাবি নাই, যে, বেদবাস এই একবৎসর মধ্যেই সাধারণ হিন্দু মতেরই এত আশ্রয়ের ধন হইবে। গতবৎসর যেরূপ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি তাহাতে আমাদের ভরসা আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এবং অন্যান্য নানা কারণে আমরা বেদবাসের উন্নতি সাধন পক্ষে কায়মনবাক্যে সম্যক চেষ্টা করিতে পারি নাই। শরীর পীড়িত হইলে, কার্যের যে নানা প্রকার গোলযোগ হওয়া সম্ভব, তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবেন। সুতরাং গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদের অনেক কৃতি হইয়াছে। আমরা সেজন্য গ্রাহক সমীপে সাহসনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঈশ্বর কৃপায় আমাদের স্থল দেহটা এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে ; সুতরাং, এবার যাহাতে বেদবাসের নানা বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতে পারি তাহার নিমিত্ত বিধিমত প্রকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কৃত সংকল্প হইয়া আমরা দ্বিতীয় বৎসরের কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। মনে অনেক শঙ্ক আছে। ভগ-



বানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা এই, যে, তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্ঠার সহায় হইয়া আমাদের ন্যায় দুর্বল মানবের আত্মার কল্যাণ সাধন করুন । জিতাপাকান্ত পাপীর ভগবানই একমাত্র ভরসা ।

আর একটি কথা । আমাদের একান্ত বাসনা, যে বেদব্যাস থানিকে যেন আমরা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের মুখপত্ররূপে পরিচয় দিতে সক্ষম হই । বঙ্গের অধ্যাপক কুল ভূষণ স্বরূপ মহাত্মাগণের শাস্ত্রীয় উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধাদি ও নানাবিধ শাস্ত্রীয় বিচারাদিতেই বেদব্যাসের কলেবর পুষ্ট হউক । এই অত্যাচ্ছ উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা কাৰ্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম । গত বৎসর আমরা কতক পরিমাণে কৃতকাৰ্য্যও হইয়াছি । কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই । দ্বিতীয় বৎসরে যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্যক প্রকারে ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য আমরা প্রাণপণে সচেষ্ট হইব ।

অধ্যাপক মহোদয়গণের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত প্রার্থনা' যে, তাঁহার কৃপা করিয়া বেদব্যাসকে আপনার করিয়া লউন, এবং আপনার জিনিষ ভাবিয়া বেকরূপ যত্ন ও চেষ্ঠা সম্ভব সেইরূপ যত্ন ও চেষ্ঠা প্রয়োগ করুন । তাহা হইলেই তাঁহাদের এই সমবেত চেষ্ঠার বেদব্যাসের দ্বারা সমাজের পরম মঙ্গল সংসাধিত হওয়া একান্ত সম্ভব ।

## সন্ধিপূজা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সৃষ্টি তত্ত্ব সর্বদা স্মরণ রাখিয়া যে ব্যক্তি জীব প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহার সেই অনুরাগ বিষয়ানুরাগ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না । উহা রাজস বা তামস অনুরাগ নহে, উহা সাত্বিক অনুরাগ । ইঞ্জিয়াদির ভোগ কামনা করিয়া, যে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষয়ানুরাগ বনিয়া নির্দিষ্ট । তাহাকেই রাজস বা তামস অনুরাগ বলে । সেই অনুরাগের দ্বারাই জীব বিষয়ের সহিত আবদ্ধ হইয়া অধোগত হয় । এবং সেই অনুরাগ জনিত কার্যের ভাল নম্নের নিমিত্ত তাহারই সম্পূর্ণ দায়িত্ব । আমার প্রতি আভাবিক অনুরাগকে সাত্বিক অনুরাগ বলে, এবং আমার আত্মা বা নিয়ম পরিপালন মনে করিয়া যে কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে তাহা ঐ সাত্বিক অনুরাগ মূলক, অথবা আমার অনুরাগ মূলক ; অতএব আমার প্রতি অনু-

রাগ মূলক, যে, জীব প্রাতি অনুরাগ তাহাও দাখিক অনুরাগের অন্তর্গত । কণ্ঠস্থ পিতা মাতার প্রতিঅনুরাগ বৃদ্ধি হইলে, যেমন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিও অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কার্য্যানুরাগ তাহাদের পিতৃ মাতৃ অনুরাগ মূলক বলিয়া, উহাও সেই পিতৃ মাতৃঅনুরাগের মধ্যে গণ্য, এ স্থলেও সেইরূপ আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলেই জীব প্রাতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার হ্রাস হইলেই উহারও হ্রাস হয় । অতএব আমার অনুরাগ মূলক যে জীব প্রাতি অনুরাগ তাহা আমার অনুরাগের মধ্যেই পরিগণিত । এজন্য ঐরূপ ভাবে যদি জীব প্রাতি অনুরক্তি হয় তদ্বারা আমার সহিতই ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে, আমার সহিত অভিসম্বন্ধ হইতে থাকে, কিন্তু বিদ্বের সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ হয় না ।

যাঁহারা হতভাগ্য তাহাদের মনে এই তত্ত্বস্থান পায় না । পশু পক্ষী, কীট, এবং উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে আমার সৃষ্টি ক্রিয়ার জলন্ত উদাহরণ সর্বদা দেখিয়াও তাহারা শিক্ষিত হয় না । তাহারা বিধাস করে এই, যে, তাহাদের ভোগের নিমিত্তই আমি জীব সৃষ্টি করিয়াছি, এবং জীব ভোগের নিমিত্তই পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছি, আর জীব পুরুষের পরস্পরানুরাগ বা প্রেমকেও ভোগের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া গণ্য করে । জীব পুরুষ সংযোগাদি ব্যাপারও এই ভাব হইতেই করিয়া থাকে ; স্ত্রতরাং অধোগত হইয়া নানা প্রকার কষ্টানুভব করে । এই বলিলাম জীব পুরুষের ব্যবহার নিয়ম, এখন পুত্র কন্যাদি রক্ষা এবং অন্যান্য গার্হস্থ্যানুষ্ঠানের নিয়ম বলিতেছি শুন ।

পিতা মাতার দ্বারা যে শিশু সন্তানের লালন পালনাদি কার্য্য হইয়া থাকে তাহাও আমারই পালন কার্য্যের অন্তর্গত । আমিই পৃথক পৃথক পিতামাতার দ্বারা পৃথক পৃথক শিশুর সংরক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকি । ভোলাদাস ! তুমি একবার পশু পতঙ্গাদির সন্তান প্রতিপালন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে । পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেই প্রাণপণে আপনাপন শিশু সন্তানের প্রতিপালন করে ; কিন্তু সন্তানের দ্বারা কোনরূপ প্রত্যাশকার বাসনায় তাহারা এরূপ করে না । পুত্র কন্যার দ্বারা যে পিতামাতার কোন উপকার হইতে পারে এজ্ঞানও তাহাদের নাহি, অথচ আপনি না থাইয়া শিশুকে খাওয়ায়, আপনি মরিয়াও শিশুকে বাঁচায় । ইহাকি উহাদের নিজের কার্য্য ? কখনই নহে । উহা আমার কার্য্য, আমি সর্বদাই সকলের রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা

করিতেছি, আমিই পিতামাতার দ্বারা এই শিশু শাবকগুলিকে, রক্ষা করিয়া থাকি। অবোধ এবং অসমর্থ শিশুর রক্ষার নিমিত্ত আমিই উহাদের পিতা মাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ মমতা জন্মাইয়া দিই। পরে যখন ঐ শিশু গুলি আপনা হইতেই আত্মরক্ষার সমর্থ হয়, তখন আমার সমর্পিত স্নেহ আবার আমিই তুলিয়া নীই। আবার আবশ্যক মতে আমিই প্রসবের পূর্বেই মমতার সঞ্চয় করিয়া দিই। সেইরূপ মহুযাগণ যে আপনাপন শিশু সন্তানকে লাগন পালন করে তাহাও আমারই পালন কার্য্য। আমিই, অবোধ অসমর্থ নিঃসহায় নিঃসম্বল-জীবের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত জননীর গর্ভে স্থান নির্মাণ করিয়াছি; প্রসবের পরেও সেই জড় পিণ্ডবৎ জীবের সংরক্ষণের নিমিত্ত তাহার পিতামাতার হৃদয়ে অতিশয় স্নেহ সঞ্চার করি, উহারা সেই স্নেহ মমতার বশবর্তী হইয়া শিশু সন্তানের সংরক্ষণে যত্ববান হয়। আমি মাতার দ্বারা উহার শারীরিক পরিচর্যা করাই, এবং পিতার দ্বারা উহার আহার ও শয্যাসন বসনাদিসংগ্রহের নিমিত্ত অর্থোপাঙ্গাদি কার্য্য করাইয়া থাকি। ক্রমে এই শিশুটি একটু সমর্থ হইলেই আবার আর একটি জন্মাইয়া থাকি। আবার তাহার নিমিত্ত পিতা মাতাকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করি, এইরূপে জীবের কৰ্ম্মচক্র চলিতে থাকে। ভোলাদাস! আমার এই পালন কার্য্যের রহস্য সৰ্ব্বদাই মনে রাখিয়া সমস্ত কৰ্ম্ম করিবে। সন্তান সন্ততির শরীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আহারাচ্ছাদনাদির নিমিত্ত, মাতা পিতাকে যে কোন কৰ্ম্ম বা চেষ্টা করিতে হয়, তাহাই আমার কার্য্য বলিয়া, স্বেচ্ছা ধারণা রাখিবে। তৎপর তাহাদের নিজের দেহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তাহাও আমারই সেই সার্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। সকলের বধা নিয়মিত জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমিই সৰ্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি, এবং তাহার নিমিত্ত নানা প্রকার বৃত্তি, ব্যাপার, ও কৌশলাদির উদ্ভাবন করিয়া এক এক বৃত্তি, এবং এক এক ব্যাপারে এক এক জনকে নিযুক্ত করিয়া থাকি। তদ্বারা তাহাদের নিজ দেহ রক্ষা এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির দেহ রক্ষা করি। বৎস! ভোলাদাস! যাহারা এবিষয়ে সন্দিহান হয় তাহা-দিগকে তুমি বলিও তাহারা যেন একবার এই জগতের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করে, তবেই তাহাদের বোধোদয় হইবে।

ভোলাদাস। মা! জগতের প্রতি তাকাইয়া তোর কি দেখিবে?

স্বর্গদেব। আমার সৃষ্টিরক্ষার কৌশল বুঝিতে পারিবে, এবং তাহাদের

আত্মাভিমান বিদূরিত হইবে। ভাবিয়া দেখ ! মনুষ্য যদি একান্তই আত্মা-  
ভিমান করে, তবে কেবল ধন ধান্যাদি উপার্জন বা সংগ্রহের নিমিত্ত যে  
সকল ক্রিয়া হয়, তাহাতেই তাহাদের নিজের কর্তৃত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতে  
পারে ; কিন্তু তদ্বারা কি প্রাণীর জীবন রক্ষা হইতে পারে ? যদি উপযুক্ত  
মত ঋতু পরিবর্তন ও জল বর্ষণাদি না হয় তবে কেবল মাত্র কৃষকের চেষ্টার  
দ্বারা ধান্য সংগ্রহ হইতে পারে কি ? আর যদি ধান্যাদি শস্যই সমুৎপন্ন  
না হয়, তবে কেবল অর্থোপার্জনের দ্বারা জীবন রক্ষা হয় কি ? তাহা কদাচ  
সম্ভবে না। কিন্তু ঐ সকল কার্যে কি কাহারও হাত আছে ? মনুষ্য ইচ্ছা বা  
চেষ্টা করিয়া শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর আনয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে কি ?  
অথবা বৃষ্টির অবতারণা করিয়া শস্য রক্ষা করিতে পারে কি ? কখনই না।  
তৎপর সহস্র বৃষ্টিবর্ষা হইলেও আমি যদি আপন শক্তি বিস্তার দ্বারা শস্যাকুর  
উদ্ভিন্ন, বর্ধিত ও পরিপুষ্ট না করি, তবে কোন মানবের এমন ক্ষমতা আছে  
কি, যে, তাহার নিজের শক্তি বা ইচ্ছা দ্বারা একটি বীজ অঙ্কুরিত  
করিতে পারে ? কখনই না। ঐ সকল ক্রিয়া আমার হস্তে নিহিত। জগ-  
তের রক্ষার নিমিত্ত আমিই যথা সময়ে ঋতু পরিবর্তন, জলবর্ষণ, তাপদান,  
এবং শস্যাদির সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া থাকি। লোকে একটু সামান্য  
চিন্তা করিলেই ইহা দেখিতে পারে ; সেইরূপ, আপনাপন আহাৰাদি সংগ্র-  
হের নিমিত্ত, যে, মনুষ্যগণ নানা প্রকার চেষ্টা করে তাহাও তাহাদের নিজ  
হইতে হয় না। তাহা আমিই করাই, তাহাও আমার সেই সার্বভৌম  
পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। যে নিয়মানুসারে আমি শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের  
পর বর্ষা ঋতু প্রাপ্তভূত করি, যে নিয়মানুসারে অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি, অতি  
বৃষ্টির পর শুষ্কতার আবির্ভাব করি, যে নিয়মানুসারে আমি নিরুপাতের পর  
বায়ুপ্রবাহ এবং মহাবাত্যার পর মন্দ বায়ু পরিচালনা করি, যে নিয়মানু-  
সারে আমি যথা কালে যথা সময়ে অসজ্জার পুষ্প, ফল, মূল, ওলতা  
পত্রাদির সমুদগম করিয়া নিখিল দেহের পরিপুষ্টিও সংরক্ষণ করি, যে নিয়-  
মানুসারে আমি পিতা মাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ সঞ্চার করিয়া সমস্ত  
জীবজন্তুর রক্ষা করিয়া থাকি, সেই সার্বভৌম নিয়মানুসারেই আমি নিখিল  
প্রাণিগণকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা, ব্যাপার ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া  
থাকি। আমিই বায়ুর দ্বারা মেঘমালা যখন করিয়া নীই, আবার মেঘের  
দ্বারা জলবর্ষণ করি, কর্মকারের দ্বারা লাঙ্গল গড়ি, কৃষকের দ্বারা কর্ষণ করি,

এবং স্বর্ঘ্যের দ্বারা তাপ বিকীরণ করি ; আমিই স্থপতিরদ্বারা গৃহ নির্মাণ, তত্ত্ববায়ের দ্বারা বজ্র বয়ন, বণিকের দ্বারা বানিজ্য, ভূত্যের দ্বারা সেবা, প্রভুর দ্বারা রক্ষণ, এবং ধার্মিকের দ্বারা ধর্ম বিতরণ ইত্যাদি নিখিল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকি । আমি বাহ্যকে যে পরিমাণে যে কার্যের উপযুক্ত মনে করি তাহাকে সেই পরিমাণে সেই কার্যে সেই প্রবৃত্তি জন্মাইয়া চেষ্টা যুক্ত করি, পরে তাহা সম্পন্ন হয় ; এই সকল চেষ্টা ও ব্যাপারের দ্বারা উহাদের নিজ নিজ দেহ এবং আত্মা পরিরক্ষিত হয় । আবার অন্ত দেহ রক্ষার ও বিশেষ বিশেষ সহায়তা করে । এই রূপে আমার অদ্ভুত পালন কার্য নিশ্চয় হইয়া থাকে ।

ভোলাদাস ! মানবগণ, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কোন রূপ কার্য করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক কার্যের দ্বারাই, সম্ভান সম্ভতি রক্ষা, জী রক্ষা, আত্মরক্ষা এবং অন্তাত্মের দেহ রক্ষা এই চারিটিই সংসাধিত হয় ; কিন্তু বাহার জী পুত্রাদি নাই তাহার কর্মদ্বারা কেবল আত্ম রক্ষা আর অন্যান্যের রক্ষা কার্যই সাধিত হইয়া থাকে । সুতরাং সংসারের সমস্ত কার্যই আমার সেই সার্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত । এই কথা শুনি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক যাবৎ কার্যের অমুষ্ঠান করিবে । প্রাতঃকালে যখন গাত্রোথান করিবে, তখন অন্ততঃ দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত স্থিরচেতা হইয়া উক্ত ভাবটি দৃঢ়ীকৃত করিবে, তৎপর গাত্রোথান পূর্বক যখন যে কর্মের আরম্ভ করিবে, তখনই ঐ ভাবটি এক এক বার জাগাইয়া লইবে । তৎপর কার্যারম্ভ করিবে, এই ভাব বিন্মুত হইয়া কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হইবে না । আমার এইরূপ ক্রিয়া রহস্ত আমিই শ্রুতিতে বারম্বার বলিয়াছি, “অহ মেবচ গাং গেভি-  
স্তর্পর্যামি, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেন তর্পর্যামি, হবির্হবিষা, আয়ুর্ষায়ুষা, ইত্যাদি” (আধ্বর্যনশ্রুতি) । গীতাতেও আদ্যোপান্তই এই উপদেশ দিয়াছি। ঋষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বারম্বার এই কথা কীর্তন করিয়াছেন । ব্রহ্মা বলিয়াছেন, “বিস্মৃষ্টৌ স্মৃষ্টরূপাং স্থিতিক্রমাৎ পালনে । তথা সংহতি-  
রূপান্তে হ্যোতাহন্য জগদ্বয়ে । মহা বিদ্যা মহামায়া মহাদেধা মহা-  
স্বতিঃ । মহা মোহাচ ভবতী মহাদেবী মহা সুরী । প্রকৃতিত্বং সর্বস্য  
গুণত্রয় বিভাবিনী । কালরাত্রিস্থা রাত্রিস্থোহর্যাত্রিস্থ দারুণা । স্ব-  
শ্রীতমীশ্বরীস্বশ্রীত্বং বুদ্ধিকোষলক্ষণা । লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি ত্বং শান্তঃ

কাস্তিরেবচ।” ইত্যাদি। আগার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া বলিয়া-  
হিলেন “ \* \* \* ষাদেবী সৰ্ব্ব ভূতেষু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা \* \*  
ষাদেবী সৰ্ব্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা \* \* \* ষাদেবী সৰ্ব্ব ভূতেষু  
দয়্যা রূপেণ সংস্থিতা \* \* \* ইত্যাদি।” অতএব আমার কর্তৃষ্মের  
বিশ্বাস ভুলিয়া কখনই অস্বাভিমান করিও না।

বৎস! ভোলাদাস! যে ব্যক্তি অস্বাভিমান বিসৰ্জন পূৰ্ব্বক, সমস্ত  
সাংসারিক কৰ্ম্মকে আমার কৰ্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত ধারণা রাখে, এবং সেই  
ভাবেই সমস্ত কার্য্যের অহুষ্ঠান করে, সে যদি চক্ৰিশ ঘণ্টাও কেবল  
সংসারের কার্য্যই করে, তথাপি তাহাকে সংসারী বলিতে পারা যায় না।  
তাহার কোন কৰ্ম্মই সাংসারীক কৰ্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। কারণ উহা  
তাহার নিজের নিমিত্ত অহুষ্ঠিত হয় না; কিন্তু এই সমস্ত কৰ্ম্মই আমার  
উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হয়। সে যে সন্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করে  
তাহাও আমার উপাসনা, স্ত্রীকে ভাল বাসে তাহাও আমার উপাসনা,  
শিশু সন্তানের লালন পালনাদি করে তাহাও আমার উপাসনা, কুবি  
বাণিজ্যাদি করে তাহাও আমার উপাসনা, পরকীয় বিষয়কৰ্ম্ম করে তাহাও  
আমার উপাসনা; সে যাহা করে তাহাই আমার উপাসনা তাহাই আমার  
পূজা। কারণ সে আমার কার্য্য বলিয়া স্বেচ্ছা ধারণা করিয়া ঐ  
সকল কার্য্য করিতেছে; সুতরাং আমারই কৰ্ম্ম করিতেছে। অতএব  
ঐরূপ ব্যক্তি পৃথকরূপে আমার ধ্যান ধারণা বা পূজাদি না করিলেও  
কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। ঐরূপ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের নাম “কৰ্ম্মযোগ।”  
ঐরূপ কৰ্ম্মযোগের অহুষ্ঠান করিলেই এক প্রকারে আমার ধ্যান ধারণাদি  
করা হয়। এইরূপে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিলে কাহারও কোনরূপ দায়িত্ব হইতে  
পারে না, তাহার কৰ্ম্মের ভাল মন্দের নিমিত্ত আমিই দায়িনী থাকি,  
অথচ তাহার জীবন যাত্রাও অক্লেশে নিষ্পাদিত হয়। এই কথাই আমি  
শ্রীমান অৰ্জুনকে উপদেশ করিয়াছি।

কিন্তু যে ব্যক্তি অবিদ্যা বশগ হইয়া আমার কার্য্যকে তাহার নিজের কার্য্য  
বলিয়া ধারণা করে, এবং সেই ভাবেই সমস্ত কার্য্যাহুষ্ঠান করে, অর্থাৎ  
আপনার ভোগ্য বস্তু বলিয়া জীৱপ্রতি অহুরক্ত হয় এবং আপনার ভোগ্যবস্তু  
বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণাদির নিমিত্ত অর্থোপার্জনাদি করে, যে ব্যক্তি  
আপনার ভবিষ্যৎ উপকার আশায় “আমার আমার “ বলিয়া সন্তান সন্ততি

মালন পালনাদি করে, এবং আপনার সুখ হইবে, আপনার উন্নতি হইবে, প্রভূত্ব হইবে ইত্যাদি প্রত্যাশার “আমার সংসার আমার গৃহস্থালী” ইত্যাদি ধারণারশব্দি হইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, তাহার ঐহিক পারজীক কোন প্রকার সুখের আশা নাই । তাহারই পক্ষে এই অনন্ত সংসার প্রবাহে, ধারাবাহিক্রমে, বারম্বার, জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ, নরক, দুঃখ, শোকাদি হইয়া থাকে । সে আমাকে দেখিতে পারেনা, পাইতেও পারেনা ।

কিন্তু আমার কার্য্য বলিয়া যে মানব সংসার যাত্রার পরিচেষ্টাকরে তাহার তাহার সংসারে কোন প্রকার অভাব হইতে পারে না । আমিই তাহার সমস্ত অভাব বিমোচন করিয়া থাকি । জ্ঞী পুত্রাদি কিম্বা নিজ দেহের ও কোনরূপ, শোক, তাপ, রোগ বা অকালমৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট হইতে পারে না । আমি আমার কান্তিক গণেশের ন্যায় তাহাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া রক্ষা করিয়া থাকি । ফলপক্ষে, যে ব্যক্তি আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক আমার কর্ম বা আমার পরিচর্যা করিতেছে বলিয়া যাবৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার কোন রূপ শোক দুঃখ হওয়ার কারণই আদৌ থাকে না ; কেন না, সংসারের আসক্তি বা ভোগাভুগ বা ভোগ লিপ্সাই সকল প্রকার শোকদুঃখের মূল । জ্ঞী পুত্র ও ধন ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা নানা প্রকার ভোগ কামনা করিলেই ঐ সকল ভোগ্য বিষয়ের অন্যথা হইলে অগত্যা দুঃখ শোকাদি হইয়া থাকে । কিন্তু যাহারা ভোগবাসনাবশগ না হইয়া কেবল মাত্র আমার কর্ম বা আমার পরিচর্যা বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদের জ্ঞী পুত্র ধনাদির অন্যথা হইলে শোক দুঃখ হইবে কেন ? সে সর্বদাই পরমানন্দ-পরমশান্তির উপভোগ করে । অতএব তুমি সকলকেই বলিবে, যদি এই সংসারেতে কেহ প্রকৃত সুখ শান্তিরকামনা করে তবে যেন সর্বদাই আমার এই মহার্ঘ উপদেশ গুলি স্মরণ রাখে ।

ভোলাদাস । মা ! তুই যাহা বলিলি একথা পূর্বেও অনেক বার অনেককে বলিয়াছিস, এবং ঋষিগণও তোর সেই কথা অম্ববাদ করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; সুতরাং তোর ঐ ক্রিয়া রহস্য অনেকেই অবগত আছে, কিন্তু প্রায় কেহই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, তখন উহা অতীব শূন্য হইয়া পড়ে । কারণ তুই পুত্র কলত্রাদি প্রত্যেক ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু সুখ মজা নিহিত করিয়াছিস, অতএব আমরা কার্য্যে প্রায়শ্চ যদিও তোরই কর্ম করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস বা সম্মান

করিতে পারি, কিন্তু কার্য করার সময়ে কিবা পরে যখন তাহাহইতে এক এক প্রকার সুখানুভূতি হইতে থাকে, তখন তোর কথা বিন্ধ হইয়া সুখের ভাবই মনের মধ্যে উপস্থিত হয় ; সুতরাং তাহারই প্রতি অল্পরাগ হয়, এবং শেষে সেই অল্পরাগ বশবর্তী হইয়াই এক এক ক্রিয়া করিতে হয়, অতএব আত্মাভিমানও আসিয়া পড়ে । কিন্তু তুই যদি বিবরের মধ্যে কোন সুখ যাত্রা না দিতিস তাহাহইলে আর জীবের বিষয়ানুগাহ হইত না, আত্মাভিমান ও হইত না । তবে তোর কৰ্ম বলিয়াই সকলে সকল কৰ্ম করিত, অথবা সুখ দিরেছিলে দিরেছিলে,—যদি অল্পরাগ না দিতিস তবে আত্মাভিমান হইত না । তাহাতেও তোর কৰ্ম বলিয়াই কৰ্মানুষ্ঠান হইত । কিন্তু তাহাতো তুই করিস নাই ! তবে তোর কথা কার্যে পরিণত করিব কি রূপে ? আবার আর এক, কথাও জানিতে ইচ্ছা ; মা ! তোর এই উপদেশ পালন করা বাহার ভাগ্যে ঘটে তাহার কি শ্রবণ মাত্রে এক দিনেই ঘটে ?

অগদগা।—তাহা কখনই নহে, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সংস্কার এক দিনেই খলিত হয় না । জীব চিরদিন অবধি আমার জ্ঞী, আমার পুত্র, আমার ঐশ্বর্য, আমার ধন, আমার সংসার, আমার নিমিত্তই সকল, আমি স্বাধীন আমিই সকল করি ” এই ধারণা ও বিশ্বাস বা সংস্কারের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে । তাহার মন ঐরূপ সংস্কার রাশির দ্বারাই গঠিত । তাহা কি এক দিনেই বিনষ্ট হইতে পারে ? তাহা নহে, কিন্তু আমার এই তৎসংস্কারে বহুদিন পর্যন্ত কৰ্মানুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয় অভ্যাসের দ্বারা যখন ঐ রূপ সংস্কার বলবান হইয়া দাঁড়ায়, তখনই এই চির সমুত্ত কুসংস্কার বা মিথ্যা সংস্কার বিদূরিত হয় । অতএব তীব্র ব্রহ্ম সহকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা নিতান্ত উচিত ।

বিষয়ানুগাহ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি শুন । কেবল উপদেশের দ্বারা জীবের বিষয়ানুগাহ নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত শূন্যতন তাহা সত্য, এই অন্য উপায়ান্তর পরিকল্পিত হইয়াছে । সে উপায় এমন শূন্যকোশলযুক্ত, যে, তদ্বারা বিবরের ভোগও অনারামে সম্পন্ন হয়, আবার তৎসঙ্গেই বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি অল্পরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে । সেই অল্প রাগ কোশল ভোমাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি সকলকে ইহা জানাইবে, তাহা হইলেই তাহার কৃত-



কার্য হইতে পারিবে। সমস্ত বিষয় আমাতে সমর্পণ করা অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চনা করাই বিষয়ানুসার নিবৃত্তির মূখ্যতম কৌশল। এমন কৌশল আর সম্ভবে না। জীব পূর্বোক্ত ভাবের অভ্যাস করিতে থাকিবে, অর্থাৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র আমারই সংসার; আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হর্তা, কর্তা, এবং বিধাতা; এ সংসারে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই আমার সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় ক্রিয়ার অন্তর্গত। আপন অভিপ্রায় বা কার্য সাধনের নিমিত্ত আমিই এই নিখিল প্রাণীদ্বারা নিখিল কৰ্ম কলাপ করাইতেছি। এসংসারের প্রত্যেক জীব কেবল আমারই কৰ্ম করিতেছে, নিজের নিমিত্ত কিছুই করিতেছে না এইরূপ ধারণা সূদৃঢ় করাই চেষ্টা করিতে থাকিবে। সর্বদাই এইরূপ চিন্তা এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে থাকিবে, অমনি তৎসঙ্গে নানা প্রকার ইঞ্জিয় ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চনা করিতে থাকিবে।

মহুয্য দশটা ইঞ্জিয়ের দ্বারা দশপ্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকে, চক্ষুর দ্বারা নানা প্রকার সূদৃশ্য বস্তু দেখে, কৰ্ণ দ্বারা স্তম্ভধ্বনি সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, রসনা দ্বারা বিবিধ রসাস্বাদ করে, নাসিকা দ্বারা সুরভি ভ্রাণ গ্রহণ করে, চৰ্ম্মের দ্বারা শীতোকাদি সংস্পর্শ করে, এবং হস্ত, পদ, বাক, উপস্থ ও পায়ুর দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জীবের আর কোন ক্রিয়াও নাই, আর কোন বিষয়ও নাই। তন্মধ্যে পায়ু ইঞ্জিয়ের কৰ্ম বা বিষয় অর্থাৎ মলমূত্রাদি বিসর্জন কার্যে কাহারও অহুসার বা আসক্তি জন্মিতে পারেনা। তদ্ব্যতীত আর নয়টা বিষয়ের উপরেই জীব অহুসার ও আসক্তি হইয়া বিলিপ্ত হয়। এই নয় প্রকার বিষয় ভোগের নিমিত্তই জীব সর্বদা লালসাক্ত। যত প্রকার ভোগ্যবস্তু আছে তৎসমস্তই এই নয়প্রকার বিষয়ের অন্তর্গত; এই নয় প্রকার বিষয়ানুসার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সমস্ত বিষয়ানুসার নিবৃত্ত হইয়া যায়; এই নয়প্রকার বিষয়ের দ্বারাই আমার অর্চনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাহাই বা বিষয় ভোগ হইতে থাকে এবং তদ্বারা বিষয়ানুসার নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতিই অহুসার বা ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

হৃদয়ানন্দাশ্রম।—মা? তোর একথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কোন ক্রিয়া দ্বারা তোর কিরূপ পূজা করিতে হয়, তদ্বারা বিষয়ানুসার বা কিরূপে

বার, আবার বিষয়ের উপভোগ বা ক্লিপে হয়, আবার তোর প্রতি অমুরাগই বা ক্লিপে বৃদ্ধি পায়, এবং তদ্বারা আত্মাভিমান নিবৃত্তিই বা ক্লিপে হয়, ইত্যাদি কুট রহস্য আমি কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারি নাই, তুই একবার ভাল করিয়া বল, তাহা হইলে সেইরূপই চেষ্টা করিয়া দেখিব ।

এই কথা বলিতে না বলিতেই অন্য লোকজন আসিয়া পড়িল, জগদম্বা পুস্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন । আজ আর ভোলাদাসের উত্তর শুনা হইল না, কেবল প্রশ্নই হইল । ভোলাদাস আগামী কল্যা উহার উত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং জগদম্বার গুণ গান করিতে করিতে জ্ঞানানন্দের বাড়ি হইতে প্রস্থান করিলেন । সন্ধিপূজার কথোপকথন অগত্যা এই খানেই সমাপ্ত হইল ।

## আচার ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“আচারলক্ষণোৎসর্গঃ সন্তাচারলক্ষণাঃ ।

সাধুনাঞ্চ বধাবৃত্ত মেতদাচার লক্ষণং ॥”

ধর্ম অনেক ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আচার এক প্রকার ধর্ম বিশেষ । সাধুআচার দ্বারাই মনুষ্য সাধু বলিয়া পরিচিত হন । অতএব সাধুগণের কার্য্যই আচারপদবাচ্য । শাস্ত্র এইরূপ সাধুগণের লক্ষণ করিয়াছেন বধা—

শিষ্টাঃ খলু বিগতমৎসরা নিরহঙ্কারা০০০ অলোলুপাদিস্তদর্প লোভ মোহ  
ক্রোধ বিবর্জিতাশ্চ ।

বাহারা বিগতমৎসর, নিরহঙ্কার, অলোলুপ এবং মোহক্রোধাদি বিবর্জিত, তাহারাই সাধু । এই সাধুগণই আমাদের প্রতিপাদ্য মহাজন । যদি “মহা জনো যেন গতঃ সপঙ্খাঃ” এই মহাজন বাক্য অনুসারে চলিত হয়, তবে বধা-সাধ্য ইহাঁদের পণের অনুসরণ করাই কর্তব্য । কোন ধনে মহাজন সাধুপদ-বাচ্য, তাহা পরে বিস্তৃতরূপে বলিব, আদৌ দেখা যাক হিন্দুর সাধু-আচারিত আচারের উদ্দেশ্য কি ? হিন্দুর আচারের উদ্দেশ্য পরমার্থ । পরমার্থ হুজ্জৎ আর্থের আচার প্রথিত । ঘুড়িশূন্যে অলক্ষ্যমার্গে যতদূর উড়তীন হউক না কেন, যেমন হুজ্জৎ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের আচার যতদূর কেন

লৌকিকতার পরিদর্শিত হউক, তাহারমূলমন্ত্র পরমার্থ পরিহার করেনা। পক্ষান্তরে হিন্দুত্ব ঘুড়ি যেমন অধঃপতিত হয়, সেইরূপ পরমার্থরহিত আচারও পরিণামে অধঃপাতের কারণ হয়।

সাধারণের হুইটা পথ আছে; একটা পরমার্থের দিকে, অপরটা সংসার-ভিত্তিতে। স্বাভাবিকভিত্তিকভাবে সাধারণে ইহার অন্যতর পথে বিচরণ করে। কঠবরীতে আছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥

ইঞ্জিরানি হরানাহবিষয়াং তেষু গোচরান।

আত্মজিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহমনীষিণঃ।

অসংযতৈরিত্তিরেত সঃসারমধিগচ্ছতি।

সংযতৈস্তত্বজনঃ পরং তদ্বিষ্ণেঃ পরমংপদম্ ॥

আত্মা রথস্বামী, শরীর রথ, বুদ্ধি (নিশ্চরাস্থিক) অন্তঃকরণবৃত্তি) সারথি। মন রশ্মি (লাগাম), ইঞ্জিরগণ অশ্বরূপ এবং রূপ, রস গন্ধাদিরূপ বিষয়, রথচালাইবার মার্গ। পণ্ডিতেরা ইঞ্জিরাদিযুক্ত জীবাত্মাকে তাহার কলভোক্তা বলেন। ইঞ্জিররূপ অশ্ব যদি বাগ নামানে, তাহাহইলে ক্রেশাবহ সংসার দিকে লইয়া যায়, আর যদি ঐ ইঞ্জিরার সংযত হয়, তাহাহইলে তাহাচার্য্য গন্তব্যস্থান বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিন্দু, বিষ্ণুর পরমপদের ভিখারী; কিন্তু সেস্থান অতি দুর্গম, অশ্ব স্বেচ্ছায় সে পথে চলিতে চায় না। অশ্ব উত্তমরূপে প্রশিক্ষিত করিতে না পারিলে, সেস্থানে যাওয়া ছকর, তাই হিন্দু ইঞ্জির সংযমে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। যে কার্য্যের দ্বারা ইঞ্জির সংযত হয়, তাহাই হিন্দুর শাস্ত্রসংগত আচার। ইঞ্জিরের প্রশ্রয় বাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, সেবিষয়ে আমাদের শাস্ত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সূত্রমতে, যে আচার বলে, স্বধর্মনির্ভেদে, ব্যাভিচারের অত্যাচার স্বপন্ননির্ধিষেবে প্রবন্ধনার অবতারণা, বিষকুস্তপরোমুখে সাধুতার বক্তৃতা, এক কথায় যে আচারে ইঞ্জিরের ক্রিয়সম্পর্কজনিত ও কামজনিত তৃষ্ণা লম্বিত বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে পণ্ডে পরিণত করে, সে আচার বৃণিত, অতএব হিন্দুর পরি-  
-বাহ্য। যে আচারে দমাদি প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মার্জিত হইয়া দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যে আচার পরমার্থের অমূল্য হইয়া সংসারের বিরোধী না হয়,

তাহাই হিন্দুর আচার। তবে আজকালের হিন্দুসন্তানগণ যে আচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে আচার ব্যভিচার।

এক্ষেণে আমরা যে আচারের অমুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে আচারের লক্ষ্য শারীরিক ও সাংসারিক উন্নতি। মুসলমানের আচার হিন্দুর আচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুগণ বহুতচ্ছ হইয়া ইষ্টচিত্তা করেন, মুসলমানগণ মুক্তকণ্ঠে সে কার্য্য নির্বাহ করেন। হিন্দু ভুক্তাবশিষ্ট শতাব্দে রাখিতে বাধ্য, মুসলমানের তাহাতে অধর্ম্ম অমুষ্টিত হয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুর সহিত বিপরীত ভাব। ইহাদের আচারের মূল প্রায় লক্ষিত হয় না। হিন্দু-সন্তান মুসলমানের রাজত্বকালে প্রবল অত্যাচারেও মুসলমানীর আচারানু-করণে আচারভ্রষ্ট হয় নাই। তাহার পাশব বল প্রয়োগ করিয়াও আমাদের তত অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, যত অনিষ্ট ইংরেজ রাজের দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাহার কারণ হিন্দু স্বভাবত বুদ্ধিজীবী। আজকাল হিন্দুগণ অবনতির অতিভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি বুদ্ধিবানি হারায় নাই। নিক্রমশ্য আচারের অমুকরণ করাই মূর্খের কার্য্য; তাই বহুশতাব্দি মুসলমানের পদানত থাকিলেও এত অধিক পরিমাণে আচার ভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্ম দ্রোহী হয় নাই। তবে মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক প্রণীড়ন করিয়া অতি অল্পসম্মানক হিন্দুসন্তানকে স্বল্পভুক্ত করে। ইংরেজের কোনরূপ বল প্রয়োগ নাই—ধর্ম্মে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ নাই; তথাপি কি জানি কেমন একটু আকর্ষণী শক্তি “বোধদয়” হইতে শেষ পাঠ্য পুস্তকের প্রতি পত্রের প্রতি পঙ্ক্তির অন্তরে সম্বৃত্ত রহিয়াছে; হিন্দু সেই আকর্ষণী শক্তি বলেই পৈতৃক আচার হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইয়া গড়িতেছে। ইংরেজের আচার হাতেহাতে স্ত্রুণের বাজরা লইয়া বেড়ায়, কাজেই অপরিণামদর্শী হিন্দুসন্তান সেই মরীচিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিতে থাকে।

ক্লমশরীরে আহারের অনিয়ম করিলে, যে, রোগ বৃদ্ধি হয়, এ জ্ঞান অনেকের আছে, তথাপি সাধারণেরই আত্মস্থখকর কুশল্যে আদৌ ক্রটি হয়। এই সহজ ক্রটি মহুয়ের অপরিণামদর্শিতার ফল মাত্র। এইকালে স্বানব পদে-পদে কষ্ট অমুভব করিয়া থাকে; চিরজীবন রোগের অসহ্য যন্ত্রণার ভার-বোধে জীবন-বহন করে। রোগ, শোক, তাপ, প্রভৃতি সংসারের বতকিছু

রেশকর আছে, সমস্তই এই সহজ রুচির কল। সহজ রুচির বগেই পাশ্চাত্য আচার আচরিত হইতেছে।

জলের পক্ষপাত যেমন নিম্নদিকে, সমুদ্রের পক্ষপাতও সেইরূপ নিম্ন দিকে। উর্দ্ধে উঠিতে হইলে জোরার চাই। এখানে জোরার কর্তব্য-বুদ্ধি। কর্তব্য বুদ্ধি থাকিলে উর্দ্ধে ও পক্ষপাত হয়। পুত্রের প্রতি পক্ষপাত স্বভাব সুলভ, প্রায় সকলেরই হয়। কিন্তু করজন ব্যক্তির পিতার প্রতি পক্ষপাত হয়? বাহার হয়, তাহার কর্তব্য জ্ঞান আছে বলিয়া। সেইরূপ কামাদির প্রতি পক্ষপাত স্বভাবসিদ্ধ। দয়াদির সুপ্রবৃত্তির প্রতি পক্ষপাত কর্তব্য জ্ঞান সাপেক্ষ। সুতরাং, যে আচার কামাদির প্রবর্তক, সে আচারের আকর্ষণী শক্তি স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। যে আচার সদবৃত্তির প্রবর্তক, অসদ্বৃত্তির নিবর্তক, তাহার বিপ্রকর্ষণী শক্তি যে সম-ধিক বলবতী, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

সনাতন আচারের উদ্দেশ্য এবং অধুনাতন আচারের উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত বাক্য প্রপঞ্চের দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝা গেল। এখন দেখা যাক, লোকে কি চায়? এবং যাহা চায়, তাহা পায় কি না।

রোগী নিরোগ চায়, কিন্তু কুপথ্যের পরবশ হইয়া অস্বাস্থ্য সম্পাদন করে। চোর অর্থ উপার্জন করিতে চায়, বুদ্ধির বিপর্যয়ে অর্থ অনর্থের পরিণত হয়। লোকে চায় একবস্ত, কিন্তু বিবেচনার বৈপরীত্যে, এইরূপ বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। আজ কাল আমাদের মধ্যে এইরূপ বিপরীত ফল ফলিতেছে। হুংখের বিষয়, দেখিয়াও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতেছে না। সকলেই একমাত্র সুখের ভিখারী। দান, ধ্যান, জপ, তপ, ভজ্ঞতা, বক্তৃতা, চাকরি, চুরি, উপকার অপকার প্রভৃতি যে যাহা করে, তাহাতে তাহার সুখ লাভ হয় বলিয়াই করিয়া থাকে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সুখ ঘটে না। গোয়ালার হুংখের জ্ঞান কতক লোক দেখান সুখের অভিমান হয় মাত্র। লোকে দেখিতেছে একসের করিয়া হুংখ পান করিতেছি। কিন্তু মনের অগোচর পাপ নাই—হুংখ খাইতেছি কি জল খাইতেছি মনে? বুঝিতে পারিতেছি। [হুংখদাতা ঘোষজিও ভাবিতেছেন, বেটারা কি নির্দোষ পরগা দিয়া জল খাইতেছে। আধুনিক আচারজনিত সুখ গোয়ালার হুংখ আর্ধ্যগণের আচার জনিত সুখ বেন ঘরের হুংখ, তাই খাটিমান।

লোকে যে সুখ চায়, সে সুখ কেবল ইহকালে অর্থাৎ বর্তমানের জন্য । তাই পাশ্চাত্য আচারের সুখ কেবল ইহকালের । প্রাচীন আচারের সুখ পরকালের । প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান করিলে, যে সাংসারিক সুখ হইতে একবারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, এরূপ যেন কেহ ভাবেন না । ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পারমার্থিকসুখ, সাংসারিক সুখ ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র । আচার অনুষ্ঠান কালে সাংসারিক সুখ, পরিণামে পারমার্থিক সুখ, জন্মাইয়া দেয় । যেমন স্বপথ্য ভোজনের সঙ্গে বল সঞ্চয় ও অনির্বচনীয় সুখ অনুভূত হয়, এবং ভবিষ্যতে বিপুল সুখের কারণ হইয়া থাকে । আরকুপথ্য ভোজন তৎকালিক তৃপ্তকর ; কিন্তু পরিপাক বড় কষ্টকর ।

ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, দুই পক্ষেই সুখ দেখিতে পাওয়া যায় । তবে সুখগত কিছু ভেদ আছে । একটি সূর্য্য কিরণের ন্যায় চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়, অপরটি শুধাংশুকরের ন্যায় তাপিত প্রাণ শীতল করে ; এবং একটি আলো অঁধারে গোচ, অপরটি শুদ্ধ হৃদয়কবৎ নিশ্চল । সাংসারিক সুখ, দুঃখ অনুভূত, সুখে বড় দুঃখের জের টানিতে হয় । জমা খরচ কাটিলে দুঃখের ভাগই অধিক ; ধারে ধারে, যোগে যাগে একরকমে চালাইতে হয় । যেমন আর তেমনি ব্যয়, হাতে হু কড়াও থাকে না । কেবল জমাখরচ ঠিক করিতে করিতেই হয়রাণ । পারমার্থিক সুখ যেন কুবেরের ভাণ্ডার ।—বতই ব্যয় কর “যথাপূৰ্ণং তথাপরং ” কিছুই কম হয়না ।

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল কারণে সাংসারিক সুখে বিভ্রম, এবং পারমার্থিক সুখে সতৃষ্ণ ছিলেন । সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু তত আসক্ত ছিলেন না—হয় ভাল, নাহয়, নাহয় পারমার্থিক সুখ উপার্জনই জীবনের এক মাত্র ব্রত করিতেন ; সুতরাং, যে আচার পারমার্থিক সুখের অনুকূল, তাহাই তাঁহাদের আচার, ইহা ব্যতিত অন্য সুখের বা অন্য আচারের প্রার্থী ছিলেন না । এখন সেই আর্ধ্যচরিত আচার সমস্ত বিসদৃশ এবং ঘোরপক্ষপাত ছুঁই বলিয়া আমাদের ভ্রম জন্মে । আমরা যথাসাধ্য সেই ভ্রমোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব । তৎকালে প্রতীতি হইবে লোকে চায় এক, পায় আর ।

## পাপ ও পুণ্য ।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

মহাভারতে বনপর্বে এইরূপ লেখা আছে যে, কোন কপোত শ্যোন ভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনর নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্যোনপক্ষী, রাজার সমীপবর্তী হইয়া কহিলেন, হে রাজন ! সমুদায় ভূপালগণ আপনাকে ধর্ম্মান্না বলিয়া নির্দেশ করেন, অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অতিনারী হইলেন ? আমি ক্ষুধার একান্ত কাতর হই-রাছি ; আপনি ধর্ম্ম লাভ লোভে কদাচ চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবে না ; তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণ জন্য পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে ।

রাজা কহিলেন, হে বিহঙ্গরাজ ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবনের প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইরাছে । অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরম ধর্ম্ম, তাহা কি তুমি জাননা ? এই কপোত প্রাণ ভয়ে পলা-য়ন করিয়া জীবন রক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইরাছে । এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত । ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেদ্রুপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগে তদ্রূপ পাপ জন্মে ।

শ্যোন কহিলেন, মহারাজ ! সমুদায় জীব আহার হইতে উৎপন্ন ও আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিরাই জীবিত থাকে । জীবগণ ক্ষুধা অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না ; অতএব আহার বিরহে আহার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রেহান করিবে । আমার মুখ হইলে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবার বর্গও বিনষ্ট হইবে । হে মহারাজ ! আপনি একটি প্রাণির প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণির প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইরাছেন । হে সত্যবিক্রম ! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে ; পরম্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব বাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অমুষ্ঠান করিবে । অথবা উত্তর ধর্ম্মের পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করত বাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই অমুসরণ করিবে ।

আবার কর্ণ পর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গাণ্ডিবের নিন্দা করিয়া মহাবীর অর্জুনকে ভৎসনা করিলে, বীরবর ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী গাণ্ডিব নিম্নক যুধিষ্ঠিরকে নিধনোদ্যত হইলে, মহাত্মা কেশব অর্জুনকে বারবার থিকার প্রদান পূর্বক কহিলেন; হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাং রে বোবপন্নবন দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম, যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর না। তুমি ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মের প্রকৃততত্ত্ব সম্যক অবগত নহ। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কখন দৈদৃশ কার্য্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমাং একরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মুখ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্তব্য কার্য্যকে কর্তব্য ও কর্তব্য কার্য্যকে অকর্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসে সাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহ বশতঃ ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধ রূপ মহাপাপ পক্ষে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্র জ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরমধর্ম্ম। বরং, মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা বাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের আর পুরুষ প্রধান, ধর্ম্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে? সজ্জনেরা সময়ে অপ্ৰবৃত্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্ত, প্রমত্ত, রণ পরাভূত, শত্রুরেও বিনাস করা নিম্ননীর কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্ৰবৃত্ত শত্রুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে দুর্ধতা বশতঃ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি হৃজের হৃদয়তর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়া শত্রুর বিনাস অভিলাষ করিয়াছ। হে ধনঞ্জয়! কুরু পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিহ্লর ও বশিষ্ঠী কৃষ্টি যে ধর্ম্ম রহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপ তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, সত্য তত্ত্ব অতি হৃজের। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ, সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।



বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিরোধ ও সর্কস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ অর্থ অবগত না হইয়া সত্যাস্থানে সমুদাত হয়, সে মিতান্ত্র বাণক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের স্বার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই স্বার্থ ধর্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কন্ধ্যাস্থতাপ করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্ম-তিলাবী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

পূর্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অন্ধ শূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্রকলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত যুগবিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ যুগয়ায় গমন করিয়া কুত্ৰাপি যুগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ণ নেত্রবিহীন স্বাপদ তাহাব নয়ন গোচর হইল। ঐ স্বাপদ ত্রকা দ্বারা দ্রুত বস্ত্র ও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ স্বাপদ নিহত হইবামাত্র অকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অঙ্গরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।

হে অর্জুন! সেই স্বাপদ তপঃ প্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশ হেতু হওয়ারে নিধাতা উহারে অন্ধ করিয়া দিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক যুগকে বিনাশ করিয়া অনার্য্যে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জয়ের। আরদেখ কৌশিক নামে এক বহুপ্রতাপশিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পুঙ্কক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইরাছিলেন। একদা কতকগুলি দম্ভাতরে লোকে জীত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলে দম্ভাতরাও ক্রোধ ভরে বদ্র সহকারে সেই বনে ভ্রূহাদিগকে অবেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে বহুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন! কতকগুলি ব্যক্তি এইদিকে আগমন করিয়াছিল তাহার। কোন পথে গম্য করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে, সত্যকরিয়া বলুন। কৌশিক দম্ভাগণ কর্তৃক এইরূপ

জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই জুরকর্মা বন্যগণ তাহাদের অহুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। স্বল্পধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয় ! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্যা ব্যক্তি জ্ঞান বৃদ্ধদিগের নিকট সম্বন্ধ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্মও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত ছর্শোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেক ঋতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না ; কিন্তু ঋতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেকস্থলে ধর্ম্ম-নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম-নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাবৃত্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বাহারা অস্ত্রের সস্তোর উৎপাদনই, ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যান্য সহকারে পরদার হরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট অহুসন্ধান করে, তাহা তটলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির গৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে ো স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। একপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না। প্রাণ বিনাশ বিবাহ, সন্ন্যাস জাতি নিধন এবং উপহাস এই কএক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষারহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব-দর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা পুণ্য দ্বারা চৌর সংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, ো স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। প পাত্ম্যাগিকে ধনদান করিলে

অধর্মাচরণ নিবন্ধনপাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জুন ! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি ও সাধ্যানুসারে ধর্ম্মলক্ষণ কীর্তন করিলাম, ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মবাক্য তোমার বধাহঁ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

মহাভারতের গীতাধ্যায়ে, অর্জুনের অমুরোধ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুসৈন্য মধ্যে রথস্থাপন করিলে, অর্জুন তাঁহার চতুর্দিকে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবর্গকে সাক্ষাৎ সমুপস্থিত করিয়া যুদ্ধদ্বারা জ্ঞাতিবধ পাণে লিপ্ত হইতে হইবে ভাবিয়া বিমর্ষ মনে ভগ্নোদ্যম স্বরূপে রথোপরি বসিয়া পড়িলে, হ্রস্বকেশ সহাস্য হাস্যে উভয় সেনার মন্তব্যবর্ত্তি বিষম্বদন অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন ! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য সকল বিনির্গত হইতেছে ; কিন্তু তুমি অশোচ্য বদ্গুণের নিমিত্ত শোক করিয়া মুখতা প্রদর্শন করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না। পূর্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ আমরা সকলেই বিদ্যমান ছিলাম এবং পরেও বর্তমান থাকিব। এই দেহ যেমন কৌশল, বোজন ও জরা প্রাপ্ত হয় ; জীবাত্মা ও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; দীর্ঘ ব্যক্তি তদ্বিশেষে মুগ্ধ হন না। বিষয়ের সহিত ইঞ্জিরগণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও সূক্ষ্মদৃঃখের কারণ ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনিষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ সকল বাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, দেহই সমদুঃখসুখ বীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার ও কখন অভাব হয় না ; তত্তদংশী পণ্ডিতগণ ভাব এবং অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়া ছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ; তাহার বিনাশ নাই ; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তত্তদংশী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমের্য। অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্মাকে বিনাশ করে তাহার উত্তরই অনতিজ্ঞ। কেননা জীবাত্মা কাহারও বিনাশ

করেন না এবং জীবাশ্মারেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না । ইহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই । ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য শাস্ত ও পুরাণ । শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না । যে পুরুষ ইহার অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাবও বধ করেন, না বধ করিতে আদেশ করেন ? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নুতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন । ইনি শব্দে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ জলে ক্লেদিত বা, বায়ুতে শোধিত হন না । ইনি নিত্য, সর্বগত, স্থিরস্থতাব, অচল ও অনাদি । অচ্ছদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোধ্য । ইনি চক্ষুরাদির অগোচর মনের অবিষয় ও কর্ম্মেদ্রিয়ার অগ্রাহ্য । অতএব তুমি এই জীবাশ্মাকে এবশ্রকারে অবগত হইয়া অমুশোচনা পরিত্যাগ কর ।

যদি জীবাশ্ম সর্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাংকে জ্ঞাত বা নত বোধ করা তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা দস্তব্যই নয় । কেননা জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত্যু ব্যক্তির জন্ম অবশ্যস্বাদী ও অপরিহার্য্য ; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নয় । ভূতসকল উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত ছিল, স্বংশ সময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে, কেবল জন্মমরণের অন্তরাল সময়ে প্রকাশিত হয় ; অতএব তদ্বিষয়ে পরিবেদনা কি ? কেহ এই জীবাশ্মার বিশ্বয়ের সহিত দর্শন করেন, কেহ বিশ্বয়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ বিশ্বয়ের সহিত শ্রবণ করেন কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারে না । জীবাশ্মা সর্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন । অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয় ।

তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকল্পিত হইবে না ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়ঙ্কর কর্ম্ম নাই ; যে সকল ক্ষত্রিয় বদৃছাক্রমে উপস্থিত অনার্য্যত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই সূখী । যদি তুমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে । লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে । সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষা অধিকতর দুঃসহ । যে সকল মহা-রথ তোমার বহমান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকবে না, তাহারা মনে করিবেন, তুমি তর প্রযুক্ত সংগ্রামে পরাধীন হই-

রাহ। তাঁহারা তোমায়ে কত অরক্ষ্য কথা কহিবেন এবং তোমার সাম-  
র্থ্যের নিকা করিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে ? সমরে  
বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, অরক্ষ্য করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অত-  
এব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উদ্যান কর ; সুখ, দুঃখ, লাভালাভ ও  
অর পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে পাপভোগী  
হইবে না ।

আমরা গতবারের প্রবন্ধে ইহাই সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ।  
এই অমূল্য সত্য কেবল হিন্দু শাস্ত্রবেত্তারা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রের  
এত মহাত্মা । যতদিন মনুষ্য সমাজ জগতে জীবিত থাকিবে তত দিন এই  
মহা সত্য আবিষ্কারক মহর্ষিদিগের অলৌকিক চিন্তাধীনতার বিষয় অবগত  
হইয়া মনুষ্যালোক স্তুতিত হইয়া তাঁহাদের গুণগান করিবে । সমস্ত হিন্দু  
শাস্ত্রে-রই-এই মত । সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র একবাক্যে বলিয়া থাকেন, যে পাপ  
পুণ্য এ দুইটা আপেক্ষিক কথা মাত্র ।

## সাধু-দর্শন ।

মহাত্মা ভাষ্করানন্দ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম । এইরূপ ভাবেই অর্দ্ধ দণ্ডকাল অতিবাহিত  
হইল । সন্ধ্যায় এই সময়টুকু একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন । ক্ষণ-  
পরে সাহুগ্রহে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিতে  
বলিলেন ।

ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ\*

ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ক্রবন্তি ।

হুৰুগৌ নিরস্তাতিশূন্যস্বাক্ষাৎ,

তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ'হম্"

ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পাক্ষ্যাত্মং

ন জৈনং ন মীমাংসকাদৈর্মতত্বা ।

বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বা,  
 তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ । । ”      ঐ  
 ন শূন্যং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পিতং,  
 ন কুজং ন পীনং ন ব্রহ্মং ন দীর্ঘং ।  
 ন রূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাং,  
 তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ । । ”      ঐ  
 ন শাস্ত্রা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা,  
 ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ ।  
 স্বরূপাববোধো বিকল্পাসহিষ্ণু,  
 স্তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলহহম্ । । ”

স্বামীজীর অমুমতি অনুসারে সাধারণে স্তোত্রটি পাঠ করিলাম । বর্তমান  
 স্তোত্রটি পাঠ করিলাম, ততক্ষণ কোন কিছুই বলিলেন না, ঘাই আমার  
 স্তোত্রটি পাঠ সমাপ্ত হইল, আমি বলিলেন “তোমরা দিচ্ছা হয় ? আমি  
 উত্তর করিলাম ! ‘এখন পর্য্যন্ত হয় নাই ।

স্বামী । (বিশ্বের সহিত) আবিতক্ দীক্ষীত্ নাহি ত্বম্, ইরে কেয়েমা ?  
 স্যায়সেহি কি বাঙ্গালাকা চাল ?

আমি । বাঙ্গলার এরূপ অবস্থা পূর্বে ছিল না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার  
 দোষে, কাল বিপর্য্যয়ে বাঙ্গলাই সর্বপ্রথমে অবনতির চরমের দিকে ধাবিত  
 হইতেছে ।

স্বামী । (আগ্রহের সহিত) ভাল, কহোতো, বর্তমান সময়ে বাঙ্গলা  
 দেশকো ক্যায়সি অবস্থা হয় ? দেখো, বাঙ্গলাকা যো কোই হামারা পাস  
 আতা হ্যায়, ওই যোগ, সমাধি, মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় উচ্চমার্গকা বিষয়  
 বার্তালাপ করনে মাকতা । আউর হাম্ সব্ গুন কল্পিত সাময়িক ব্যবস্থাকা  
 উপদেশদিয়া করতা হ্যায় । ইসি লিরে হামুসে নারাজ্ হোক্ চলে যাতে হ্যায়,  
 কিন্তু কোই কোইতি পরম আনন্দিত হো কব্ হামারা মনঃ আউর ঋতিকা  
 বাধ্যন করতা হ্যায় ; ইয়ে সব্ দেখ্ কব্ হামারা যুগপৎ হ্যায় ওবিবাদ উপস্থিত

হোতা হ্যায়। ইরে লোগৌকো আত্মাকা কুহতি নস্তি বোধ নাহি,  
একদম্ পত-বন্ গিয়া। কিয়া আপ্সোস্।

জানি। সাধন বিহীন এবং অমুঠান বিহীন মানব স্বভাবত দুর্বল  
ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া থাকে এবং সচরাচর সময়ের শ্রোতে  
আপনাকে অনাগ্রাসে ভাসাইয়া দেয়। সুতরাং, সমাজেরও অবস্থা  
সময়ের বলে পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য  
কবিরা এবং সাধুরা সময়ের বিকৃত গতিরোধ করিয়া সমাজকে ধর্মপথে  
স্বাধিবার জন্য, সমাজের বন্ধন মুদ্রু করিতে এবং মানবের মনকে সর্বদা  
সাধিক ভাবে গঠিত রাখিতে, শাস্ত্রে নানাভাবে প্রচু উপদেশ দিয়া  
গিয়াছেন। কিন্তু দুর্নিবার্য প্রবল সময় শ্রোতে নিপতিত সমাজ, শাস্ত্রের  
সে সমস্ত মঙ্গলপ্রদ উপদেশ লক্ষ্য না করিয়া অবলিলাক্রমে ধ্বংশেরদিকে  
আগনাদের ছাড়িয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অবস্থা এতই শোচনীয়  
যে শতাব্দির অধিক বঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কি না বলিয়া  
সন্দেহ হয়।

বেশী দিন অস্তিত্ব হয় নাই, শতাব্দির পূর্বে বঙ্গালী কেন, সমগ্র হিন্দু মধ্যে  
বহির্জগতে, বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী, স্বাধীনচেতা, কার্যক্ষম ছিলেন, এবং অধিকাংশই  
অন্তরজগতে অনেক স্থলে উন্নতির চরমে উঠিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।  
এখনও হুই দশজন আপনাদের ন্যায় অন্তরজগতের মহারথী বিদ্যমান রহি-  
য়াছেন। কিন্তু আর বৃদ্ধি থাকে না। সংসার দিন দিনই অধঃপতনের শেষ  
সীমার খাতি হইতেছে। মুবলমানের প্রবল নির্যাতনেও বঙ্গালী অনেক  
পরিমাণে আত্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কি জানি ইংরাজের  
শিকার, ইংরাজের ব্যবহারের দি মোহিনী শক্তি যে এই অল্পকাল মধ্যেই  
বঙ্গালাকে চিরমরুতের পথে লইয়া বাইতে সক্ষম হইয়াছে। আপনারা যদি  
বঙ্গালার অবস্থা একবার অবলোকন করেন তাহা হইলে বঙ্গালীকে একটা  
জাতি মধ্যে গণ্য করিতে যুগ্মা বোধ করিবেন; হয়ত কাহাঘের বঙ্গালী বলে  
চিনিয়াই উঠিতে পারিবেন না। একই জাতি, অথচ পরস্পর বেশ ভূবার,  
হাং ভাবে, এবং প্রকৃতিগত এত পৃথক।

বর্তমান বঙ্গালী হিন্দু, হিন্দু, বন ও ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ জাতির বৌদিক  
জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ববনের আধিপত্যে বাবনিক ভাবের বহুল বিস্তারে

বহুদিনের জীর্ণ ও জরাগ্রস্থ হিন্দু সমাজের হিন্দুচিত আচার অনুষ্ঠান, বাবনিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া একরূপ অপরূপ অবস্থা অর্থাৎ যবন-হিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিস্তৃত হিন্দুতাব একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। আবার য়েচ্ছের সংস্পর্শে য়েচ্ছোচিত রীতিনীতি, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সংমিলিত হইয়া, যবন-হিন্দু য়েচ্ছোচার সমৃদ্ধ যবন-হিন্দুত্বে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং বিস্তৃত হিন্দুর অবস্থা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্দাপেক্ষা বাদ্রালা দেশেই এই অদ্ভুত বিমিশ্রণ কাণ্ড অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে। বাদ্রালা হিন্দু এখন কেবল নামে মাত্র হিন্দু, কিন্তু আচারগত, অনুষ্ঠানগত, প্রকৃতগত মূলকথা সকল বিষয়েই য়েচ্ছ-যবনাচার বিশিষ্ট হিন্দুজাতিতে পরিণত। এইজন্য বাদ্রালার অবস্থা। কিন্তু, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা জানি না, আমেরিকাবাসী আল-কাট নামে জনৈক সাহেব কিছুদিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়া এক তুমুল ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া হিন্দুকে জাতির গৌরবে উত্তেজিত করিতেছেন। আধ্যাত্মবিদগণের অদ্ভুত অমাহুবি ক্রিয়া কলাপের বিষয় বিজ্ঞান সিদ্ধ এবং যোগ বলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, সর্বসমক্ষে ঋষিদের অসীম গুণানুকীর্ণ ও জয় ঘোষণা করিতেছেন। বর্তমান সময়ের বিপথগামী আধ্যাত্মজ্ঞানদিগকে শত সহস্র ধিকার দিয়া, নিজ মর্যাদা, নিজ গৌরব এবং পিতৃপুরুষদিগের পথ স্মরণ করিয়া পুনরায় আধ্যাত্ম আচরিত পথে বিচরণ করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইং একজন বিদেশী য়েচ্ছের মুখে আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের গৌরব বার্তা এবং অমাহুবি ক্ষমতা এবং তাঁহাদের বিস্তৃত সভ্যতার বিষয় প্রবণ করিয়া অনেকের মন ফিরিয়াছে, শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে চিত্ত কতক পরিমাণে ব্যাহুল হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাঁহাদের মনের সঙ্গে সঙ্গাইত এই এত দিনের কুআচরণের সংস্কার রানিত নষ্ট হয় নাই, মনের সে তামসিক আবরণ অপহৃত হয় নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে চিত্ত কেবল অন্ধকারে ডুবিতেছে। কিন্তু য়েচ্ছশিক্ষার একমাত্র উপার্কিত সম্পত্তি যে আত্মাভিমান সে ইহু হারান নাই। সেই আত্মাভিমানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাস্ত্রের অতি গূঢ় রহস্যও বুঝিতে প্রয়াস পায়; অথচ সে সমস্ত বুঝিবার সমর্থ ইহু হারাইয়া বসিয়া আছে। তাই বুঝক আর নাই বুঝক বড় ২ বিষয়ের



আলোচনার ব্যতিব্যস্ত । ইহাতে আত্মাভিমানটা দিন ২ বাড়িতেছে মাত্র ।  
কিন্তু কে কাহার কথা উনিবে ।

## সোমনাথ ।

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চিরপ্রসিদ্ধ । ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট সোমনাথ চির পবিত্র । ভারতের প্রথম প্রধান রাজগণ সোমনাথের পূজা দিয়া অষ্টাষ্ট বর প্রার্থনা করিতেন । গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে পর্বতের উপরি-ভাগে সোমনাথের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল । সমুদ্রে বিশাল অনন্ত সমুদ্র সর্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৈরত রবে পর্বতের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে । আরাধ্য দেব সোমনাথের অধিষ্ঠিত পর্বত মনোহর বৃক্ষলতার পরিপূর্ণ । উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে পাদপ পরিবৃত্ত সুনীল পর্বতে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির । হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

সোমনাথের মন্দির বৃহৎ ছিল না । মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ও বিস্তার ৭৪ ফীট মাত্র । ইউরোপ খণ্ডের মন্দিরের তুলনার ভারতের এই দেব মন্দিরটি অবশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । হিন্দু উপাসকগণ জনতাগ্নির ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্ত ভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না । বীরবে, নির্জনে তলাতচিস্তে রমণীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন । সুতরাং, তাঁহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই গঠিত হইত । এই জন্যই বোধ হয়, পবিত্র দেব সোমনাথের মন্দিরটি ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হইয়াছিল ।

মন্দিরটি কঙ্কর প্রস্তরে নির্মিত ও চারিদিকে বিভক্ত । প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ কাক কার্ঘ্যে খচিত এক একটি মূর্তির মণ্ডপ ছিল । মণ্ডপ গুলির ভরাবিশেষ এখনও পরধর্ম বিধেবী মুসলমানের প্রণাঢ় ধর্মাত্মতার পরিচয় দিতেছে । মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি খোদিত থাকিতে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত । এক অংশে কতকগুলি প্রণীবন্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল । উহার নাম গজগৃহ । অপর অংশে

বিভিন্ন বেশে সজ্জিত বিভিন্নভাবে স্থাপিত কতকগুলি মন্দির ছিল। উহার নাম অৰ্ধশালা। অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ সুরস্বন্দরীগণের মৃত্যুস্তম্ভের প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহার নাম রাস মণ্ডপ। খোদিত মূর্তিগুলি অগঠিত ও বৃদ্ধাকার। কিন্তু ধর্ম্মাঙ্ক মুসলমানের অত্যাচারে সকল গুলিই ভীড়িত হইয়াছে। রাসমণ্ডপের সুরস্বন্দরীগণের ভগ্ন হস্ত পদ ও মস্তক ইত্যদ্যঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া জ্ঞানশূন্য মুসলমান আক্রমণ কারীদের ভীষণ লোহ দণ্ডের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগেব মণ্ডপটি ভগ্ন হয় নাই। ঐ মণ্ডপের ওপর আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অহুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের উপকরণ লইয়া ঐ অংশ নির্মাণ করিয়াছে। বস্তুতঃ ঐ অংশে মুসলমান কৃত শিল্প কার্যের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের পবিত্র লিঙ্গ মূর্তী ছিল, তাহা এখন ভগ্ন দশায় পতিত হইয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য এখন কিছুই নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ পরিবর্তন শীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের একস্থলে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্রগৃহ আছে। গৃহটি ২৩ ফীটদীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নির্জ্বল খ্যান ধ্যাননার জন্যই বোধ হয়, উহা নির্মিত হইয়াছিল।

একটি বৃহৎ চতুর্ভুজ উচ্চ খণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে বহুসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্তি বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত ছিল। এখন উহা মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, জুমা মজিদের জন্য মুসলমানেরা এইস্থান হইতে পাঁচটি লইয়া গিয়াছিল। স্থলতান মহম্মদ পবিত্র সোমনাথ মন্দির কিরূপে ধ্বংস করেন, তাহাইতিহাস পাঠকের অবদিত নাই।

সেহুখকাহিনী স্মরণ হইলে জন্ম সিহরীর উঠে। এখন সোমনাথের মন্দির ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে। আর্ধ্যভূমির সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভাছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পুণ্যাশীনা মহল্যাবাইয়ের বৃত্তে এই স্থানে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদিগের সম্মানার্থে এখন এই দেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্ত গৌরব আর কিরিয়া আহলে নাই।

গজনির সুলতান মহামুদ দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আসিয়া সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। হিন্দুগণ আপনাদের পবিত্র দেবতার গৌরব রক্ষার জন্য অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচ মাসপর্যন্ত মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের পরাক্রমে নিরস্ত থাকে। শেষ চতুর সুলতান মহামুদ আপনার সৈন্যদল ফিরাইয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে ঘাইয়া শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুরা দেখিলেন দ্রুত মুসলমান আপনার সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন; তাহাদের পবিত্র মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা প্রচুর চিতে আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। সুলতান মহামুদ এই সুযোগে জাকর ও মজফ্ফর নামক দুই ভ্রাতার অধীনে দুই দল সাহসি সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। মুসলমান ভ্রাতৃবয় অলক্ষিত ভাবে দ্বারদেশে আসিয়া পহুঁছিল। বৃহৎকার হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মহামুদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অসময়ে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুত বীরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিত তরঙ্গিণী অবিলম্বে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরম্ভ্য দেবতার জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত শত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাহাদের এই শেষ উদ্যমও সফল হইল না। ভয়াবহ শোণিত তরঙ্গিণীর মধ্যে আর্ধ্যবীরপুরুষগণের দেহরত্নের সহিত চির পবিত্র আর্ধ্যকির্তির চিহ্ন বিনষ্ট হইয়া গেল।

কথিত আছে সোমনাথের মূর্ত্তি দশ হস্ত পরিমিত ছিল। সুলতান মহামুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, অমুচর দিগকে দণ্ডাঘাতে ঐ বিগ্রহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিলেন। উপাসক ব্রাহ্মণেরা এই আজ্ঞার ভীত হইয়া বিগ্রহ রক্ষার জন্য সুলতানকে বহুমূল্য অর্থ দিতে চাহিলেন। সুলতানের সহচরগণের অনেকে অর্থ গ্রহণ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহামুদ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি নড় বিগ্রহ বিদেশী ছিলেন। হিন্দুদিগের বিগ্রহ বিনষ্ট করিলে পুণ্যালাভ হয়, তাঁহার এইরূপ সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি অর্থের বিনিময়ে বিগ্রহ বিনাশে কান্দ থাকিলেন না। অবিলম্বে পবিত্র বিগ্রহকে দ্বিধা ভগ্ন করা হইল। বিগ্রহ ভগ্ন হইলে দেখা গেল, ভগ্নাংশে নানা জাতীয় মনি মুক্তা ও রত্নাদি রহিয়াছে। অর্থলোভী মহামুদ এইরূপে আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া মন্দিরের অন্যান্য মূর্ত্তিও ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন। ঐ সকল ভগ্ন মূর্ত্তির মধ্যে ও অনেক অর্থ পাওয়া গেল। দ্রুত সুলতান এইরূপে সোমনাথের বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া, ভগ্নাংশ মন্দির মন্দির প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন।

ধর্ম-ঘেবী মুসলমানের আক্রমণে সোমনাথ বিহ্বল অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিহ্বলের অধিষ্ঠান অন্য মন্দিরের পবিত্রতা আজ পর্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। সোমনাথের পবিত্র নাম আজ পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে পবিত্র ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে, আজ পর্যন্ত সোমনাথের মন্দির হিন্দুর একটি তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে।

## একটি প্রস্তাব।

হিন্দু সমাজের শুভদিন, যে, বর্তমান সময়ে অনেক কৃত-বিদ্য মহাত্মা সমাজের প্রকৃত কল্যাণেচ্ছু হইয়া নানা ভাবে সদুপায়ের পরিচেষ্টা করিতেছেন। দেশ বিদেশে, নগরে পল্লিতে ধর্মালোচনার জন্ত বহুবিধ হারসভা ধর্মসভা প্রভৃতি সংস্থাপিত হইতেছে। শ্রবস্তা পণ্ডিত মণ্ডলী আত্ম স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া বহু আরাণ স্বাকার পূর্ণক দূর দূরান্তরে গমন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়। আশা হয় যে, কালে বঝি এই বহু শতাব্দি হইতে অধঃপতিত হিন্দু সমাজ পুনরায় নিজ পৈতৃক বীৰ্য্যবলে জাগরিত হইবে। আবার বঝি “উত্তীর্ণত জাগ্রত বরাগিবোধত” এই উপনিষদ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু যখন দেশের শিক্ষা, রাজার উদ্দেশ্য, সময়ের শ্রোতের বিষয় চিন্তা করি তখন সমস্ত আশাভরসা কোথায় চলিয়া যায়। এই রেচ্ছাচারের, কুশিক্ষার এবং দার্পপূর্ণ শাসনের অধীনে হিন্দু সমাজের কল্যানাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই ঘোর বিপদ সময়ে কি উপায়ে হিন্দু সমাজকে এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, ইহা লইয়া অনেক সমাজনীতিজ্ঞগণ বহুদিন হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন হইতে কলিকাতায় একটি আর্ধ্যসমিতি নামে সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য যদিও আপাতত অতি অল্প সংখ্যক সভ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু উপস্থিত সভ্যেরা বেক্সপ উদ্যমশীল ও উৎসাহী তাহাতে কালে ইহা যে, সমাজের অতীব হিতকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণের অবগতির জন্য সমিতির নিয়ম সম্বন্ধে কতকটা সুসং বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

বিলুপ্ত প্রায় আর্ধ্যধর্মের পুনরুজ্জ্বলিত সাধন, ও যুসুপ্রায় আর্ধ্য জাতির পুনর্নয়ন সঙ্কল্পের উপায় উদ্ভাবন ও সেই সেই উপায়কে কার্যে পরিণত করিবার জন্যই এই আর্ধ্য সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। ইহা কেবল কার্যক্ষেত্র মাত্র। ইহাতে কোনরূপ বক্তৃতা, উপদেশ, ব্যাখ্যা কি অন্য কিছুই হইবে না। কেবল কি উপায়ে সমাজকে পূর্ববৎ শৃঙ্খলার আনয়ন

করা বাইতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। এবং যে যে উপায় দ্বারা হিন্দু সমাজের মঙ্গল হইতে পারে সেই সেই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করা হইবে। বহুদেশে বহুগুলি হরিগতা ধর্মসভা আছে সে সমস্তগুলি বাহাতে একযোগে নির্দিষ্টকালে কার্য্য করিতে সক্ষম হন তাহার জন্য আর্থ্য সমিতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। আর্থ্যসমিতির সংক্ষিপ্ত নিয়ম

১। হিন্দুবাংলা ও হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেই আর্থ্যসমিতির সভ্য হইতে পারা যাইবে।

২। সভাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। প্রথম শ্রেণী “নির্দিষ্ট সভ্য” ও দ্বিতীয় শ্রেণী “সাধারণ সভ্য” এই দুই নামে অভিহিত হইবেন।

৩। বাঁহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং হিন্দুশাস্ত্রে পূর্ণ আস্থাযুক্ত তাঁহারাষ্ট্র প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ “নির্দিষ্ট সভ্য” মধ্যে গৃহীত হইবেন। তদ্ব্যতিরিক্ত সকলেই “সাধারণ সভ্য” শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবেন। “নির্দিষ্ট সভ্য” দিগকে সভার কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা উপদেশাদি দিতে হইবে এবং তাহাদেরই উপদেশ লইয়া সমিতির কার্য্য চলিবে।

৪। বাঁহারা “নির্দিষ্ট সভ্য” হইবেন, তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সময় ৫ টাকা দিয়া সভ্য হইতে হইবে এবং তৎপর প্রতি মাসে ১ টাকা করিয়া, সভার কার্য্য নির্বাহের ব্যয়ের জন্য চাঁদাদিতে হইবে। কিন্তু “নির্দিষ্ট সভ্যেরা” সর্ব্বদা সভার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া এই টাকা সম্বন্ধে তাঁহাদের উপর কোনরূপ বাধ্যবাধিতাব থাকিবে না। বাঁহার কমতার কুলাইবে তিনি দিবেন, বাঁহার না কুলাইবে তিনি দিবেন না।

৫। “সাধারণ সভ্য” দিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সময়, এককালীন ২ টাকা দিয়া সভ্য হইতে হইবে এবং প্রতি মাসে ১০ চারি আনা করিয়া চাঁদা স্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। যিনি এ নিয়ম পালন না করিবেন তিনি কদাপি “সাধারণ সভ্য” শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। আর্থ্যসমিতির কোন নির্দিষ্ট রূপ অধিবেশন হইবে না। কার্য্য-ভূমির আবশ্যক বোধে অধিবেশনাদি হইবে। এবং পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলেই সমিতির কার্য্য চলিবে।

৭। আর্থ্যসমিতি হইতে কাগজ, পুস্তক, পুস্তিকা ইত্যাদি বাহা কিছু প্রকাশিত হইবে সকল সভ্যই সে সমস্ত বিনা মূল্যে নিঃস্বত পাইতে থাকিবেন।

৮। সকল সভ্যকেই সমিতি সংক্রান্ত সকল কথাই গোপনে রাখিতে হইবে। সমিতির কার্য্য অতি সঙ্কোপনে চলিবে, তবে আবশ্যকমত প্রকাশিত হইবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া আৰ্য্যসমিতি হুই চারিজন যাত্র মহাশয়ের সাহায্যে প্রায় চারি মাস কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তবে বতরুণ সমিতি কোন রূপ একটা সমাজের বিশেষ হিতকর কার্য্য করিতে সক্ষম না হইবেন ততদিন সমিতির কার্য্য কলাপের বিষয় সাধারণে কিছুই প্রকাশিত হইবে না।

আপাতত সমিতি নিম্নলিখিত তিনটি উপায় বাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য চেষ্টিত হইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু, এরূপ ক্ষুদ্র সমিতির দ্বারা এতবড় গুরুতর কার্য্যাদি কদাপি সংসাধিত হওয়া সম্ভব নহে। তবে, সমিতি নিজ ক্ষুদ্র চেষ্টায় বতরুণ সমাজ তাহার অন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ অনেক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ধনকুবের আছেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ গ্রামের এবং প্রজাবর্গের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ কামনায় এই সমস্ত সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নমান হন, তবে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। যদি কোন স্বদেশহিঁতবী মহাত্মা ইহা পঠ করিয়া স্বেচ্ছাও স্বাধীন ভাবে ইহার মধ্যে কোন একটি উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হন, এই আশায়, তাঁহারই অবগতির জন্য অন্য এই স্থলে সে উপায় কএকটা প্রকাশিত হইল।

১ম। আৰ্য্যভাবার পুনঃ প্রচারার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে চতুশ্চাঠী স্থাপিত হউক। এই সমস্ত চতুশ্চাঠীতে প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিবিধ আৰ্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদত্ত হউক। চতুশ্চাঠীর দুইটা বিভাগ থাকিবে। প্রথম বিভাগ, যে সমস্ত ছাত্র রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নব্রত অবলম্বন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহাদের জন্য। এই সমস্ত ছাত্রদ্বিগকে রীতিমত শাস্ত্রোক্ত প্রথা অনুসারে য য ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নব্রত পালন করিতে হইবে। স্থানীয় কোন সমিতি ইহাদের সর্ব্ব প্রকার ব্যয়ভার বহন করিবেন। চতুশ্চাঠীর দ্বিতীয় বিভাগ, শাস্ত্রানুরাগী ও শ্রমশীল ছাত্রদ্বিগের জন্য। ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়মত আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইবেন এবং সাধারণত আৰ্য্য আচার ব্যবহার পালন করিবেন। স্থানীয় সমিতির আর্থিক অবস্থানুসারে ইহাদিগকে ন্যূনাত্মক অর্থ সাহায্য করা ব্যবস্থা থাকিবে।

২য়। ইংরাজ রাজ্যে ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে চলে না, অথচ ইংরাজী বিদ্যার কেমনই মোহিনী শক্তি, ইংরাজী শিখিলেই আচার, ব্যবহার, চিন্তার গতি, সমস্তই ইংরাজী হইয়া যায়। বাহাতে ইংরাজী শিখিয়াও প্রকৃতি ইংরাজী না হয়, এই জন্য এসিষ্ট ২ হিন্দু সমিতির নিজের তত্তাবধানে ভারত-বর্ষের নানা স্থানে আদর্শ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা হউক। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে স্থানীয় রিক্সবিদ্যালয় সমূহের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আৰ্য্য শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হউক। এই সমস্ত বিদ্যালয়দের শিক্ষকগণকে বাছিয়া

কাহিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুগামী দেখিয়া নিবৃত্ত করা হইবে। বাহাতে সর্বতোভাবে বালকগণের মধ্যে আর্থ্য ভাব অনুভূত হয় তাঁহারা সর্বদা সেই চেষ্টা করিবেন। এই ছাত্রাবাসে আহার ও ব্যবহার ঠিক প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রক্ষিত হইবে। নিষ্ঠাবান হিন্দু কর্তৃপক্ষের অধীনে ইহা চালিত হইবে। বাহাতে ছাত্রগণ স্বল্পব্যয়ে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে থাকিতে পার, এমন ব্যবস্থা হইবে। ছাত্রগণের চরিত্র ও রীতিনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিবে। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও তজ্জন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিবেন।

৩য়। পুস্তক প্রচারের দুইটা বিভাগ থাকিবে। প্রথম বিভাগ হইতে উপযুক্ত ও প্রসিদ্ধ ২ পণ্ডিতগণ দ্বারা আর্থ্য শাস্ত্র সমূহের প্রকৃষ্ট অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রচার হইবে। দ্বিতীয় বিভাগ হইতে উপযুক্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা দেশীয় ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সমূহ প্রস্তুত ও বাহাতে সেই সমস্ত পুস্তক দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রবর্তিত হয় একরূপ চেষ্টা হইবে। আপাততঃ বিদ্যালয় সমূহে যে সমস্ত পুস্তক পঠিত হয় তৎসমস্তই ইংরাজী পুস্তকের নকল মাত্র। আদর্শ, উদাহরণ, তর্কপ্রণালী সমস্তই ইংরাজী। বাহাতে দেশীয় আদর্শ, দেশীয় উদাহরণ, দেশীয় তর্কপ্রণালী প্রথম হইতেই বালকগণ দেখিতে ও শিখিতে পার এই বিভাগ হইতে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইবে।

তিনটীই অতি গুরুতর ব্যাপার। একজনের কিবা একটা ক্ষুদ্র-সমিতির কদাচ সাধ্য নহে যে একক এই গুরুতর ব্যাপার সহজেই সংসাধিত করিতে পারেন। ইহার প্রত্যেকটিই বহুবায় ও বহুপরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা বঙ্গের প্রত্যেক হরিসভা ও ধর্মসভার সম্পাদক ও পরিচালক মহোদয়গণের মনযোগ আকর্ষণ অন্য সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি; যদি সকলে একত্র হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায় তাহা হইলে ইতার মধ্যে অল্পান কোন একটাও সংসাধিত হইতে পারিবে। কিন্তু সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সমিতি সর্বপ্রথমে বাহাতে বঙ্গ দেশের নানা স্থলে চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আপাততঃ অত্র কলিকাতা সহরে একটি উত্তরূপ চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে, সমিতি, মহারাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ন্যায় ধনাঢ্য ও স্বদেশবৎসল এবং ডাক্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় জ্ঞানবান, স্বার্থানুরাগী ও স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদের পূর্ণ উৎসাহ পাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অনেক কৃতবিদ্যা মহোদয়গণও আনন্দে এই মহৎকর্তব্যে যোগ দিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছেন। এখন সর্ববিধ বিনাশন ভগ্নরান ভরির রূপায় সমিতির আশা কলবতী হইলেই সমিতির সংগঠন পার্শ্বক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।



২য় ভাগ।

১২৯৪ সাল।

২য় খণ্ড।

## হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম।

৪৥০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

১। প্রতিদিন রাত্রি প্রায় ৪৥০ টার সময় নিজা হইতে আগরিত হইতে হইবে। আগরিত হইয়াই নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিতে হইবে।

ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরাস্তকারী  
ভাহুঃ শশী ভূমিস্থতো বৃধশ্চ  
গুরুশ্চ গুরুঃ শনিরাহকেতবঃ  
কুর্কন্ত সর্কৈ সম অপ্রভাতং।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নবগ্রহ, রাহ, কেতু, ইহাদের নাম গ্রহণ করা মনুষ্যের প্রথম কর্তব্য। দেবতার নাম স্মরণান্তর গুরুর নাম স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিবে।

নমোহস্ত গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।

যন্ত বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকং ॥

“অর্থাৎ বাহার বাক্যামৃত পান করিলে, সাংসারিক জ্বালা বহুলা তিরোহিত হয় সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি। গুরু ও ইষ্টদেব এ উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। উপাসকের নিকট এ উভয়েরই বাহ্যিক একরূপ।”

দেববন্দন ও গুরুবন্দন সমাপন করিয়া একবার নিজের বাহ্যিক স্মরণ করিবে। তাহিবে

“অহং দেবো ন চাক্ষোনি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকতাত্

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্য মুক্তস্বভাবান্।”



“অর্থাৎ আমি দেবতা, আমি ব্রহ্ম, আমি সচ্চিদানন্দ, আমি নিত্যমুক্ত, আমি অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মবরূপ, আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি।” যে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যদি নিজ বংশের গৌরব ও মহিমা অহরহঃ স্মরণ করে, তবে তাহার নীচ বা নিম্নিত কার্য্যে মতি হয় না। সেই রূপ যদি আমরা আমাদের গৌরব ও মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ রাখি, যদি আমরা মনে রাখি যে আমাদের হৃদয় সিংহাসনেও সেই নিকল নিরবদ্য পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে আর আমাদের পাণে বা অধর্ম্মে মতি হইবে না। এই জন্মই আমাদের নিজ গৌরবের কথা এক একবার স্মরণ করা কর্তব্য। আত্ম গৌরব এইরূপ স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকটে আত্ম নিবেদন বা আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বলিতে হইবে।

“লোকেশ চৈতন্ত্যময়াদিষ্টেব  
 শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞেব  
 “প্রাতঃ সমুখায় তব প্রসারঃ  
 সংসারবান্ধা মহুবর্ত্তনিয়ে।  
 জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রকৃষ্টিঃ  
 জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃষ্টিঃ।  
 যয়া দ্বীকেশ জুদিস্থিতেন  
 স্বধা নিযুক্তোঽস্মি তথা কনোমি।”

“অর্থাৎ হে প্রভো তুমিই সব, আমি কিছুই নহি, আমার জ্ঞান আছে কিন্তু শক্তি নাই। শুদ্ধ শক্তি নাই তাহা নহে, রূপধেই আমার মন সর্ব্বদা ধাবিত হয়। এক্ষণে তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তবেই আমি ধর্ম্ম পথে চলিতে পারি। হে প্রভো, আমি তোমার আজ্ঞার, তোমারই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করি। আমার কোন কর্তব্য নাই, তবে আমি আর যেন বৃথা যায়। বশতঃ আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান না করি, এবং যেন তোমার দাসের জ্ঞান দস্ত ঘোহ বিসম্মদন করিয়া সংসার ধর্ম্মে বিচরণ করিতে পারি। আমি কর্ত্তা বলিয়া আমার যে অভিমান আছে সেই অভিমানই অনর্থ ও সর্ব্বনাশের মূল। হে লোকেশ, হে চৈতন্যময় আমাকে প্রকৃত কথা বুঝিতে দাও। আমার চক্ষু আবরণ উন্মুক্ত কর।”

২। এই রূপে দেব, গুরু, প্রভৃতির বন্দন করিয়া এবং নিজেয় গৌরব ও মহিমা স্মরণ করিয়া ও ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় সমর্পণ করিয়া একবার সমস্ত দিনের করণীয় কার্যের বিষয় চিন্তা করিবে। প্রথমে ধর্ম অর্থাৎ নিজেয় ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধক বিষয় সমস্ত চিন্তা করিবে। পরে ধর্ম পথে থাকিয়া কিরূপে অর্থোপার্জন করা যাইতে পারে তাহা বিষয়ে চিন্তা করিবে। পরে ধর্ম ও অর্থ বজায় রাখিয়া কিরূপে ইচ্ছিত ভূক্তি সম্পাদন করা যাইতে পারে, তাহা বিষয়ে চিন্তা করিবে।

“প্রবুদ্ধশিষ্যৈরুদ্যমঃ অর্থক্কাশ্চাবিরোধিনঃ ।

অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ ॥”

৩। ধর্ম অর্থ কাম বিষয়ক চিন্তা সমাপন করিয়া শয্যা হইতে গাত্ৰো-  
থান করিবে এবং “প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ” এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার  
করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। এই সময়ে কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী  
নল, ঋতপর্ণ, কার্তবীৰ্য্যার্জুন প্রভৃতি পুণ্যলোকগণের নামোচ্চারণ করিবে।  
কারণ সাধুদিগের নামোচ্চারণ করিলে অসারু ও সাধু হয়।

“কর্কোটস্ত চ নাগস্ত দময়ন্ত্যা নলস্ত চ ।

ঋতপর্ণস্ত রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনং ॥

কার্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভুং ।

বোহস্ত সংকীর্তয়েন্নাম কল্যামুখায় মানব ।

ন তস্ত বিত্তনাশঃ স্ত্র্যায়ষ্টক লভতে পুনঃ ॥”

৪। এইরূপে পুণ্যলোকদিগের ও বীরবরের নামকীর্তনের পর বিদ্বজ্জ  
ভ্যাগ, শৌচ, আচমন (মুখ প্রক্ষালন) ও দস্তধাবন। আচমনান্তে দস্তধাবন  
বিধেয়। দস্তধাবন পক্ষে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বৃক্ষ প্রশস্ত—বধা খদির,  
কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিষ্ঠিড়ী, বেণুগৃষ্ঠ (৭), আত্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিম্ব, অর্ক  
(আকন্দ), উড়ুঘর। প্রতিপদ, অমাবস্তা, ষষ্ঠী নবমী অথবা চতুর্দশী, অষ্টমী,  
পূর্ণিমা, অমাবস্তা এই কয় তিথিতে দস্ত ধাবন করিবে না। শুদ্ধ মৃত্তিকা ও  
ষাদশ গভূব জলের দ্বারা মুখগুহা সংসাধন করিবে। শুবাক, তাল, হিজাল  
(৭), তাড়ী, তাল, কেতকী, খর্জুর নারিকেল, এই সমস্ত দ্বারা দস্তধাবন  
নিষিদ্ধ। দস্তধাবনের উপযুক্ত কাঠ না পাইলে অনামিকা ও অমুঠ দ্বারা  
দস্ত ধর্ষণ করিবে। দস্ত ধাবন পক্ষে অনামিকা ও অমুঠ ভিন্ন অন্য অমুলির  
ব্যবহার করিবে না। ভূণ, অন্ধার, কপাল [অহি], প্রতর, লৌহ, বালুকা,

অথবা চন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা দস্তধাবন করিবে না। যাহারা সূর্য্যোদয়ে স্নান কালে দস্তধাবন করে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাদের হস্তে তর্পণাদি গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ পক্ষে দস্তধাবন মন্ত্র যথা,—

“ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যুহধ্বং সোমোন্নাজায় মাশমৎ।

সমেন্থং প্রমথ্যাত যসসা চভাগন চ ॥”

৫। দস্ত ধাবনান্তে স্নান। স্নানের কাল সম্বন্ধে বিষ্ণু সংহিতা বলেন—  
“প্রাতঃস্নায়ী অরুণ-কিরণ-প্রভাৎ প্রাচীং অবলোক্য স্নায়াৎ” অর্থাৎ অরুণ কিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিক দর্শন করিতে করিতে স্নান করিবে। পীড়িত অথবা অস্ত্র কোন কারণে অশক্ত হইলে অগ্নিরক্ষ স্নান করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে আর্ত্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে। “আত্মরাগান্ত শিরো-বিহার্য গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ সর্ব্বগাত্র মার্জনং অর্জেণ বাসগা কুর্ধ্যাৎ”।

৬। স্নানকালে ও স্নানান্তে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিবে। স্নানকালে নানা বিধ মন্ত্র আছে। হিন্দুর প্রত্যেক ক্রিয়াক্রমে প্রারম্ভে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। ৪১০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত কার্য্য করিতে হইবে।

৬টা হইতে ৭১০টা পর্য্যন্ত।

১ম। হোম। যাহারা সার্ব্বিক তাঁহাদের পক্ষে এই বিধি।

২য়। কেশপ্রসাধন।

৩য়। মঙ্গলকর বস্ত্র দর্শন। মঙ্গলকর বস্ত্র আটটি যথা, ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, ষণ, স্বত, সূর্য্য, জল রাজা। “সম্বৃত সন্নিকর্ষোহি ক্ষণাঙ্কিমপি শত্বেতঃ”, সাধুর সহিত ক্ষণাঙ্ককাল অবস্থানও অতীব শ্রেয়ঃকর।

৪র্থ। শুক, সন্ন্যাসী, যতী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ আলাপ ইত্যাদি।

৭১০ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়ন, অভ্যাস ও অধ্যাপনা।

দানেন তপসা জৈজ্ঞেয়পবাসৈস্ব তৈত্তথ্য।

ন তাং গতি মবাপ্নুয়াৎ বিদ্যয়া বামবাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ

“দান, তপসা, যজ্ঞ, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার না হয়, অধ্যয়ন (শাস্ত্রাধ্যয়ন) দ্বারা সেই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৮। হইতে ১০৥০ ।

পৌষ্য বর্গের ভরণ-পোষণ জন্ত অর্থ সংগ্রহ । মাতা, পিতা, গুরু, ভাৰ্য্যা, প্রজা, দীন, আশ্রিত, অতিথি, অভ্যাগত ও অগ্নি ইহাদিগকে পৌষ্য বলে । যে পৌষ্যবর্গের ভরণ করে তাহার বর্গ হয় । যে ব্যক্তি পৌষ্য-বর্গের গীড়ন করে তাহার নরকপ্রাপ্তি হয় ।

“ভরণং পৌষ্যবর্গস্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনং ।

নরকং গীড়নে তস্ম তস্মাদ্ভবেন তান্ ভরেন ।”

নারদ বলেন

“ধনমূল্যঃ ক্রিয়াঃ সর্বাষট্ঠ তত্ত্বার্জ্জনে মতঃ ।

রক্ষণং বর্জনং ভোগ ইতি তত্র বিধিঃ ক্রমাৎ ।”

“ধন ব্যতিরেকে কোন কর্মই সম্পন্ন হয় না । অতএব ধনোপার্জ্জনে যত্ন করা উচিত । অর্থে ধনের রক্ষণ, পরে তাহার বর্জন ও সর্বশেষে তাহার ভোগ করা উচিত ।” তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদের অধ্যাপন, জীবিকোপায়ের মধ্যেও গণ্য অর্থাৎ অধ্যাপনার দ্বারাও জীবনোপায়ের অধিকাংশ কার্য সংসাধিত হয় ; কারণ, অধ্যাপনের উপযুক্ত দক্ষিণা এবং শুশ্রূষা গ্রহণ করাও শাস্ত্র নিহিত । কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির অধ্যাপন নিষেধ, ক্ষত্রিয়াং তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়নাস্তর ৩ । ৪ বর্টা সাংসারিক কার্যই করিবেন ।

১০৥০ হইতে ১২টা ।

১। অধ্যাত্ম জ্ঞান ।

২। অধ্যাত্ম সন্ধ্যা ও তর্পণ ।

৩। দেবপূজা ।

১২ টা হইতে ১৥০ ।

১। যক্ষ রক্ষ, মনুষ্য জীব জন্ত প্রভৃতির উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিদান ।

২। অতিথি ভোজন ।

৩। নিত্যশ্রাদ্ধ ।

৪। গোপ্রাসদান ।

৫। ভোজন ।

১১০ হইতে ৪১০ টা পর্যন্ত ।

ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা ।

৪১০ হইতে ৭১০ টা পর্যন্ত ।

১। লোক বায়্য অর্থাৎ সাংসারিক ক্রিয়া কর্ম ।

২। সায়ংসন্ধ্যা ।

৭১০ টা হইতে ১০১০ টা পর্যন্ত ।

দিনের বেলায় যে সমস্ত কর্তব্য কার্য অনিন্দ্যাদিত ছিল, তৎসমস্ত সম্পাদন । ১০১০ টার পর ভোজন ও তৎপরে নিদ্রা ।

এই সমস্ত কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যহ হিন্দুর ধর্ম্য কর্ম্য প্রায় ১৮০ আনা সময় যায়, সাংসারিক কার্যে ১৮০ আনা সময় যায় ও ভোজনে ১০ সময় যায় । বাস্তবিক হিন্দু শাস্ত্রে এইরূপ উপাই পরিকল্পিত আছে যদ্বারায় উখান অবধি শয়ন পর্যন্ত কি জীবিকোপায় কি অল্প বিষয়ে, যে কোন কার্যই করুক না কেন, তৎসমস্তই ধর্ম্য কার্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে । হিন্দুর ধর্ম্য কার্য তির অল্প কোন কার্যই সম্ভবে না । হিন্দু সমস্ত কার্যই ধর্ম্য কার্য ।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, যে, যে ১৮০ সময় ধর্ম্য ব্যয় করে, তাহার পক্ষে ধনবান অথবা বলবান হওয়া অসম্ভব ; তাহার দারিদ্র্য দুঃখ অনিবার্য । কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এই রূপে জীবন যাপন করিয়াও অনেকেই বহু সম্পত্তির অধিকারী হইতেন এবং শত শত আশ্রিত অভ্যাগতকে প্রতিপালন করিতেন । বলুন দেখি, বর্তমান সময়ে দুই চারি জন ব্যতীত কে এই রূপ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন ? আমাদের মধ্যে ৫৮০ আনা লোকের “অদ্যায়ং মে ধনুত্তরং ।” আমাদের মধ্যে কর্তার জীবিত কালে গৃহীণের সন্দেশের দানা গলায় বাধে । কিন্তু কর্তার পরলোক প্রাপ্তি হইলেই গিন্নী পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীনাবস্থায় পতিত হন । কেন না কর্তা প্রায়ই বহু ধুণে আবদ্ধ থাকেন । অথচ আমরা বিশ্বের কীট । দয়া, ধর্ম, লোক লজ্জা, সমাজ ভয়, প্রভৃতি এমন কি চক্ষু লজ্জা পর্যন্ত সমস্ত বিসর্জন দিয়া, সকল প্রকার ন্যূনতা, হীনতা, অমর্যাদা স্বীকার করিয়া অহরহঃ কেবল টাকা টাকা করিতেছি । তথাপি আমাদের এরূপ হইবার

কারণ বোধ হয় এই, যে বাহারা ধর্ম বলে বলীয়ান, তাহারা অনায়াসেই অর্থোপার্জনে ও অর্ব সংরক্ষণে সক্ষম হয়। কিন্তু বাহারা শুদ্ধ অর্থপিপাচ, তাহারা ত ধর্মহীন হয়ই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীনও হইয়া থাকে। অধার্মিক ধর্মার্থ উভয় বিবর্জিত হইয়া “হৈতো নষ্ট ততোভ্রষ্ট” হয়।

একগুণার শিক্ষিত যুবকেরা বলেন যে পূর্বে লোকে অধে সচ্ছন্দে থাকিত তাহার কারণ এই যে তৎকালে “জীবিত সংগ্রাম” এত বিতীর্ণ ছিল না। ইহার উত্তরে আমি বলি অধার্মিকের পক্ষে জীবিত সংগ্রাম চিরকালই এইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। হংসও পক্ষী শকুনিও পক্ষী। হংসের মধ্যে কেহ কখন জীবিত সংগ্রাম দেখিয়াছেন? আর শকুনিতে শকুনিতে অহরহই জীবিত-সংগ্রাম। “পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী-জীবে।” কপোতও পক্ষী, বায়সও পক্ষী। ইহাদের মধ্যে কপোতই বা সর্বদা সানন্দ মনে ব্যোম ব্যোম বলিয়া বিচরণ করে কেন? আর বায়সই বা জগৎ সংসার কে প্রভাবিত করিয়াও হা হা রবে দিগুণ্ডল নিনাদিত করে কেন? শিক্ষিত যুবকগণ! বলুন ত একজন ভ্রলোককে সর্ব্বাশ্রয় করিয়া, তাহার জামাতা হইতে হইবে, ইহা “জীবিত সংগ্রামের” কোন পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত? শুনিতে পাই একগুণার যুবক যুবতীর মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় অভিশয় জ্বাল্যমান। জানিনা, একগুণার প্রিয়রা তাঁহাদের দয়িত দিগকে কিরূপে সম্ভাবন করেন। তাহারা কি বলেন—“হে প্রিয়, হে বসন্ত, হে স্বামিন্! তুমি আমার পিতার সর্বাঙ্গক। অতএব হে কৃতান্তোপম, আইস নয়ন-জলে তোমার ত্রিচরণ অভিবিক্ত করি।” যে পক্ষী পিতার সর্ব্বনাশক পতিকে প্রেম করিতে পারে, তাহার প্রেম, প্রেম নহে, কাম, স্তব্রাং তাহা সাধুজনের নিন্দনীয় ও অপবিত্র। আরও দেখুন, ঐ যে রামচন্দ্র বাবু ত্রিশ টাকা বেতনের সরকার। উঁহার বাড়ীতে ৩ জন পাচক ব্রাহ্মণ কেন? উঁহার এত দাসদাসী কেন? উঁহার গারে সোণার গহণা কেন? সম্ভানকে স্তন্য দান করিতেও উঁহার জ্বর ক্লেশ হয় কেন? হে শিক্ষিত যুবক! বলুন ত ডাকহইনের পুস্তকের কোন পরিচ্ছেদে এইরূপ জীবিত-সংগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের মূর্খতা, আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের বিলাসিতা, আমাদের অধার্মিকতা, আমাদের সর্ব প্রকার অনর্থের মূল। আমরা অধঃপাতে বাই ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের পুজ্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও যে আমাদের মূর্খতাকে বিলাসিতার

জঘন্য পক্ষে নিমগ্ন হইতেছেন, ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় । অহো কি ছুঁদৈব ! যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রী পূৰ্বে শুভ্র বসন পরিহিতা হইয়া লোহ, শঙ্খ, কড় প্রভৃতি সামান্য আভরণে ভূষিতা হইয়া, অরুচি অথবা সতী সাবিত্রীর ন্যায় শোভমানা ছিলেন, ইহাকে দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম হইত, আজি তিনিই স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রক্তাঙ্গীর বেশ ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না । এখনও যদি আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে পারি, এখনও যদি আমরা অর্থদাস না হইয়া ধর্মদাস হই, তাহা হইলে সহস্র জীবিত সংগ্রাম ও সহস্র ডাকুইন সম্বন্ধেও আমাদের গৃহে পূৰ্ব লক্ষ্মী বিরাজিত হইতে পারেন । নতুবা ঐ বাসনের ন্যায় “ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট” হইয়া অহরহঃ আমাদেরকে কেবল হাহা করিতে হইবে ।

## নবমী পূজা ।

জগদম্বা ও ভোলা পাগলার কথোপকথন ।

অদ্য মহানবমী পূজা, মহোৎসবের শেষ দিন । আজ পূজা সমাপনও দক্ষিণান্ত হইবে । পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার অষ্টমী তিথি বাট্ হইয়া ছিল, তাই জগদম্বা এবার চারি দিন পর্যন্ত তক্তের বরে বিরাজ করিয়া পৃথিবীর শোক, তাপ, যোহ, অপনোদন করিলেন । আগামী কল্য সমস্তই ফুরাইবে, পৃথিবী অরুচিরময়ী করিয়া জগদম্বা অন্তর্হিতা হইবেন । সকলেই অতিরিক্ত আগ্রহ সহকারে জগদম্বাকে দেখিতেছেন, কাল হইতে এক বৎসর পর্যন্ত মাকে দেখিতে পাইবেন না এজন্ত বোধ হয় যেন সকলে আজ একদিনের মধ্যেই এক বৎসরের জগদম্বা দর্শন সংগ্রহ করিয়া নয়ন মধ্যে পুরিয়া রাখিতেছে । আজ জগদম্বার দর্শক বৃন্দের নয়ন পানে তাকাইলেই বোধ হয় যেন, চক্ষুর পরলে পরলে একটির পর আর একটি করিয়া, জগদম্বার এক একটি ভাব আর এক একটি অদ্ভুতাত্মক সাজাইয়া রাখিতেছে । কিন্তু তথাপি প্রাণ ভরে না প্রাণের পরিভূষ্টি হয় না । যত অভিনিবিষ্ট হইয়া দেখে ততই পিপাসার বৃদ্ধি, আজকার দিনটি যেন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইতেছে, ঘটিকা দশ পলে পরিসমাপ্ত এবং প্রহর ঘটিকার পর্য্যবসিত হইতেছে । আজ ভোলাদাসের প্রাণ আরও ব্যাকুল ! ভোলাদাস এক

এক বাড়ীতে থাকে দেখিতে গিয়া সমস্ত ভুলিয়া গাইতেছেন, দিন কোন পথে অতিবাহিত হইতেছে তাহা জ্ঞানেন না, আহার, নিদ্রা পিপাসাদি সমস্তই বিস্মৃত। ভোলায় মন মায়ের ভাবে উন্মত্ত, নবনবয়স জগদম্বার অল্পময় রূপেই নিমগ্ন, ভোলা সে দিকে তাকান সেই দিকেই থাকে দেখেন, ভোলার নয়ন না ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, মুখেও মায়ের কথা। মায়ের গুণ গান ব্যতীত আর কিছুই ভোলার মুখে শুনিতে পাইবে না, ভোলা একরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু মায়ের সহিত তাঁহার কথোপকথন কেবল জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই হয়। অল্প সকল বাড়ীতেই অতিশয় ধুম ধামের পূজা, সর্বদাই লোক জনের কলরব ও ভীড় থাকে, কিন্তু জ্ঞানানন্দের সাত্বিকী পূজা, তাহাতে বাহ্য আগড়ম্ব বাগড়ম্ব বড় কিছু নাই, স্মৃতরাং অনেকটা নির্জন; জগদম্বার পূর্ণ প্রভাও জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই পরিলক্ষিত হয়; এজন্ত জ্ঞানানন্দের বাড়ীই ভোলারই কথোপকথনের স্থান। আজ বেলা তিনটার সময়ে ভোলাদাস জ্ঞানানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত। এদিকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজন ও দুঃখী দরিদ্রাদির ভোজন মিটিয়া গিয়াছে; জ্ঞানানন্দ ভোলা দাসেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন; ভোলাদাসই তাঁহার মহাশয়ের মূখ্যতম ব্রাহ্মণ; ভোলাদাস প্রসাদ গ্রহণ না করিলে জ্ঞানানন্দ আহার করেন না। ভোলাদাস এত বেলায় আসিয়া জগদম্বাকে সাতীক্রে প্রণাম পূর্বক দণ্ডায়মান হওয়া মাত্রেই, জ্ঞানানন্দ হস্ত গ্রহণ পূর্বক ভোলাদাসকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। অনন্তর পরমানন্দের সহিত উভয়েই জগদম্বার প্রসাদামৃত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জ্ঞানানন্দ পূর্ব দিবস অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন বলিয়া কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত শয়ন করিলেন, অন্যান্য সকলেও সেই কারণেই শয়িত, স্মৃতরাং এখন কিছু কালের নিমিত্ত মণ্ডপ ঘর নির্জন। যদিও অন্যান্য লোক জন জগদম্বার দর্শনে অজস্রই গত্যাত করিতেছে সত্য; কিন্তু তাহারা বাহির হইতেই থাকে দেখিয়া চলিয়া যায়, স্মৃতরাং মণ্ডপে কোন গোলযোগই নাই। তখন ভোলাদাস মায়ের নিকট উপবিষ্ট হইয়া গত দিনের অর্দ্ধালোচিত বিষয়টি উপস্থিত করিলেন।

ভোলাদাস। মাগো! কালকার সেই কথাটি জানিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত উৎকণ্ঠতা রহিয়াছে; পরিপূর্ণ বিষয়াভ্যুগ, পরিপূর্ণ অধ-  
ভক্ষা থাকিলেও, জীব বিক্রমে আপন মমতা আপন বর্জিত বিস্মৃত হইবে,



কিন্তু তোর সংসারের কার্য বলিয়া সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সকল দায় এড়াইবে এবং তোর নিকটে থাকিবে, সেই অদ্ভুত রহস্য না জানিতে পারিলে আমার শাস্তি হইতেছে না, মা। আজ সেই বিষয়টি বলিতে হইবে।

জগদম্বা। বৎস! এ কথা অতি রমণীয় বটে; কিন্তু তুমি একাধমনা হইয়া শ্রবণ করিও, নচেৎ ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবে না।

সংসারের সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুর দ্বারা আমার সেবা করিলেই, জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং সেই বিষয় গুলিও নয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বলিয়া নয় ভাগেই বিভক্ত, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি (৯-১০ পৃ)। এখন তাহার বিশেষ বিবরণ শুন।

এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সংসারের প্রত্যেক লোকেই আপনাপন পুত্র-কলত্রাদিকে আশ্র-সম স্নেহ করিয়া থাকে এবং আপনি যাহা ভাল বাসে সেই সকল ভোগ্য বস্তুর দ্বারাই স্ত্রী পুত্রাদির পরিচর্যা করে। অনেক স্থলে যদি দ্রব্যাদির ত্রুটি থাকে, তবে স্বয়ং ভোগ না করিয়াও নিজের প্রিয় বস্তুর দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করিয়া থাকে, তাহা করে কেন; তদ্বারা তাহাদের নিজের কি ফল সাধিত হয়?

ভোলাদাস।—মা! এ কথা জিজ্ঞাসিলি কেন? ইহাতো সকলেই জানে! স্ত্রী পুত্রাদিকে আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার বিষয় ভোগ করাইতে পারিলে, নিজেরই বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ হয়—নিজের সুখ বোধ হয়,—নিজেই যেন ভোগ করিতেছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এমনই সকলে তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রিয় দ্রব্য ভোগ করাইয়া থাকে। স্ত্রীটি বা পুত্রটিকে যদি নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত করা যায় তবেই নিজের বেশভূষা করার সমান ফল হইয়া থাকে, ঐ বেশভূষা যেন আমি নিজেই করিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া পরম সুখের অনুভূতি হয়। আপনার প্রিয় নানা প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্য, স্ত্রী পুত্রাদিকে যদি আহাৰ্য্য করান যায় তবে মনে হয় যেন আমি নিজেই ঐ সকল দ্রব্য আহাৰ্য্য করিলাম; সুতরাং নিজের আহাৰ্য্য করার ন্যায়ই তৃপ্তি সুখের অনুভব হয়। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও হইয়া থাকে।

জগদম্বা।—স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে বিষয় ভোগ করিলে, নিজের পরিতৃপ্তি ও সুখ হয় কেন?

ভোলাদাস । তাহা আমি বলিতে পারি না, ওরূপ হয় কেন তাহা, মা, তুইই জানিস, তুইই তাহা বুঝাইয়াদে ।

জগদম্বা ।—স্ত্রী পুত্রাদির উপরে আত্মাভিমানই ইহার একমাত্র কারণ ; লোকে স্ত্রী ও পুত্রাদিকে আপনার আত্মা হইতে বড় পৃথক্ ভাবে দেখে না ; তাই স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রিয় বিষয়ের ভোগ করাইতে পারিলেই নিজের ভোগ হইল বলিয়া মনে করে এবং নিজের ভোগের ন্যায়ই তৃপ্তি অথের অনুভব করে । আবার যখন এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটে যখন স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আত্মাভিমান থাকে না, তখন আর ওরূপও হয় না । এখন কারণ বুঝিতে পারিলে ?

ভোলাদাস ।—হ্যাঁ মা, বুঝিলাম ; এখন অন্য কথা বল ।

জগদম্বা ।—আমার প্রতি যাহার ঐকান্তিক অনুরক্তি থাকে, যে আমাকে অকল্পিত-মাতৃভাবে অবলোকন করে, তাহারও আত্মার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, অতরাং তাহার নিজের প্রিয়তম ভোগ্য দ্রব্য সমূহ আমাকে ভোগ করাইয়াই, নিজের ভোগ অথের অনুভব করিতে পারে । বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেই বস্ত্র ভূষণাদির ব্যবহার জনিত অথের অনুভব করে । চৰ্য্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানাবিধ দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করিয়া নিজেই ভোজন অথের অর্থী হইতে পারে । তদ্ব্যতীত, ঋণিক মাতা, পিতা, বা পুত্র কলত্রাদির পরিপূষ্টি এবং বিষয় ভোগের দ্বারা, নিজের সেই অধ্যারোপিত ভোগ অর্থ ভিন্ন, আত্মগত ভোগ-অর্থ কিছু মাগ্রই নাই ; কিন্তু আমার অর্চনায় তাহা নহে ; প্রকৃত শ্রদ্ধা বা অনুরাগ সহকারে আমায় অর্চনা করিলে, সেই অধ্যারোপিত অর্থও হয়, আবার নিজের ভোগেরও বঞ্চনা হইতে পারে না ; এবং স্ত্রী পুত্রাদির ভোগ জনিত অধ্যারোপিত অর্থও হইতে পারে । কারণ এমন অনেক উপহার আছে যাহা আমার সঙ্গে সঙ্গে দাতার নিজেরও ভোগ হইয়া ভোগানুরাগ চরিতার্থ হয়, এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গও তাহা ভোগ করিতে পারে । নানা প্রকারে অসংজ্ঞিত স্বর্ণ রজতাদি খচিত, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্রিত মণ্ডপালয়ে আমাকে সংস্থাপিত করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভক্তও আমার নিকটেই সর্বদা থাকে, অতএব আমাকে উত্তম গৃহে বাস করাইয়া যে অনুপম তৃপ্তি অর্থ তাহাও ভক্তে বটে ; আবার নিজেও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সেই গৃহ বাসের বসতি অর্থ উপভোগ করে । নানা প্রকার অগ্নিকি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা আমার

বেশ ভূষাদি করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি স্বেচ্ছাও অনুভব করে, আবার নিজের এবং স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারাও যে ঐ সকল জীবের দ্বারা গৃহীত হয় না তাহাও নহে। আমাকে নানাবিধ আহাৰ্য্য জব্য নিবেদন করিয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি স্বেচ্ছাও অনুভব করে; আবার আমার প্রসাদ গ্রহণের দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নিজ রসনাও চরিতার্থ হয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক উপহারেই ত্রিবিধ বা ত্রিগুণিত ভোগ স্বেচ্ছাও উপভোগ করিয়া বিষয় ভোগের অনুরাগ সফল করিতে পারে। কিন্তু ঋণস্থায়ী পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদিকে পরিচর্যা করিয়া কেবল অধ্যারোপিত তৃপ্তি স্বেচ্ছাই উপভোগ হয়, তৎসঙ্গে নিজের ভোগ হওয়া, কদাচিৎ কোন বিষয়েই সম্ভবে। আবার যদি কেবল নিজেই ভোগ করে, তাহা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতির ভোগ-জনিত অধ্যারোপিত-স্বেচ্ছাও ভোগ হইল না, অতএব আর কোন প্রকারেও ত্রিবিধ স্বেচ্ছাও হয় না। কিন্তু আমাকে নিখিল ভোগ্য বস্তু সমর্পণ করিলে উভয় প্রকারেই ভোগানুরাগ চরিতার্থ হইতে পারে। এই হইল প্রকৃত ঘটনা, এখন, এই উভয়বিধ ভোগ প্রণালীর মধ্যে অর্থাৎ আমাকে কোন বিষয় না দিয়া কেবল নিজেই স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভোগ করা, এবং আমাকে সমর্পণ করিয়া প্রসাদি ভোগ করা এতদুভয়ের মধ্যে যে বিশেষ ব্রহ্ম আছে তাহা শ্রবণ কর।

আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভোগ করা, আর কেবল নিজে নিজে বিষয় ভোগ করা, এতদুভয়ের ফলের বিশেষ বিভিন্নতা আছে। প্রথম প্রণালীর ভোগে তাহার বিষয়ানুরাগ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, উহা আমার অনুরাগে পরিণত হইবে এবং ভক্ত অবশেষে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার ভোগ প্রণালীর অনুসরণ করিলে বিষয়ানুরাগ-বলি ক্রমেই উচ্ছিন্ন ও অশমনীয় হইয়া জীবকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, নানাপ্রকার পাপ কৰ্ম্মে বিনিযুক্ত করিবে এবং আমা হইতে বহু দূরবর্তী করিয়া তুলিবে। কারণ আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া যে অধ্যারোপিত-তৃপ্তি স্বেচ্ছাও উপভোগ করে, তাহা বিষয়ানুরাগ-জনিত হইলেও, আমার অনুরাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমার প্রতি অনুরাগ না থাকিলে, আমাকে ভোগ করাইয়া কাহারও অণুমাত্র তৃপ্তি স্বেচ্ছাও হইতে পারে না। দ্বিতীয় যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগ থাকিবে, সে সেই পরিমাণেই তৃপ্তি স্বেচ্ছাও পাইবে, অতএব আমার প্রতি অনুরাগই প্রবলতম কারণ হইল

এবং বিষয়ানুরাগও কিছু অন্তরাল স্থিত বা ব্যবহিত কারণ হইল । ভাবিয়া দেখ, পুত্র বংশল ব্যক্তি, যে, পুত্রকে নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইয়া তৃপ্তি স্থখের উপভোগ করে, পুত্র বংশলতা বা পুত্রানুরাগই তাহার মুখ্যতম কারণ এবং বিষয়ানুরাগ তাহার ব্যবহিত কারণ ।

আবার ইহাও জানিবে যে আমার প্রতি ভক্তি বা অনুরক্তি যেমন আমার ভোগ জনিত তৃপ্তি স্থখের কারণ, আবার সেই তৃপ্তি স্থখও তেমন আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ । আমার প্রতি অনুরাগের দ্বারা আমাকে নানাবিধ বিষয় ভোগ করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি স্থখ ভোগ করে, আবার তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করে বলিয়াই ক্রমে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহারা বৃক্ষ ও বীজের ন্যায় উভয়েই উভয়ের কার্য্যও কারণ রূপে নিবদ্ধ । এতদ্বারা এই ফল যাইবে যে উহার বিষয়ানুরাগ ক্রমে ক্রমে খর্ব ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অনুরাগ পূর্ণ হৃদয়ে আমাকে নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে করিতে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার সহিত ঘনিষ্ঠতার রসাবাদ করিবে, সেই রস এত মধুর যে এই ত্রিভুবনেও এমন কোন মধুর বা অমৃত নাই যদ্বারা তাহার তুলনা করা যায় । যখন সেই অনুপম অমৃত রসের স্বাদ গ্রহণ হয়, তখন বিষয় রসের স্বাদ ক্রমে অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, স্ততরাং বিষয়ানুরাগও কমিতে থাকে, এইরূপে আমার প্রতি অনুরাগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অবশেষে বিষয়ানুরাগ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাহা হইলেই জীব কৃতার্ব হইল ।

আবার আমার প্রসাদ আহার করিয়া এবং আশ্রিত সমর্পিত পুষ্প চন্দন ধূপ, গুগ্গুলাদির স্রাণাদি লইয়া যে রসনা, ভ্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি স্থখের উপভোগ করে তদ্বারাও বিষয়ানুরাগের ক্ষয় এবং আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, অবশেষে আমার প্রতি একান্ততা হইয়া বিষয়ানুরাগ এককালে বিনষ্ট হয়, জীব কৃতার্ব হয় ।

ভোলাদাস ।—মাগো ! তখন তাহা কিরূপে সম্ভবে ? না, তোকে ভোগ করাইয়া যে তৃপ্তি স্থখের লাভ হয়, তাহার মূল কারণ তোর প্রতি অনুরাগ ; স্ততরাং তাহার বৃদ্ধি হইলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে তাহা বুঝিলাম ;—কিন্তু আপনি ভোগ করিয়া, আপনি রসনাদি চরিতার্ব করিয়া তদ্বারা বিষয়ানুরাগের বৃদ্ধি ভিন্ন নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই ।

জগদম্বা ।—বৎস ! ইহা অতি আশ্চর্য্য রহস্য ; আমার প্রসাদাদির দ্বারা রসনাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভাবের তারতম্যে বিপরীত ফল সাধিত হইয়া থাকে । সাধারণ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা যখন ইন্দ্রিয় সমূহকে চরিতার্থ করে তখন, সেই সেই জব্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই জব্যাদির আহরণ করে, সুতরাং তদ্বারা বিষয়ানুরাগানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে থাকে ; কিন্তু আমার প্রতি প্রকৃতানুরাগী ভক্ত হইলে, ভোগ্য জব্যের রসাস্বাদ করা তাহার উদ্দেশ্য থাকে না এবং ভোগ কালেও কেবল ভোগ্য জব্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করে তাহা নহে । সে আমারই নিমিত্ত নানাবিধ ভোগ্য-জব্যের আহরণ করে, সুতরাং তাহার জব্যাহরণের কারণ-বিষয়ানুরাগ নহে, কিন্তু আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ; অতএব তাহার জব্যাহরণ করাও আমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশক ; সুতরাং উহা বিষয়ানুরাগের নিবর্তক, আমারই অর্চনা বা উপাসনা বিশেষ বলিয়া গণ্য ; এবং সে যে, উক্ত ভোগ্য জব্যের রসাস্বাদ করে, তাহা আমার প্রসাদের রসাস্বাদের অন্তরালে অবস্থিতি করে, জম্বীরস, বিমিশ্রিত শর্করোদকের আস্বাদ কালে, যেমন মিষ্ট রসের অন্তর্গত অম্লরস থাকে, আমার প্রসাদ গ্রহণ কালেও তেমনি আমার প্রসাদমুখ রসের অন্তর্গতই জব্যের রস থাকে । অবশ্যই শর্করোদক আর অম্লরসের ত্রায় আমার প্রসাদ আর ভোগ্য জব্য পৃথক্ বস্তু নহে তাহা সত্য, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ের ভাবের দ্বারা আমার প্রসাদকে সাধারণ জব্য হইতে পৃথক করিয়া লয় । সে যখন ভোগ করে তখন আমার প্রসাদ বলিয়াই ভোগ করে, ভোগ্য জব্যের রসাস্বাদকে প্রসাদেরই রসাস্বাদ বলিয়া মনে করে, জব্যের রস তাহার অন্তর্নিহিত থাকে, সে আমার প্রসাদেরই রসাস্বাদের দ্বারা আত্মা, অন্তরীন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং দেহকে চরিতার্থ মনে করে । সে যে তৃপ্তি লাভ করে, তাহাও আমার প্রসাদ গ্রহণেরই তৃপ্তি, বস্তুর রস জনিত তৃপ্তি তাহার অন্তরালে থাকে, ইহা তুমি স্বয়ংই বিশেষ রূপে অবগত আছ । অতএব এইরূপ ভোগ, বিষয়ের ভোগ হইলেও, বিষয়-ভোগমধ্যে পরিগণিত হয় না, উহা আমার প্রসাদ ভোগ বলিয়াই আমি গণ্য করিয়া থাকি । সুতরাং এইরূপ বিষয় ভোগের দ্বারা আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া, বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইতে থাকে ।

এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই, আমার নুপুত্র ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,

“অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদেবায়ানিবেদিতম্,” যে তদ্ব্য জব্য দেবতাকে নিবেদন করা হয় না তাহা বিষ্ঠা স্বরূপে গণ্য, আর যে পেষজব্য দেবতাকে নিবেদিত না হয় তাহা মূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়” “বিষয়াকৃষ্ট চিত্তস্ত যদ্ব্যহৌষধমুচ্যতে । সর্কেন্দ্রিয়াপ্য বস্তনাং ভগবতৈতাসমর্পণম্” “বাহ্যার চিত্ত সর্বদা বিষয়ের দ্বারা সমাশ্রিত হয় তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত মহৌষধ বলিতেছি,—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ্য যে কোন জব্য আছে তদ্বারা জগদম্বার অর্চনা করিবে, তবেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইবে।” আবার ভগবাকীতাতেও শ্রীমান্ অর্জুনকে আমি ক্রপান্তরে বলিয়াছি; “ভুঞ্জন্তে কিমিযং পাপা যে পরন্ত্যাত্ম কারণাং” বাহার আপনার উদর পুষ্টি উদ্দেশে পাকাদি করে সেই পাপ বৃত্তি পুরুষগণ সাক্ষাৎ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু দেবার্থে পাকাদি করিলে তাহাকে অমৃত বলে।” “অভ্যাসে য সমর্থোসি যৎ কৰ্ম্ম পরমোভব । মদৰ্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্কন্ সিদ্ধি মবাপ্যসি” যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও তবে আমার কৰ্ম্মপরায়ণ হও, সর্বদা যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিলে, সেই কৰ্ম্ম দ্বারাই জীব বিষয়ানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ সর্বত্রই কথিত হইয়াছে।

এইরূপে ভোগ্য বস্তু সমর্পণ করার প্রণালী বলা যাইতেছে।—বাগিন্দ্ৰিয়ের দ্বারা যদি সর্বদা আমার গুণ কীর্তন এবং ভোজাদি করে তবেই বাগিন্দ্ৰিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করা হইল। এইরূপ করিলে বাগিন্দ্ৰিয়ও চরিতার্থ হয় এবং বাগিন্দ্ৰিয়ের অনুরাগটি আমার অনুরাগে বিমিশ্রিত হইয়া অবশেষে উহা আমার অনুরাগেই পরিণত হয়, বাগিন্দ্ৰিয়ের অনুরাগ তখন বিনষ্ট-প্রায় ক্ষীণাবস্থ হইয়া আমার অনুরাগের অন্তরালে অবস্থিতি করে। কারণ আমার গুণালাপ বা আমার স্তব ভোজাদির নিমিত্ত যে বাগিন্দ্ৰিয়ের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মুখ্য কারণ আমার প্রতি অনুরাগ, বাগিন্দ্ৰিয় চরিতার্থ করার অনুরাগ তাহার গৌণতম কারণ। স্নেহ রসে পুলকিত হইয়া পুত্রকে, “বাবা” “বাহা” “ধন” প্রভৃতি স্নেহাক্ত বাক্যালাপ কালে যেমন পুত্রানুরাগই মুখ্য রূপে হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হয় এবং বাক্ প্রবৃত্তির অনুরাগ অলক্ষিত ভাবে থাকে, তাহার উপলব্ধিও হয় না; আমার স্তোর

করা, আমার গুণ কীর্তন এবং আমার সন্মোদনাদি কালেও সেই রূপই জানিবে। এইরূপ বাক্যালাপে যে শ্রুত বা পরিতৃপ্তি জন্মে, তাহাতে আমার ভাব বিমিশ্রিত থাকিতে উহা বিষয় শ্রুত হইলেও ভগবৎ সাক্ষীত্ব তৃপ্তি শ্রুতের মধ্যে পরিগণিত হয়, অতরাং তদ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

ভোলাদাস।—মা, তুই বাহা বলিস, বুঝিলাম, কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে আরও কতসত কথা বলিতে হয়, সর্বদা কেবল তোরই কথালাপ করিলে চলে না; অতএব সেই সকল কথা, কিরূপে তোকে সমর্পণ করিবে ?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! সে কথাও আমাতে সমর্পিত হইতে পারে, সংসারকে বাহারা আমার সংসার বলিয়া স্থিরতরু বিশ্বাস রাখে, তাহাদের সাংসারিক কথাও আমারই কথার মধ্যে গণ্য, আমার সংসার পরিচালনের নিমিত্তই সেই সকল বাক্যালাপের পরিতৃপ্তি হয়, অতএব তাহাও আমার উপাসনাক্রিয়ারই অন্তর্গত হইবে এবং তাহাও বিষয়ানুরাগ নিবর্তক হইয়া আমার প্রতি অনুরাগবর্দ্ধক হয়।

কিন্তু আমার গুণসকীর্তন এবং বাক্যালাপের ও আবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে, তাহা শ্রবণ কর। বিষয়ের প্রভেদ বাক্য প্রয়োগ প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত। তামস বাক্য প্রয়োগ, রাজস বাক্য প্রয়োগ এবং সাত্বিক বাক্য প্রয়োগ। তামস ভাব বা তামস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে তামস বাক্য বলে। রাজস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে রাজস বাক্য এবং সাত্বিক ভাব প্রকাশক বাক্যকে সাত্বিক বাক্য বলে। ভয়ানকরোজ, এবং বীভৎস রস সন্নিবিষ্ট ভাবকে তামস ভাব বলে; শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, ও হাস্যরস সন্নিবিষ্ট ভাবকে রাজস ভাব এবং করুণ আর শান্তি রস বিমিশ্রিত ভাবকে সাত্বিক ভাব বলে। অতএব ভয়ানক রোজ এবং বীভৎস ভাব প্রকাশক বাক্যই তামস বাক্য, শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরস প্রকাশক বাক্যকে রাজস বাক্য, আর করুণ এবং শান্তরস প্রকাশক বাক্যকে সাত্বিক বাক্য বলে।

লোকের প্রকৃতিও, গুণ ভেদে প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত, তৎসংগত তাহার এক এক প্রকারের অবাস্তবেরও নানা প্রকার প্রভেদ আছে। যথা তামস, প্রকৃতি, রাজস প্রকৃতি এবং সাত্বিক প্রকৃতি। সদ্ধ এবং রজ

সামান্য মাত্রায় থাকিয়া যাহাদের তমোগুণের প্রবলতা থাকে তাহাদিগকে তামস প্রকৃতি বলে, সখ আর তমোগুণের অল্পতা এবং রজোগুণের অত্যন্ত প্রবলতা থাকিলে রাজস প্রকৃতি বলে, আর রজঃ এবং তমোগুণের অত্যন্ত অল্পতা এবং সখগুণের প্রবলতা থাকিলে সাত্বিক প্রকৃতি বলে। ইহারই পরিমাণের তারতম্যে মানুষের অসখ্য প্রকৃতি দেখিতে পাও।

এই প্রকৃতির প্রভেদে বিষয়াবাদের পার্থক্য হইয়া থাকে, একই বিষয় সকল প্রকৃতির লোকে ভাল বাসে না। যাহা রাজস প্রকৃতির প্রিয় তাহা তামস এবং সাত্বিকের অপ্রিয়, যাহা তামসের প্রিয় তাহা রাজস এবং সাত্বিকের অপ্রিয়, যাহা সাত্বিকের প্রিয় তাহা রাজস তামসের অপ্রিয়। কিন্তু তামস ব্যক্তির তামস বিষয়ই প্রিয় হইয়া থাকে। আর রাজস ব্যক্তির প্রিয় রাজস বিষয় এবং সাত্বিক বিষয় সাত্বিক ব্যক্তির প্রিয়। বৎস! আমি ক্লপান্তরে ভগবতীতার সপ্তদশাধ্যায়ের “ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সাম্যতাবজ্রা। সাত্বিকী রাজসী চেতি তামসী জ্ঞেতিতাং শৃণু। সত্বানুরূপা সর্বত্র শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োরয়ং পুরুষোবোবচ্ছদ্মঃ সএব সং ॥”

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি, এবং সাধারণ অল্পভবের দ্বারা ইহা বুঝিতে পার। অতএব, ভয়ানক রস, রোজ রস এবং বীভৎস রস তামস প্রকৃতির প্রিয়তম হয়; শৃঙ্খার, বীর, অদ্ভুত এবং হস্তরস রাজস প্রকৃতির প্রিয়তম; আর ককণ এবং শান্তিরস সাত্বিক প্রকৃতির প্রিয়তম, এইরূপ অজ্ঞান্য বিষয় সম্বন্ধেও বোঝনা করিয়া লইবে। এই গেল বস্তুরহস্ত, এখন অর্পণের প্রণালী শুন।

উপাসকদের মধ্যে, যে, যে গুণের প্রকৃতির, সে, সেই গুণ বিমিশ্রিত বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিবে, কারণ সেই গুণযুক্ত বিষয়ই তাহার প্রিয়তম। প্রকৃতির বিপরীত গুণযুক্ত বিষয় হইলে তাহা অন্যের প্রিয় হইলেও তদ্বারা আমার সেবা করিবে না, কারণ সেই জব্য তাহার অপ্রিয়। যাহা নিজের প্রিয় বিষয় নহে তাহা অন্যের প্রিয়তম হইলেও তদ্বারা আমার সেবা করিলে কিছুমাত্র ইষ্ট ফল সাধিত হয় না, তদ্বারা বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র দ্বাস কিম্বা আমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাদি কিছুই হইতে পারে না কেবল বৃথা অর্থব্যয় ও পরিশ্রম মাত্রই হয়। এই জন্যই আমার পুত্রগণ বলিয়াছেন “কালিকামানবং পশ্চেৎ তথা সেবেত চান্দবং ॥”



এখন, ফল কথা এই হইল যে যে ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতিক সে বাগিন্দিয়ের বিবরণার্থে কালে আমার বীভৎস রস, ভয়ানক রস এবং রোক্ত রসের প্রকাশক যে সকল কৰ্ম আছে তাহার কীর্তন ও আলোচন করিবে এবং সেই ভাবেই সবস্তোত্রাদি করিবে। যে ব্যক্তি রজঃ প্রকৃতিক সে আমার শৃঙ্গাররস, বীররস ও হস্তরস প্রকাশক কৰ্মের কীর্তন আলোচনাদি করিবে। যে ব্যক্তি সধ্ব প্রকৃতির তিনি আমার ককণ এবং শান্তরস প্রকাশক কৰ্মের কীর্তনাদি করিবেন। এজন্যই প্রিয় পুত্র বেদব্যাঙ্গাদি মহাবিগণ সকল প্রকার লোকের উপকার মানন্য আমার সকল প্রকার ক্রীড়া কৰ্মাদি লিখিয়া ইতিহাসের সহিত ৩৬ শং পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই নিয়মের অত্যাধিকার করা যোর তামস প্রকৃতির মানব যদি সাত্ত্ব, ককণ-রস, ও বীরাদি রাজস রসের কীর্তনাদি করিতে থাকে, তবে তাহার বাগিন্দি চরিতার্থ হয় না, বাগিন্দি জনিত তৃপ্তি স্থখও পায় না, তদ্বিবয়ে অমুরাগ ও পরিসমাপ্ত হয় না ও আপন প্রকৃতির অমুরাগোদিত বিষয়ের আলোচনা ও কীর্তনাদির নিমিত্ত তাহার অমুরাগ থাকিয়াই গেল। সেই অমুরাগ বশ-বর্তী হইয়া সে অল্প সময়ে অসদালোচনার নিবৃত্ত হইতে পারে। আর যদি সে বীভৎস রোক্ত রসাদি প্রকাশক আমার গুণামুরাদ করে তবে তাহার বাগিন্দি জনিত তৃপ্তি স্থখ আর আমার গুণামুরাদের তৃপ্তি স্থখ উভয়ই হইল; এবং ঐরূপ গুণামুরাদ যদি আমার প্রতি অমুরাগ পূর্বক করা হয় তবে বাগিন্দিয়ের বিষয়ামুরাগও আমার অমুরাগের অন্তরালে পড়িবে। এবং বাগিন্দিয়ের চরিতার্থতা জনিত স্থখ ও আমার গুণামুরাদ জনিত তৃপ্তি স্থখের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া বাইবে। সুতরাং, উহার বাগিন্দিয়ের ক্রিয়াও আমার উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হইয়া বাগিন্দির ব্যাপারের ফল না জন্মাইয়া আমার উপাসনার ফল অর্থাৎ আমার প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধি করিবে; তখন হৃদয়ের তমোভাব জীর্ণ হইয়া রমোভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আমার রজঃ প্রকৃতির অমুরাগোদিত শৃঙ্গার রস প্রকাশক ক্রীড়ার ও কৰ্মের কীর্তন করিবে। পরে উক্ত নিয়মানুসারেই উন্নীত হইয়া সধ্ব গুণে উপহিত হইবে, তখন আমার ককণ রস এবং শান্তরসোদ্ধীপক ক্রীড়াতির কীর্তন করিতে থাকিবে। পরে উক্ত নিয়মানুসারে তাহাতেও উন্নতি লাভ করিয়া নিম্নে গুণ্য অবস্থায় উপহিত হইবে, তখন সমস্ত অমুরাগ বিনষ্ট হইয়া কেবল আমার প্রতি অহেতুক

অহুয়াগ মাজ থাকিবে; তবেই জীব কৃতার্থ হইল । এই কল্প-বাগিন্দি-য়ের  
বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিতে হয় । ক্রমশঃ ।

## শুভ সংবাদ ।

“অপিচেৎ অহুয়াচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ;  
সোপি সংসার দুঃখৌর্ধ্ব কাধ্যতে ন কদাচন ;  
কিপ্রং তরতি ধর্ম্মাশ্রোশনৈ তরতি সোপিচ ।  
মস্মি ভক্তিমতাং মুক্তি বলজ্যা পর্ততাষিপ ! ॥”

শ্রীমহুগবতী গীতা ।

অগদেক সৌভাগ্যবতী মেনকার অতিক্রমে জগৎপ্রসূতী জন্মগ্রহণ  
করিয়াছেন । যোগীন্দ্র মোহিনীর রূপের ছটায় নগেন্দ্র দম্পতি ডুবিয়া  
পড়িয়াছেন, কেবল গাধাঘমর হিমাচলের কন্দরগত অন্ধকারই পরাহত  
নহে ; ভক্তিভরমহুর ভুধররাজের হৃদয়মন্দির পর্যন্ত আনন্দময়ীর আনন্দ-  
ছটর আলোকিত হইয়াছে ; তাই আজ ভরকে কৃতার্থ করিতে, জগৎকে  
উদ্ধার করিতে, প্রাণপ্রিয় ভক্তের জন্য, যে অধাসিদ্ধিত তথ্যকথা অগদদ্বা  
নিজ মর্ম্মস্থলে অতি সন্ধ্যাপনে রাখিয়াছিলেন, ভক্ত, ভক্তির প্রবল উজ্জ্বল  
অধীর হইয়া, মা, প্রাণের কপাট খুলিয়া, ভক্ত হিমাচলকে তাহাও বলিয়া  
ফেলিয়াছেন । বন্ধময়ীর বন্ধভেজে হিমালয় তেজস্বী, তাই তিনি বন্ধাদি  
হুম্মত সজীবনী মঙ্গলা ধারণা করিতে পারিয়াছেন “অপিচেৎ অহুয়াচারো  
ভজতে মামনন্যভাক্” । মা কোথায় তোমার সৌভাগ্যবান পিতা, আর  
কোথায় এই আমি বোরনরকার্ণবনিম্ন মহাপাতক অহুতি সজ্ঞান । তিনি  
বাহা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ধারণা করিয়াছেন তাহা শুনিবার বুঝিবার  
ধারণা করিবার শক্তি আমার কি আছে ! তিনি ভুধর, ধরনী, এই  
নিখিল বিশ্বচরাচর ধারিণী, মা ! তুমি আমার এই অনন্তকোটিধরীর এক  
মাত্র ধারিণী । হিমাচল আমার সেই তোমাকে নিজ ঔরসে ধারণ  
করিয়াছেন । মা ! তুমি বুঝি নও, তোমার পিতাকে তুমি কি

অপরিসীম শক্তিময় উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছ ! আর আমি তুচ্ছ আর্পন  
 পাপের ভারে আপনি ডুবিয়া পড়িতেছি, আমাকেই বা কি দিয়াছ !  
 পর্ত্তও তোমার সৃষ্ট, সর্ব্বপও তোমার সৃষ্ট, তাই বলি মা ! তোমার  
 পিতাও তোমার সৃষ্ট, আর তোমার সন্তান আমিও তোমার সৃষ্ট । হা  
 অবিশ্বাসি মানব ! আজ তোমার চক্ষে সেই হিমাচল জড় পদার্থ !  
 যাঁহা হউক, মা ! তোমার সে তত্ত্বকথা শুনিবার শক্তি কৈ ? তোমার  
 সে ভক্তগাথা বুঝিবার অধিকার কৈ ? নারকী সন্তানের জন্য তোমার  
 সেই প্রাণের ব্যথা ধারণা করিবার সামর্থ্য আমার কৈ ? মা ! তোমার  
 ভুবনমোহন রূপের ছটায় হিমালয়ের যে দৃষ্টি ফুটিয়াছে, ঘোর-অজ্ঞান-  
 অন্ধকারমাগরে ডুবিয়া, জন্মাক আমার কি, মা ! সেই দৃষ্টি ফুটিবে ! ভক্ত-  
 বৎসলের ভবজননি ! ভক্তের শ্রবণপুট পেয়ে, হৃদয়পটধেয়, ভক্তলক্ষে  
 তোমার সেই আশ্বাসবাণী অভয়বাণী যে, এ ভবভয়ভীত অবিশ্বাসীর  
 পাপ হৃদয়ে স্থান পায় না ! বল মা ! কোন্ পুণ্যে তোমার ঐ ব্রহ্মমুখ-  
 বিনিঃসৃত ব্রহ্মবাণী বিশ্বাস করিবার বল পাই ! ইচ্ছাময়ি আনন্দময়ি,  
 বৃত্ত্যময়ি মা ! তুমি একবার সম্মুখে আসিয়া না দাঁড়াইলে, একবার  
 ঐ করুণাময়ী অপাকলহরীর স্খাসিক্ষণে এ ত্রিতাপদগ্ধহৃদয় শীতল না  
 করিলে, একবার ঐ বৃত্ত্যঞ্জনহৃদ্বিলাসিচ্ছিন্নানন্দরূপের তরঙ্গে এ নয়ন  
 মন না উথলিলে সে বল যে, পাইনে মা ! তোমায় না দেখিয়া  
 তোমার কথা প্রাণ যে আমার বিশ্বাস করিতে চায় না ! সত্য আমি  
 ঘোর নারকী, মহাপাতকী ; কিন্তু ছেলে হইয়া এ আব্দার টুকু কি  
 করিতে পারি না ! অধু আব্দার নয় মা ! সত্য, সত্য, সত্য, ত্রিসত্য  
 করিয়া বলিতেছি, তুমি যদি তোর কথা বুঝিবার অধিকার না দিস, কার  
 সাধ্য ঐ বোণীজন চিহ্নিত তব্ব নিজবুদ্ধিবলে আয়ত্ত করিতে পারে ?  
 তাই বলি একবার তুমি দেখা দিয়, বিশ্বাসের বল দিয় বা মা ! নইলে  
 আমি গেলাম গেলাম, ডুবিয়া রসাতলে পড়িলাম । এ সময়ে মা তুমি,  
 মা হইয়া কোথায় রহিলি ? সকল সংসার তোর বিশ্বাসী ভক্ত, আমি  
 ঘোর-অভক্ত ঘোর অবিশ্বাসী তাই আমার এ সর্ব্বনাশ ! ! কেউ তোর  
 কোলে উঠিয়াছে, কেউ চরণতলে, আমি নরকের অধস্তলে চলিলাম, ধরাধর-  
 নন্দিনি মা' আমার ধর ধর, জগদ্ধাত্রি ! একবার এসে কোলে কর ; গণেশ  
 জননি ! একবার এসে তনয় দাও ; অন্নপূর্ণা একবার স্তূধার অন্ন দাও ।

মা তোমার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া এ তাপিতপ্রাণ শীতল করি। আমার  
 দ্বারা বিশ্বাসী বলে, বল কি মা। আমার চক্ষে তারাও অবিশ্বাসী। মা।  
 তোমার যে বিশ্বাস করে, সে কি মা বই সংসারে আর কিছু বিশ্বাস করে ?  
 আমি বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বাস করি; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত তোমার  
 প্রহ্লাদ, ক্ষণিকভ্রমে কি দেখিয়াছিল। কি বিশ্বাস করিয়াছিল। সে  
 যে মা বই আর চরাচরে কিছু দেখিত না; তাই মিথ্যাক্ষণিকভ্রমে ভেদ  
 করিয়া সত্য সনাতন নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মা তুমি তাকে দেখা দিয়া  
 কোলের ছেলে, কোলে উঠাইয়া লইয়াছিল। কৈ মা। সে বিশ্বাস কোথায়  
 আছে? গহনবনে সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গ ভল্লুক দেখিয়া এবং বে এই আমার  
 পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ধরিতে যাইত, আর অমনি তুমি শঙ্খচক্রগদা-  
 পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে দেখা দিয়া তখনই লুকাইতে, সে বিশ্বাস কৈ মা।  
 “আমাদের দুঃখ মোচন করিতে পদ্মপলাশলোচন বৈ আর কেহ নাই,”  
 জননী স্নানীতির মুখে এই মহামন্ত্র শুনিয়া যে অটল বিশ্বাসের ভরে পঞ্চম  
 বর্ষীয় শিশু গভীর মহানিশায় মাত্নেহ ভুলিয়া একাকী বিজন বনে ধাইল;  
 আশা তার, “পদ্মপলাশলোচনকে পাইব।” সে ত না বুকিত পদ্ম,—না  
 বুকিত পলাশ,—না বুকিত লোচন, না বুকিত পদ্মপলাশলোচন। হৃৎ  
 পৌষ শিশু কেবল বুকিয়াছিল, এ সংসার তিনি আমাদের একজন।  
 মা। এখন শত শত বেদ বেদান্ত পুরাণতত্ত্ব পড়িয়াও, কেন সে বিশ্বাস  
 হয় না, এক পদ্মপলাশলোচন শব্দে এবং যাহা হইয়াছিল। তুই ত মা  
 সেই তুইই আছিল। তবে আমি কেন মা এমন হলেম? মায়ের সন্তান মা ছেড়ে  
 এ সংসার-রণে একা এলেম, তুই মা আসিবার কালে মণিমাণিক্যহীরক  
 রত্ন স্বর্ণভরণে আমায় সাজাইয়া দিয়াছিল। কুসঙ্গে পথ ভুলিয়া একে  
 একে দম্ভের হস্তে সব হারাইলাম। রাজরাজেশ্বরীর কুমার হইয়া আসিয়া-  
 ছিলাম, চিরদরিজের কুল্যাকার সাজিয়া ফিরিয়া চলিলাম। ত্রিলোচনে।  
 কোন লোচনে এ দৃশ্য তুই দেখিবি। এ দারিদ্র্য মোচন কবে হইবে মা।  
 ত্রিলোচনের লোচনানন্দ পঙ্কজকুলগঞ্জিত এই চরণতল তোমার ও যে  
 ভিত্তারী শব্দের সর্ব্ববধন। এ পাপ সংসার ছাড়বার করিয়া আমায়  
 পণ্ডের ভিত্তারী সাজাইয়া দাও, জয় মা আশানবাসিনী। আশানে আমায়  
 স্থান দাও; আশানের জ্বলন্ত চিতায় অগ্নিভোম বিদীর্ণ করিয়া অসিধারিণী  
 মুকুটেশ্বরী হাসিতে হাসিতে একবার বাঁশী লইয়া ত্রিভঙ্গরূপে দাঁড়াও মা।

মা তুমি যদনদহনমনোমোহিনী তোমার আর যদনমোহিনী বলিয়া কি  
 জ্বলি হইব ? তাই বলি যদনমোহনরূপে জ্বলনমোহিনী রাখিকাকে বামাদ-  
 ভাগিনী করিয়া, রণরত্নিনী একবার প্রেমভরঙ্গিণী সাজ মা ! দেখিয়া প্রাণ  
 ভরিয়া বিশ্বাস করি, “মা বই আর কিছু নাই” । অনন্তসচ্চিদানন্দসাগরে  
 একবার উদ্ভলভরঙ্গ উঠাও মা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গিণী, নিত্যনবরঙ্গিণী  
 মা তোমার একবার অনন্তরঙ্গিণী দেখিয়া লই, এ পীষাণময় হৃদয়কলকে  
 জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া লই, বেদবেদান্ত পুরাণতত্ত্ব সব আমার সেই ব্রহ্ম-  
 ময়ীর ব্রহ্মময় । মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় । সত্য সনাতনী মায়ের আজ্ঞা,  
 সকলই আমার সত্যময় । শাস্ত্র অনন্তভাষায় মায়ের তব্ব লিখিয়াছেন,  
 অনন্তরঙ্গিণী মা আমার অনন্তরূপে সাধককে দেখা দিয়া শাস্ত্রের  
 গৌরবে নাচিতেছেন । অহো কি আনন্দময় লীলা খেলা ! । সাধক !  
 এ সংসারে তুমিই ধন্ত, তুমিই সার্থক জন্ত পরিগ্রহণ করিয়াছিলে ।  
 ধন্ত তোমার অনন্তশক্তি, যাহার বলে তুমি সেই অনন্ত শক্তির অটল সিংহা-  
 সন টলাইয়াছ, ধন্ত হিমাচল । তোমারই পৃষ্ঠ ফলে মা আজ অচলরাজ-  
 নন্দিনী । তাই আজ তাঁর সহস্র ধার বিনিঃসৃত স্তন পীষুময় অভয়বাণী  
 পাণী তানী দীন হৃৎখী অধম সন্তানকে রক্ষার অস্ত্র সবেগে ছুটিয়াছে ; ভয়  
 নাই, ভয় নাই, “অপিচৈৎ সূত্ৰাচারো ভজ্যতে মাখনন্তভাক্” । মা ! তোমার  
 অভয়বাহী দয়ার প্রস্রবণ দেখিয়া অপার সমুদ্রের তেজির উচ্ছাস স্তম্ভিত  
 হয়, তোমার যদি এ দয়া না থাকিত, তবে কি সংসার থাকিত মা ! অন-  
 তনরকের কঠোর ঐশ হইতে পাণীর কি আর পরিভ্রাণ ছিল ? মা ! তোমার  
 কল্পণাবলে তোমার আজ্ঞা মধ্য অনন্ত নরকের নাথ নাই ; তাই পাণীর  
 ঐক মাত্র আশঙ্ক ও ভরসা স্থল তুমি তাই সংসারের অমোঘসিদ্ধান্ত “পুত্র  
 অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়” । মাগো ! বলিয়াছ—“ভজ্যতে মাখনন্ত-  
 ভাক্” ভাগ্য দোষে আমার চক্ষে অনেক অস্ত্র তাই আমি তোমার মহাবাক্য  
 বিশ্বাসের অনধিকারী । মাগো ! বুঝিতে পারি না, অনন্যভাক্ হইয়া  
 তোমার ভজনা করিব, কি তোমার ভজনা করিয়া অনন্যভাক্ হইব ?  
 আমি ত জানি, যে তোমার ভজনা করে, সেই সংসারে অনন্যভাক্ হয় ।  
 তারানামের প্রেমের বলে যাদের নয়নতারা করিতে থাকে, তারা ত তারা-  
 ময় নয়নতারার, তারা ঠৈ এ সংসারে আর কিছু দেখিতে পার না ! চন্দ্র,  
 সূর্য, গ্রহ, তারা আপন আলোক ছাড়াইয়া যায়, তারা ত তখন ত্রিলোক-

তার। তারার আলোকে প্রেম পুলকে ভাসিয়া উঠে ! বর্গ মর্ত্য রসাতল ভেদ করিয়া তারাময় আলোক ছুটে, ত্রিনয়নের নয়নতারায় তারা ভুমি ধরা দিয়াছ, তাই দিগম্বর ভীত, চকিত ভক্তিত হইয়া দশদিকে চাহিয়াছেন । আর অমনি ভুমি দশদিক আলো করিয়া “কালীতার। বোড়শী” আদি দশ-মহাবিদ্যা রূপে দশদিকে তাঁহার দেখা দিয়া নিজ দাসকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া লইয়াছ ; সেই বলে, সেই সাহসে তিনি “সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং বসি ন সংশয়ঃ” বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া পঞ্চমুখে তোমার গুণ গাইতেছেন, সে আরাধন কৈ মা, বাতে তারাধন আমার হবে ॥ তুমি যদি মা আমার হতে, তবে কি আমি কারও হতেম ? আবার কি করিয়াই বা বলিব মা, তুমি, আমার নও বা আমি তোমার নই । তুমি যদি আমার নও তবে তুমি কার ; আর আমি যদি তোমার নই, তবে আমিই বা কে ? মা ! আমার মত মহানারকী সন্তান আছে বলিয়াই ত তুমি নরনরক-নিষ্ঠারিণী । তাই বড় আবদার করিয়া বলি মা, তুমি আমার মা না হইলে আর কার হইবে মা ; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, এই বিশাল বিশ্বক্ষে প্রতি অণু পরমাণু মধ্যে নিত্য চৈতন্য রূপিণী তুমি চমকিতেছ । তাই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে । আবার অনন্ত চন্দ্র, সূর্য্যময় কারুকার্য্যখচিত এই বিরাট অশ্বরে তুমি দিগাম্বরী সাজিয়াছ, তাই তোমার অনন্ত অঞ্চল ধরিয়া, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড খুলিয়া খুলিয়া খেলিতেছে । তাই বলি মা, তুমি চিরদিনই আমার, আমি চিরদিনই তোমার । কেবল, তোমার আমি না দেখিয়া আমার আমি না চিনিয়া এ অকৃতামসী মহানিশায় দিশাহারা হইয়াছি । সাধকের হৃদয়াকাশে তুমিই কেবল স্থির কামিনী । তুমি যদি আপন আলোকে আপন পথে ভ্রান্ত বালককে টানিয়া না লও, তবে কার সাধ্য তোমার আজ্ঞার একটী অক্ষর পড়িতে পারে ? কার সাধ্য আপন আবদারে এ মায়া অঞ্চল অপসারণ করিয়া তোমার স্তনের একটী ধার শোষণ করিতে পারে ? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অসন্তান অবিব্রাহ্ম তোমার অন্য তোমার পথে ধাইতেছে । ব্রহ্মাদি তুৎতৎ পর্য্যন্ত তোমার মেহময় আকর্ষণে আকৃষ্ট, নিখিল চরাচরের গতাগতিতে পথ ত অতি প্রশস্ত হইয়াছে ; কিন্তু দেখ মা দেখ, আমি অন্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট । নবরীরদ-গগন অগ্নিবরণী একবার তুমি দেখা দাও, সেই অগ্ননের কিরণ রেখার এ চক্কু একবার যদি রঞ্জিত হয় তখন তবে সমুজ্জের সাধ্য কি যে, তাহার

ভাণ্ডারের জল দিয়া সে অঞ্জন সে হুইতে পারে ? আমি একবার সেই অঞ্জন রঞ্জিত নয়নে তোমার ঐ ভৈরবহৃদিরঞ্জিনী মূর্তি দেখিয়া লই, তার পর আমার সাধ্য থাকে, ধরিয়া রাখিব না হয় তুমি দূরে পলাইও । যদি পালাইবার স্থান থাকে ॥ স্বর্গে তুমি, নরকে তুমি, অন্তরে তুমি, বাহিরে তুমি, পালাইবে কোথা মা ? নরকের ভীষণ করুণার মধ্যেও ভব বহুগাহারিণী না তুমি আছ বলিয়াই ক্লীণকর্ষ পাপী নরকেও তোমার নাম করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করে । শত শত নারকীর পবিত্র কণ্ঠে যখন মা মা ধ্বনি উঠিয়া বনলোক স্তম্ভিত করে, তখন কোথায় নরক, কোথায় স্বর্গ, কোথায় বৈকুণ্ঠ, কোথায় কৈবল্য, কোথায় কৈলাস, মা তোমার নামের শুণে প্রেমের শুণে সদ তখন এক হইয়া উঠে । তারার নামের ভয়ে যমের বমদও কাঁপিতে থাকে, নারকী সন্তান তখন আর নারকী থাকে না ; প্রাণের কপাট খুলে, মা, মা বলে, বাহতুলে আমার কোলে উঠে ; ভীত, চকিত, স্তম্ভিত সংসার নিম্পন্দ নয়নে দেখিতে থাকে, আনন্দময়ীর নামের শুণে নরকের নিরানন্দও “ত্ৰাহি ত্ৰাহি” করিয়া ছুরে পালায় । তখন “অপিচেন্দ্রসুহুরাচারো ভজতে মা অনন্যভাক্” তোমার এই জ্বলন্ত মহা-মন্ত্র মনে করিয়া অকৃতি সন্তানকৃতী হইয়া, নয়নজলে অঞ্জলি পুরিয়া, তোমার চরণ বিধৌত করে । জননীর করুণাজালে, সন্তানের নয়ন জলে এক হইয়া, অগৎ সংসার ডুবাঁইয়া ফেলে ; সেই জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকে “জয় জননি জগদম্বার দয়ার জয়, ভয়াবহ সংসারে সেই অভয়া জননীর জয় ।”

## মনু সংহিতা ।

১ম ভাগ ৯ম সংখ্যায় আমরা সূত্রাদি জাতি অনধিকারী কেন এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া অপরিহার্য প্রবন্ধ প্রকাশের অনুরোধে এত দিন পর্যন্ত আর তহুত্তরে অবকাশ পাই নাই । অদ্য তদ্বিবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।

আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে অধ্যয়ন কাহাকে বলে ও অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বিস্তার মতে আলোচনা করিয়াছি; দেখাইয়াছি যে, বর্ত-

জ্ঞানে অধ্যয়ন শব্দে যে ভাবে অর্থ গ্রহিত হয় পূর্বে সে ভাবে গ্রহিত হইত না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে গ্রহণ করা হইত; এবং অধ্যয়নের উদ্দেশ্যও যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল তাহাও আমরা যথাসাধ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। আমরা এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছি, যে, অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্য্য পরিণত করা। যিনি যতটুকু অধ্যয়ন করিবেন তিনি ততটুকুই কার্য্য পরিণত করিবেন, যাহা কার্য্য পরিণত করিতে পারিবেন না তাহা কদাপি অধ্যয়ন করিবেন না; ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ। শাস্ত্র আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও বলিয়াছেন যে, যুগা অধ্যয়নকারী ইহ এবং পরকালে উভয়ই অশেষ দুঃখভাগী হইয়া থাকে। অতরাং, তৎপদাৰ্থাৎ অধিগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ব লইয়া নানা প্রকার বিধি ব্যবহা করিলেন। এই সমস্ত বিধি ব্যবহা সম্প্রদায় বিশেষের উপর পক্ষপাতি হইয়া প্রনয়ন করেন নাই বরং একান্ত দয়া পরবশ হইয়া অশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূৰ্ণক জীবগণের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় এক্রপ করিয়া গিয়াছেন। মুখ্য আমরা, তাহাই না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া ইধর কল্প অধিদের উপর অযথা দোষারোপ করিতে সাহসী হই।

এইরূপে শাস্ত্র অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ব বিচার করিতে গিয়া অধিকারীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন মনুষ্যের আত্মা চারিটি আবরণে আবৃত, এই প্রত্যেক আবরণের নাম একটি একটি কোষ। এইরূপ কোষচতুষ্টয়াচ্ছাদিত নিত্য-বুদ্ধ মূল, নিরবয়ব, নির্জিকার চৈতন্য-বাক্স আত্মা এই জীবদেহে বিরাজিত থাকেন। মনুষ্য এই আবরণ চতুষ্টয় অন্য আপনার প্রকৃত স্বরূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধি করিতে হইলে নানাবিধসংযোগীয় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় উন্মোচন করিতে হইবে। অধঃশ্রোতবিনী বৃত্তি সমূহের ক্ষমতার দ্বাশ করিয়া উর্ধ্বশ্রোতবিনী বৃত্তি সকলের চর্চ্চার দ্বারা আমাদের বাবতীয় শক্তি আত্মার উন্নতির অনুকূলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কি কি উপায় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে বিনিমুক্ত হওয়া যায় তাহাই শাস্ত্রে বহুতর পন্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতরাং, এই আবরণগোমুক্ত হইবার উপায় সংগ্রহের জন্যই বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যক।

আত্মা-কে চারিটি কোষের দ্বারা আবৃত তাহার প্রথমটির নাম অন্নর



কোষ, দ্বিতীয়টির নাম মনময় কোষ, তৃতীয়টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ, এবং চতুর্থটির নাম আনন্দময় কোষ । আত্মস্থ হইতে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ এই চারিটি আবরণ উন্মুক্ত করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে । যিনি বতটুক আবরণোন্মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি ততটুক আত্মজ্ঞানী হইতে সক্ষম হইয়াছেন । যিনি কেবল মাত্র অন্নময় কোষে আপনাকে আবদ্ধ ভাবিয়া কার্য্য করেন অর্থাৎ যিনি আপনার আমিষকে এই স্থূল দেহ হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন নাই, তিনিই শূদ্র পদবাচ্য ; আর যিনি অন্নময় কোষ হইতে নিজের আমিষ উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি বৈষ্ণবপদ বাচ্য ; যিনি নিজের আমিষকে মনময় কোষ হইতে উঠাইয়া লইয়া বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিতি করিয়া থাকেন তিনিই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য এবং যিনি এই কোষত্রয় অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময় কোষে বিরাজ করেন তাঁহাকেই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং যিনি অন্নময় কোষ হইতে আপনার আমিষ উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে উপ-নিত হইতে পারেন নাই তাঁহার মনময় কোষের অমুষ্ঠানাদি জানিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কারণ, অন্নময় কোষে আত্মা জড়িত থাকায় দেহাভিমান স্বতঃই বুদ্ধি পাইয়া থাকে । দেহাভিমানীর আত্মজ্ঞান লাভ নিতান্তই অসম্ভব । এইরূপ যিনি মনময় কোষ হইতে আপনার আমিষ উঠাইয়া বিজ্ঞানময় কোষে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষের অমুষ্ঠানাদি জানিবার কোন প্রয়োজনই নাই, এইরূপেই আনন্দময় কোষ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । অথচ বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে আত্মাকে কিরূপে নিম্নতম অন্নময় কোষ হইতে সর্বোচ্চ আনন্দময় কোষে উঠিতে হয় তাহারই উপায় এবং ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা এবং অনুভূতি মূলক প্রক্রিয়া এবং অমুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মন্ত্র তন্ত্রাদি সকল লিখিত আছে । সুতরাং, বাহার যেটুকু উপ-কারে আসিবে না, তাহার, সেই সম্বন্ধে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠে অথবা তাহার কোনরূপ অবৈধ অমুষ্ঠানে, ফল দেখা যায় না । বরং অনধিকারীর এই অবৈধ অধ্যয়ন জনিত যে যে বিষময় ফল ঘটিবার সম্ভব যাহা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই ঘটবে মাত্র । শূদ্র যখন কেবলমাত্র অন্নময় কোষেরই অধিকারী তখন তাহার যদি কোন উচ্চকোষের বিহিত অমুষ্ঠান করিতে যান তাহা হইলে তাহার কোন উপকার না হইয়া সমুদ্র জতি

হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । কারণ, আমাদের শাস্ত্রোক্ত আত্মদৃষ্টি লাভের জন্য প্রাণস্বামীদি যে সকল অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনরূপ বাহ্যিক প্রক্রিয়া নহে, উহা বিবিধ দেহাবৃত আত্মাকে বন্ধনোন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত দেহাশ্রিত আত্মার শক্তি সমূহকে আত্মার বন্ধনোন্মুক্ত রূপ উন্নতির অনুকূলে সংস্থাপন করিবার প্রণালী বিশেষ । অর্থাৎ পঞ্চ বায়ু, বাদশেজিয় ও অহকারাদি বাহ্য কিছু সমস্তই একরূপ আয়ত্ত করিতে হইবে বাহাতে সকলেই, আত্মার বন্ধনোন্মুক্ত হইবার পথে, কোন বাধা না জন্মাইয়া বরং সাহায্য করিতে উদ্যোগী হয় । সুতরাং যদি প্রকৃত অধিকারানুসারেবৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা সে পথে অগ্রসর না হওয়া যায় তাহা হইলে দেহের ও মনের নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইয়া সর্বনাশ হইবার বিশেষ সম্ভব । সেই জন্যই সর্বদা ঋষিরা অধিকারী নির্ণয় করিয়া বাহ্যর বতটুকু প্রয়োজন তাহাকে ততটুকুই অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন । এবং পাছে দুর্বল মানব অবৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ সহজে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য অনধিকার চর্চায় বিশেষ শাস্তির বিধান করিয়া গিয়াছেন । একরূপ প্রকৃত কল্যাণার্থীদেরও যদি আমরা অথবা নিম্নবাদ ও ভৎসনা করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকার্য প্রদর্শন করি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান নীচ অধম জাতি জগতে বিদ্যমান আছে কিনা সম্ভেহ ।

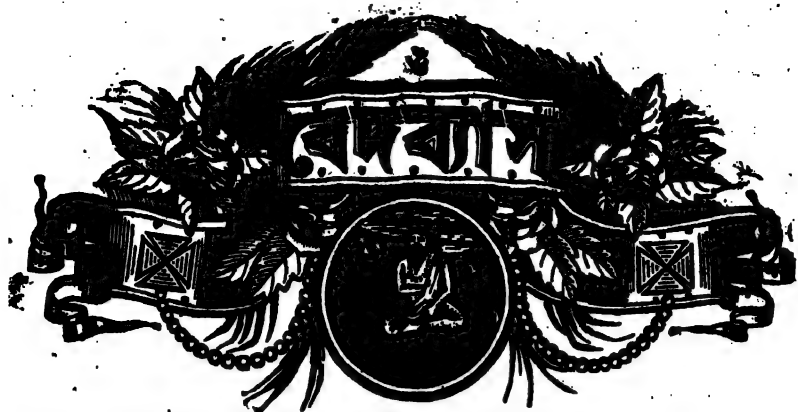
অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, যদি পূর্বকালীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের প্রণিত শাস্ত্রাদি শৃঙ্গাদিগণকে “ অধ্যয়ন ” করিতে অনুমতি করিতেন তাহা হইলে শৃঙ্গেরা এত ধর্মহীন মুখ হইত না । কেন না এখন দেখা যায় অতি বর্কর জাতিদিগকে অল্পে অল্পে শিক্ষা দিলে সময়ে তাহারাও জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে । যেমন অনুদান্নেচ্ছাদিকারে সর্বজাতি নির্কিংশেবে সমান শিক্ষা ( বিলাতি ) দেওয়ার শৃঙ্গেরাও বিলাতি শিক্ষার ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এমন কি অনেক স্থলে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইত্যাদি ।

যাঁহারা আমাদের এই মহাসংহিতা শীর্ষক প্রবন্ধটি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া আসিতেছেন আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা কদাচ এ ভ্রমে পড়িবেন না । কেন না, আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে বর্তমানের শিক্ষা অথবা অধ্যয়নের বেকরূপ প্রণালী ও উদ্দেশ্য পুরাকালে সেকরূপ ছিল না । তখন কেবল আত্মাত্মিক অনুষ্ঠানের জন্যই অধ্যয়নের অথবা শিক্ষাদির প্রথা ছিল । এখন যেকরূপ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও অধ্যয়ন প্রচলিত একরূপ উদ্দেশ্যে ও প্রণালীতে আচঞ্চল সর্বজাতি অনাস্রাসে বেদ হইতে তত্ত্ব পর্যন্ত সর্বশাস্ত্র পাঠ করিতে পারেন । শাস্ত্র তাহাতে কোন আপত্তিই করিবেন না । শাস্ত্র কেবল আত্মাত্মিক উন্নতিপ্রার্থীদিগের জন্য এত অধিকারীর বিচার করিয়াছেন । আবায় এমনও অনেকে বলেন যে ব্রাহ্মণেরা নিজ প্রভু হানির ভয়ে ভীষণ কটোর আজ্ঞায় শৃঙ্গাদি জাতিদের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাঁহাদের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্য-

মন করিত তাহা হইলে তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা উহাদের শাসন করিতেন । কেবল শূত্রদের কৃতদাসের ন্যায় রাখিবার জন্য এবং তাহা-  
দিগকে আপনাদিগের কার্যে লাগাইয়া স্বার্থসিদ্ধির মানসে একপন্থা অবলম্বন  
করিতেন । সেখানে ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য বানিজ্যশীল ধনী, শূত্রেরাও  
যে সাংসারিক সম্বন্ধে অতি অল্প ক্ষমতাবান ছিল তাহাও বোধ হয় না, কারণ  
স্বল্পক চণ্ডাল জাতীয় হইয়াও বহুধন-জন-পারিষদে পরিবেষ্টিত ছিল, সেখানে  
স্বল্প সংখ্যক বনবাসী কল মূল আহারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিসের বলে এত ভীষণ  
অত্যাচার করিতে সক্ষম হইত, ইহাও এক অন্তর্ভূত রহস্য বটে । লক্ষ লক্ষ  
সৈন্যের অধিপতি প্রবলপাক্ষাঙ্ক রাজা সকলত এই অত্যাচারী মুষ্টিমের  
ব্রাহ্মণগণকে চূর্ণ বিচূর্ণিত করিতে সক্ষম হইতেন । তখন রাজগণ বর্ষের অথবা  
গণ্ডমূৰ্খ ছিলেন না, অধিকাংশ রাজাই বুদ্ধি ও জ্ঞানে অসোভিত ছিলেন,  
জনকাদি রাজর্ষিগণ তাহার জাজ্জল্য প্রমাণ । তবে কেন দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা  
অধিপত্য করিত ।

আর ইহা সর্ববাদি সম্মত যে বেদাদি শ্রাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা  
রচিত । কোন শূত্রই একখানিও শাস্ত্র রচনা করেন নাই । ইহা যদি সত্য হয়  
তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, ব্রাহ্মণেরাই কেন শাস্ত্র লিখিতে  
সক্ষম হইলেন ? শূত্রেরাও কেন তাহাদের মনমত শাস্ত্র রচনা করিয়া  
ব্রাহ্মণদের সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে নিষেধ বিধি করিলেন না ? মূল জাতি  
বধন একই ঈশ্বরের সৃষ্ট তখন মনুষ্য নামেরই বুদ্ধি বৃষ্টি একত্র হওয়াত  
উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া একপন্থা বিভিন্নতা হয় কেন ? তবেই স্বীকার  
করিতে হয় যে ব্রাহ্মণেরা কোন পুর্নোজ্জিত ক্ষমতা বলে অথবা ঈশ্বরের  
বিশেষ অনুগ্রহে সাধারণাপেক্ষা বিশেষ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন । যদি বলেন  
ব্রাহ্মণেরা সর্বদা অগ্ন্যশ্ব চর্চা করিতেন বলিয়াই এত আধ্যাত্মিক উন্নতি  
করিয়াছিলেন । শূত্রেরাও কেন অগ্ন্যশ্ব চর্চা করিতেন না ? আধ্যাত্মিক উন্নতি  
অতি সঙ্কোপনে জন্মের মধ্যে করিতে হয় । ব্রাহ্মণেরা না হয় বাহিরে  
তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে অত্যাচার করিতেন । অন্তরের  
মধ্যে ত আর তাঁহারা প্রবেশ করিতেন না । অন্তর্ভূত উন্নতির বাধা  
জন্মাইতে তাহারাও সাধ্য নাই । তবে কেন শূত্রেরা এত হীন হইল ?

আর দেখুন ব্রাহ্মণেরা শূত্রদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে দিতেন না বলিয়া  
অত্যাচারী কি করিয়া হইলেন ? তাহাদের বস্ত্রে ও সাধনার অজ্ঞিত  
সম্পত্তি তাঁহারা যদি অপাঙ্গে প্রদান করিত ইচ্ছুক না হন অথবা সেই  
সমস্ত বস্ত্রে অজ্ঞিত সম্পত্তি অন্যায় রূপে অন্য কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে  
দেখিলে অন্যায় ব্যবহারকারীকে শাসন করিতেন, এই বলিয়া “অনুদার”  
হইতে পারেন অত্যাচারী হইলেন কিরূপে ? চোরকে যদি শাসন করা  
কঠিন কার্য হয় ব্রাহ্মণের অমূল্য জ্ঞান রত্নের অপহরণ ও অপব্যবহারকারীকে  
শাসন করাও সর্বদা কর্তব্য ।



২য় ভাগ ।

১২৯৪ সাল ।

৩য় খণ্ড ।

## পাপ ।

পাপ ত্রিবিধ, বাচনিক, কায়িক ও মানসিক ।

পাক্ষ্যমন্ত্ৰতৈঋব, গৈলুণ্যত্ৰাপি সৰ্বশঃ ।

অসম্বদ প্রলাপন্ত বাঙাল্যং জ্ঞাৎ চতুর্বিধং ॥

মন্ত্ৰ ।

অর্থীঃ

অপ্রিয়ভাষণ, অসত্যকথন, পরোক্ষে অন্যের নিন্দাঘোষণা, এবং নিরর্থক বাচালতা, এই কর্তী বাচনিক পাপ । চীকাকর “অসম্বদ প্রলাপন্ত” এই পদের একটু স্থল্ল অর্থ করিয়াছেন । “সত্যত্ৰাপি রাজদেশ পৌর-বার্তাদের্নিশ্চয়োজনং বর্ণনং ।” অর্থীঃ অমুক দেশের রাজা বড় বিজ্ঞ, অমুক দেশ বড় উর্কর, অমুক দেশের লোক বড় সাহসী প্রভৃতি কথা সত্য হইলেও নিশ্চয়োজন । অতরাং, ঐ সব কথায় সময় অতিবাহিত করিলে বাচনিক পাপ করা হয় । গাড্‌টোন বড় বক্তা, বিস্মার্ক বড় চতুর, এবার ইটালীর বড় বিপদ দেখিতেছি, প্রভৃতি যে সমস্ত খোস গল্প এখন প্রতি বৈঠক খানাকে অলঙ্কৃত করে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে বাচনিক পাপ । যে সকল বিবরণ শ্রবণে বা কীর্তনে ধর্মবুদ্ধি উদ্দীপিত হয়, ও অধর্মবুদ্ধি প্রশমিত হয়, কেবল সেই সমস্ত বিবরণ অথবা প্রসঙ্গই আলোচনা করা উচিত । নতুবা মহানাগী ভিক্টোরিয়ার কর পুত্র ও কর কন্যা, টেমসন সাহেব তাহার স্ত্রীকে ভাল বাসেন কি না, পেজ সাহেব

কাহারীতে নিজে যান কি না, প্রভৃতি প্রসঙ্গে আশ্বাসের ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন প্রকার বর্গই সংসাধিত হয় না । সুতরাং, এইরূপ অনাবশ্যক প্রসঙ্গ (Gossiping) পাপ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য ।

শারীর পাপ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,

“অদত্তানাং উপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং শ্লুতং ॥”

মনু ।

অর্থাৎ

কার্যিক পাপ তিন প্রকার ; যথা অন্যান্য পুরুষ পরহাপহরণ, (যে কোন ভাবে) স্বশাস্ত্রীয় পণ্ডহত্যা, এবং পরদার ।

এইরূপে মানসিক পাপও ত্রিবিধ

পরজবোধ্যভিধানং মনসানিষ্ট চিন্তনং ।

বিতথাভিনিবেশস্ত ত্রিবিধং কর্ম মাধসং ॥

মনু ।

অর্থাৎ

(১) কিরূপে অন্যান্যপুরুষ পরহাপহরণ করিব, (২) কিরূপে স্বশাস্ত্র-হত্যা, পরদার সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধাচরণ করিব, (৩) “পরলোক মিথ্যা” “আত্মা নাই, দেহই আছে” প্রভৃতি ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস ও ধারণা এই তিন প্রকার মানসিক কর্মকে মানসিক পাপ বলা যায় ।

এই যে তিন প্রকার পাপের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের মধ্যে বাচনিক পাপের শাস্তি বাচনিক, কার্যিক পাপের শাস্তি কার্যিক ও মানসিক পাপের শাস্তি মানসিক হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত, তাহার মন অত্যন্ত কর্ণশ ও ক্ষুভিকটু হয় । কার্যিক পাপের ফল কার্যিক পীড়া, অকবৈরুধ্য ও অকবিকৃতি । মানসিক পাপের ফল মানসিক ব্যাধনা ও মনোবিকার ।

মানসং মনসৈবায়মুপভুক্তং শুভাশুভতং ।

বাচা বাচাকৃতং কর্ম কারেনৈব চ কারিকং ॥

“মানসিক শুভাশুভ কর্মের ফল মনেই ভোগ করিতে হয় । এইরূপে বাচ্যকর্ম ও কার্যকর্মের ফল বাক্যে ও কার্যে প্রকটিত হয় ॥”

মনু ভগবতে কার্যের সহিত কার্যের বেদন নিত্য সম্বন্ধ; নৈতিক

জগতে পাপের সহিত পাপোচিত শাস্তির সেইরূপ নিত্য সম্বন্ধ। পরদার প্রভৃতি কায়িক পাপের ফল প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বহু দিন লম্পট, যৌবনের সীমা অতিক্রম না করে, তত দিন সে তাহার পাপের ফল ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, এবং তাহার বেশভূষাদির আধিক্য বশতঃ অস্ত্রেও তাহার হৃদয় দেখিতে পায় না। কিন্তু যৌবন স্থলত সামর্থ্যের একটু হ্রাস হইলেই লম্পট্য বিষ নিজ বীভৎসতার পরিচয় প্রদান করে। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, শিরোধূর্নন, হস্তকম্পন, প্রভৃতি নানাবিধ গীড়া আসিয়া ঐ লম্পটের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাচনিক পাপের ফল ও কায়িক ফলের জ্ঞান অবগতাবী। তুমি অস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহার অনিষ্ট করিলে; কিন্তু একবার ভাবিলে না যে পরের মন্দ করিতে গেলে আপনায় মন্দ আগে হয়। পরের নিন্দা করায়, তোমার জিহ্বার যে কলুষতা জন্মিল, উহাতে যে তোমার কত সময়ে কত অপকার হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদের অশেষ ক্লেশোৎপাদন করিলে; কিন্তু তোমার জিহ্বা ও স্বর ককর্ষণতা দোষে কলুষিত হওয়ায় তোমার যে কি অপকার হইল তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে না। আমার এক বন্ধু একটা কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি সর্বদা বালকদিগকে তিরস্কার করিতেন। এইরূপ করাতে তাহার জিহ্বা ককর্ষণ ও ক্লট কথায় এরূপ অভ্যস্ত হইল, যে তিনি চেষ্টা করিয়াও ককর্ষণ ভাষা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। তাহার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বজন সকলেই একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ভৃত্য পাইতেন না, দাসী পাইতেন না, এমন কি ধোপা নাপিত ও তাহার দুষ্প্রাপ্য হইল। সর্বশেষে তাহার পত্নী মনোহুংখে আত্ম হত্যা করিলেন। কি আশ্চর্য্য তুমি অন্যের নিন্দা করিতেছ, মিথ্যা কহিতেছ, ককর্ষণ ভাষায় অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতেছ এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিয়া কত রাজ্য কত উজীর হারিতেছ; কিন্তু একবার বুঝিয়া দেখিতেছ না, যে ঐ সমস্ত কুকাৰ্য্য দ্বারা কি ভয়ানক বিষ অলঙ্কিত ভাবে তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একবার গ্লাডষ্টোন একজন বীণাবাদককে ক্রিকেট খেলিতে অহরোধ করিয়া ছিলেন। বীণাবাদক উত্তর করিলেন—“আমি ক্রিকেট খেলিলে আমার বার্ষিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। আমি এক্ষণে বীণা বাজাইয়া

৫০,০০০ হাজার টাকা উপার্জন করি। ক্রীকেট খেলিলে আমার হস্তের এই বীণানৈপুণ্য থাকিবে না।” হস্ত সযত্নে যে কথা জিহ্বা সযত্নেও তাহাই। যে সর্বদা হু কথা কয়, সে আপন জী পুত্রকেও মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে পারে না। জিহ্বা যন্ত্রের সধ্যবহার আর তাহার আয়ত্ত থাকে না। আহা এই জিহ্বার সধ্যবহারে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়। যে হ্রস্ব অন্ত কিছু মানে না, তাহাকেও জিহ্বার সধ্যবহার দ্বারা বশ করা যায়। এই জিহ্বা সর্বদা সং প্রসঙ্গে রত থাকুক, সর্বদা সুবাক্য কহুক, সর্বদা সুপুস্তক পাঠ করুক, সর্বদা দেব দ্বিজে স্তুতি করুক। তাহা হইলে তুমি ইহকালে সর্বলোকের প্রিয় হইবে এবং পরকালেও অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। পরন্তু এই মহাযন্ত্রের কুব্যবহারে তোমার নিজের ও অন্তের কেবল দুঃখ রাশি পরিবর্দ্ধিত হইবে। তাহাতে তোমার নিজের ও অন্তের দুঃখ বর্দ্ধিত হয় তাহা যে পাপ তথিযরে সন্দেহ নান্ত থাকিতে পারে না।

এইরূপে যখন আমরা কোন হুচিন্তা করি, তখন আমরা এই বলিয়া আপনাকে আপনি প্রবোধ দেই—“যে ইহা হইত আর দোষ কি? আমরা ত আর কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতেছি না।” আমরা কাহার অনিষ্ট করিতেছি না সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের নিজ নিজ অমহৎ অমঙ্গল সংসাধন করিতেছি। আমাদের মনও একটি অবিদ্যমন্ত, অরচিত বাদ্যযন্ত্র সদৃশ। অতি সাবধানে অতি সতর্পণে ইহার তাল মান লয় রক্ষা করিতে হয়; যদি ইহাতে বাহা ইচ্ছা তাহাই বাজাও, তাহা হইলে ইহার অপূর্ণ কোমলতা অভাবনীয় মাহুরী প্রভৃতি সমস্ত সদগুণ হারা হইবে। যে পবিত্র বৃন্দকে হরিসকীর্্তন নিনাদিত হইবে, তাহাতে যদি সদা সর্বদা বারবিলাসিনীর নর্ভনোচিত আড় খেমটা বাজান যায় তাহা হইলে তাহার কি দশা হয়? অতএব সাবধান, পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা কর। পবিত্র গঙ্গোদকে দেবতার পদধৌত কর। উহা লইয়া কুকুর বিড়ালকে অতিবিক্ত করিবে কেন? বাচনিক কার্যিক ও মানসিক পাপে পরজন্মে কি কি শাস্তি তাহাও হিন্দুর অরণ্য রাখা কর্তব্য।

শ্রীরত্নৈঃ কর্দদোষৈর্বাতি স্বাবরতাং নরঃ।

কাচিঠৈঃ পক্ষিভৃগতাং মানসৈরভ্যাজিতাম্ ॥

অর্থাৎ

কারিক পাপে মনুষ্য স্বাবর হোনি প্রাপ্ত হয়। বাচনিক পাপে মনুষ্য

পশুপক্ষী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এবং মানসিক পাপে মনুষ্য অন্ত্যজাতিতে অর্থাৎ চণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

ইহার মধ্যে এক গুঢ় নৈতিক রহস্য আছে। যেন কর্তৃকল প্রদাতা ঈশ্বর শারীর পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতেছেন।—“হে মনুষ্য তোমাকে দেহবস্তুরূপে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার তুমি অপব্যবহার করিয়াছ। সুতরাং তুমি আর ঐ অধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত নহ। অতএব তোমাকে ঐ অধিকার হইতে চ্যুত করিলাম। এ অঙ্গে তোমার একটা শরীর থাকিবে, কিন্তু তাহা লইয়া তুমি শূন্য বা কুশূন্য কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি বৃক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিবে।”

এইরূপে যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত ছিল তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—“হে দুর্ভাগ্য মনুষ্য! তোমাকে যে মোহন বাক্যবস্ত্রের অধিকারী করিয়াছিলাম তুমি সে বস্ত্রের অত্যন্ত অপব্যবহার করিয়াছ। এবার আর তোমাকে ঐ বস্ত্রের অধিকারী করা হইবে না। তোমার শরীর থাকিবে, তুমি শূন্য কুশূন্য প্রভৃতির অধিকারী থাকিবে, কিন্তু তোমার জিহ্বা বাক্য নিঃসারণে অশক্ত হইবে, অর্থাৎ তুমি তিরস্ক যোনিতে জন্ম লাভ করিবে।” যে মানসিক পাপে পাপী তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—“হে দুর্ভাগ্য! তোমাকে মনরূপে যে শূন্য অধিকার দিয়াছিলাম, তাহার তুমি কি কুব্যবহার করিয়াছ। এ অঙ্গে তোমার কণ্ঠ ও বাক্যে অধিকার থাকিবে; কিন্তু তোমাকে আর মনস্বিতা দিব না। অর্থাৎ তুমি চণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে।”

দেখুন আমরা ইঞ্জির দেহ মন প্রভৃতি যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিতেছি, সুব্যবহার করিলে আমরা ঐ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিব। নতুবা ঈশ্বর আমাদিগকে ঐ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন।

একণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দুই তিনটি ভুল ও অত্যাশঙ্ক প্রেরণ অবতারণা করা বাইতেছে।

১ম। পাপ কাহাকে বলে? পাপের লক্ষণ বাহা বাহা ইংরেজীতে নির্ভারিত আছে, তাহার বখাষ বিচার করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পাপ কাহাকে বলে? আপনি তাহাতে উত্তর করিলেন—“Categorical imperative “নথবা” The greatest evil of the greatest number.”



আপনার উত্তর আমার প্রশ্নের অপেক্ষা কঠিন। বংকালে আমার জাতি কথামালা পড়িতেন, তৎকালে কথামালার একখানি অর্থপুস্তক আমার হস্তে পড়িয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম।

বাব—অৰ্ধে শাৰ্দ্ধূল

হাড়—অৰ্ধে অহি ইত্যাদি

ইংরাজী দর্শনের সমস্ত আশাদের পক্ষে অনেক সময়ে ঐক্যপ।

মিথ্যা কথা কথা উচিত কি না, ইহা জানিতে হইলে যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর কথা জানিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদ। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের উপদেশ অতি সহজ, এবং উহা সহজেই প্রতিপাল্য।

বিহিত কৰ্ম্মজন্যে ধৰ্ম্মঃ । নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম জন্মায় ধৰ্ম্মঃ ।”

অর্থাৎ “শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে বাহ্যর পক্ষে যে কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা করাই পুণ্য ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম করাই পাপ।” এই উপদেশ সৰ্ব্বদা স্মরণ করি না, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই উপদেশের এক মহৎগুণ এই যে ইহা কার্য্যে পরিণত করা হইতে পারে। পাপের তালিকা মনুর একাদশ অধ্যায়ের ৫৫-৭১ শ্লোকে দৃষ্টব্য।

২য়। পাপের সৃষ্টিকর্তা কে? খ্রীষ্টানেরা এই প্রশ্নের সহুত্তর দিতে পারেন না। অক্সফোর্ড মিসনের জেমস সাহেবের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন “আমরা এ কথার উত্তর দিতে পারি না।” সাধারণ খ্রীষ্টানেরা শরতানকে পাপের স্রষ্টা বলেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। কেন না সৃষ্টিকর্তা এক জন ইহা খ্রীষ্টানেরা নিজেই বারবার স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে পাপের সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত আছে।

“ধৰ্ম্মগুনোত্তমো ধৰ্ম্মপথোহস্ত পৃষ্ঠং ।”

“পরাত্তেতরধৰ্ম্মস্ত তমসস্তাপি পশ্চিমঃ ॥”

ভাগবত

“ব্রহ্ম। যে বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট পুরুষের বক্ষ দেশে ধৰ্ম্ম ও পৃষ্ঠ দেশে অধৰ্ম্ম দ্বারা নির্মিত। যে অধৰ্ম্ম পরাত্তেতর কারণ এবং দ্বারা অবিসৃষ্ট, তাহা বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ।” ধৰ্ম্মের পশ্চাৎভাগে অধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মের সম্মুখে ধৰ্ম্ম ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ আমার বোধ হয় এই। পাপ ও পুণ্য এই দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহার একটর

সহিত অন্যটী এমন ঐখিত আছে যে উহার উভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর । দেবোচিত প্রণয়ের সহিত পাশব কামের নিত্য সম্বন্ধ এ তথ্যের দৃষ্টান্ত স্থল । আমরা যে সমস্ত পাপ দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে সঙ্গে এক একটি পুণ্য কার্যও দেখিতে পাইব । এবং ঐরূপে পুণ্যের সহিত পাপের নিত্য সম্বন্ধ সর্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অমিশ্র পাপ ও অমিশ্র পুণ্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাইবেন না । আবার অল্প দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য বলিয়া কোন বস্তু নাই । উদ্বেগ ও অবস্থা ভেদে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে ।

৩য় । পুণ্যময় ঈশ্বর পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন ? ইংরাজী শাস্ত্রে এ প্রশ্নের উত্তর নাই । হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে পাপ, সৃষ্টির এক প্রধান উপকরণ । পুত্রোৎপাদন ব্যতীত সৃষ্টি রক্ষা হয় না । কিন্তু পুত্রোৎপাদনের জন্য কাম প্রভৃতি পাপ রিপূর প্রয়োজন । ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য প্রথমে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার এই চারি জনকে সৃষ্টি করেন । ইহারা অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ছিলেন ! ব্রহ্মা ইহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে বলিলেন ।

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ

তস্মৈচ্ছন্ মোক্ষধৰ্ম্মাণো বাসুদেব পরায়ণাঃ । ভাগবত ।

“ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রজা সৃজন করিতে বলিলেন । কিন্তু তাহারা মোক্ষধৰ্ম্মী ও কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন । এজন্য প্রজা সৃজনে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না ।” অবিদ্যা, অহঙ্কার, মোহ, প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি না থাকিলে সৃষ্টি চলে না । বাহার মোহ নাই সে কি কখন আত্মজীবন বা পুত্র কন্যাতির জীবনের জন্য বন্ধবান্ হইতে পারে । ফলতঃ সৃষ্টির জন্য পুণ্যের (সম্ব গুণের) যেকোন প্রয়োজন, পাপের ও (তমোগুণের) সেইরূপ প্রয়োজন । সম্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমাবেশ ব্যতিরেকে সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হয় না । পাপ থাকুক, কিন্তু পাপের প্রশ্রয় দেওয়া নিষিদ্ধ । ঐ বিরাট পুরুষের ন্যায়, তোমারও পৃষ্ঠ দেশে পাপ আজন্ম গ্রহণ করুক । পাপ উহার কার্য করুক । তুমি উহার প্রতি নয়ন মন অর্পণ করিও না । ধর্মের দিকেই তোমার দৃষ্টি থাকুক । পাপের প্রয়োজন বত টুকু, তুমি ততটুকুর সাহায্য লইয়া অবশিষ্টের প্রতি তুমি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন কর । পাপ অথবা তমোগুণ একেবারে পরিহার

করা অসম্ভব । বতক্ষণ ত্রাণ কেবল সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ ছিল । সমুদ্রের সহিত তমঃ মিশ্রিত হওয়ার সৃষ্টি সম্ভটিত হইল । আরও এক কথা । হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি ও সংহার একই সূত্রে আবদ্ধ । যদি সৃষ্টির সময়ে সময়েই পাপ না থাকিত, তাহা হইলে পরে কখনই সৃষ্টির সংহার হইত না । সংহারের অন্ত সৃষ্টির প্রথম হইতেই সৃষ্টির সহিত পাপ অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে ।

৪র্থ । ঈদোনেরা বলেন যে তাঁহারা সৰ্ব্বাপেক্ষা পাপকে বড় ভয় করেন । তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পাপ হইতে পূরিত্রাণের অন্ত প্রার্থনা করেন । হিন্দুরা ধন ধাতাদির অন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু পাপ মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে না ।” ইহা মিথ্যা কথা, নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রার্থনা দেখিলেই বুঝা যাইবে; যে হিন্দুরা পাপ ভীত ।

ক । “পাপোহং পাপ কৰ্ম্মাহং পাপাশ্চ পাপ সম্ভবঃ

আহি বাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ সৰ্ব পাপ হরো হরি ।”

খ । দুর্গতাং ত্রায়সে বিষ্ণো য়ে অরন্তি সৰ্বং সৰ্বং ।

সৌহৃদ্যং দেবাতি দুৰ্দ্ধৃতঃ আহিবাৎ শোক সাগরাৎ ॥

বাহল্য ভয়ে আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল না ।

## সাধু-দর্শন ।

( ২য় ভাগ ১ম সংখ্যার পর । )

( এবার হইতে স্বামীজী আমাদের কথাবর্তী হলে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলে বাক্যলার তাহার সারমাত্র প্রকাশ করিব ) ।

স্বামীজী । আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড়ই সত্য । কেবল বাক্যলার দেশেই যে একরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা নহে ভারতের সর্বস্থানেই প্রায় এইরূপ অবস্থা দেখা যায় । আমাদের আশ্রমের নিয়মানুসারে সর্বভীর্ণ জমণে বিধি আছে, স্তব্রাং ভারতবর্ষের প্রায় সর্বদেশেই আমাদের বাইতে হয় । অতুনা হিন্দু সমাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহািলে শরীর সযসর হইয়া যায় । আমরা কিছুদিন পূর্বেই যে সমস্ত স্থানে সন্ন্যাসী প্রমিয়া বহু সমাদরে আদৃত হইয়াছি সেই সমস্ত স্থানেই আবার এখন

সন্ন্যাসী মাঝকেই স্বপ্নার সহিত প্রত্যাক্ষাণ করিয়া থাকে । সে প্রকার কতটাই  
 ভেন আর নাই । বেদেশে সাধু সজ্জনগণ সম্যক প্রকারে সন্মানিত না হন  
 সেদেশের ধ্বংস অতি সন্নিকট । আর যে আপনি কর্ণেল আলকাটের কথা  
 বলিলেন, ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট কিছু দিন অতিত হইল আনিয়াছিলেন ।  
 তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হয় । তাহাতে আমি অনেক  
 নুতন কথা ও নুতন আশা শুনিতে পাইরাছি । বাকলা দেশে এই আলকাট  
 সাহেবের চেলা কিরূপ বাড়িতেছে ?

আমি । প্রথমে যখন আলকাট সাহেব ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন  
 শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই উৎসাহিত  
 হইরাছিলেন এবং দলে দলে আলকাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ।  
 কিন্তু এখন আর সেরূপ আশ্রয় দেখা যায় না । বাকালীর সকল কার্যেরই  
 গতি এইরূপ । কিন্তু সাহেবের উদ্যম কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই ।  
 আমাদের উত্তরের এইরূপ বার্তালাপ হইতেছে এই সময় একজন তত্ত্ব  
 বেশধারী হিন্দুস্থানী উপস্থিত হইয়া বন্দনা পূর্বক বলিলেন, “বাবীজী  
 মহারাজ ! রাগি না আপনাকে প্রণাম জানাইয়া আপনার শারীরিক সংবাদ  
 জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইরাছেন ।”

বাবীজী । রাগি নাইকো । হামারা আশীর্বাদ দেকর কহো । (আমাকে  
 লক্ষ্য করিয়া) ইহে বাকালী বাবু হামারা বড় প্রেমিক ছাত্র, রাগিজীকোভি  
 ইহে বাকালীকে সাৎ প্রেম করনে হোগা ।”

আগন্তুক পুনরায় বন্দনা করিয়া এই সংবাদ লইয়া চলিয়া গেল । আমি  
 বাবীজীর অন্ততরুণ বাক্য শুনিয়া অবাক হইলাম । মনে মনে করিলাম যে  
 রাগিমা না জানি বাবীজীর এ কথা শুনিয়া কতই লজ্জিত হইবেন । একজন  
 রাজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোককে বলা হইল “বাকালীকে সাৎ প্রেম” করিতে হইবে ।  
 আমাদের পাপ মন, তাহাই বক্তৃতা ভাবই মনে আসিল ; কিন্তু বাবীজী অকপট  
 ও নির্ভিক হৃদয়ে কেমন সুস্বাধা ভাবে অহুরাগের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ  
 করিলেন । পবিত্র বাক্যের পবিত্র ব্যবহার হেথিরা হৃদয়ে কত আনন্দ হইল ।  
 আর হতভাগ্য বাকালী এই “প্রেম” শব্দের কি অপব্যবহারই করিয়া থাকে ।  
 আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বাবী বলিতে লাগিলেন,—ইহাঁকে  
 (রাগিকে) আপনি জানেন না । ইনি দক্ষিণ দেশের ঐ—রাজার স্ত্রী, এখন  
 বিধবা, পরম ধার্মিকা, আত্মপোষা আপনি বড়ই সুখী হইবেন । রাগিমা প্রায়ই

আমার নিকট আসিয়া থাকেন ; হুতরাং আপনার সহিত একদিন দেখা হইবে । স্বামীজী কথা শেষ হইবামাত্র একজন দীনবেশধারী অতি শান্ত মুক্তি হিন্দুস্থানী আসিয়া দাঁড়াইল । অমনি স্বামীজী আমার লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; বাবু । এই ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রেমিক । হইবার সহিত “বহৎ বহৎ” প্রেম করিতে হইবে । আমি সাধনাবহার প্রচণ্ড শীতের সময় দিবসে অনাহারে যখন গঙ্গাতীরে শয়ন করিয়া থাকিতাম, এই ব্যক্তিই তখন অতিব অনুরাগের সহিত আমার নানাক্রপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন । উনি আমার ধর্ম পথের পরম সহায়, হুতরাং আমার পরম মিত্র । অভ্যাগত ব্যক্তি সসম্মানে কিছু অপ্রেতিত হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সমস্ত নরনে স্বামীজীর প্রতি অবলোকন করিয়া নিম্ন জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । এইরূপে কিছুকণ অতিবাহিত হইলে, পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম । স্বামীজী ! এই ত হিন্দু সমাজের অবস্থা, এ অবস্থায় কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব ? এখনই ত একরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, হুতরাং আত্মজ্ঞান কি উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি তাহার উপায় বলিয়া না দিলে আমাদের ন্যায় অগতির গতি নাই ।

স্বামীজীর সকল কথাতেই হাঁসি, হাঁসিয়া বলিলেন,—ভয় নাই, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ লাভ ও সাধুগ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভে বস্ত্রশীল হও । চিত্তের একাগ্রতা হইলে সমস্তই সম্ভব জানিবে । কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ ব্যতীত অন্য উপায় নাই । বোগীই বল, পরমহংসই বল, সকলকেই প্রথমে সাধুসঙ্গরূপ পবিত্র সেতু পার হইতে হইয়াছে । সাধুর বেশধারী অভ্যাগত ব্যক্তিমাঝকেই সাধুরে সৎকার করিবে । অনেক ভণ্ড সাধুরবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে, হুতরাং সাবধানের সহিত সাধুবেশধারী পথিকগণকে সৎকার করা কর্তব্য । ভণ্ড লোকের করিয়া অতিথি সৎকারে বিরত হইও না । যদি কখন ভণ্ডের দ্বারা বঞ্চিতও হও তথাপিও অধিতি সৎকারে বিরত হইবে না ; কারণ, সাধুতত্ত্ব থাকিলে একদিন না একদিন তোমার গৃহে প্রকৃত সাধুর সমাগম হইতে পারিবে । কিন্তু তুমি যদি সাধুবেশধারী মাঝকেই ভণ্ড বলিয়া তাড়াইয়া দাও তবে হয়ত একদিন প্রকৃত সাধুকেও চিনিতে না পারিবা ভণ্ড জ্ঞানে বিভুরিত করিবে । সাধুদিগের সঙ্গে কণকাল সহবাস না করিলে কিছুতেই তাঁহাদের চিনিতে পারা যায় না । তাই বলিলাম, সাধু সম্রাসী দেখিলেই

যথাগাধ্য সংকার করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবে । যদি তোমার অকপট সেবা দ্বারা এইরূপ অজ্ঞাত সারেরও কোন একজন প্রকৃত সাধুর সন্তোষভাজন হইতে পার, তাহা হইলে তোমার ভাগ্য অপ্রসন্ন হইবে । বহু জন্ম তপস্বীর দ্বারাও তুমি যাহা না করিতে পারিবে সাধুর রূপা হইলে স্বল্প কাল মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে । অতরাং সাধু সেবার কদাপি অবহেলা করিও না ।

সাধু সহবাসে মহাত্ম্য আমি একমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম । একমাত্র সাধু সহবাসে পশুও মনুষ্যস্থ লাভ করিতে পারে । সেই জন্য ঋষিগণ শাস্ত্রে নানাবিধে সাধু সহবাস এবং সাধুদিগের আচরিত পথের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন । বিশেষতঃ এই অধর্ম-প্রধান কলিযুগে দুর্বল মানবের অধঃপ্রোতস্থিগী বৃত্তির আধিক্য বশতঃ চিন্তের একাগ্রতা লাভ একরূপ অসম্ভব । শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত অনুষ্ঠান দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে দুর্দমনীয় বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে । (প্রাণাদিবৃত্তি, মানসবৃত্তি, অভিমান বৃত্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি, প্রকৃতি-বৃত্তি এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করার নাম প্রকৃতবৃত্তি নিরোধ) অতরাং একরূপ কঠোরতম তপস্বী এ কলিযুগের সাধনবিহীন সংসারের একান্ত অসম্ভব । কিন্তু এক সাধু সহবাস দ্বারা সাধুমহাত্ম্যে ক্রমে সকল প্রকার নিরোধশক্তি আপনাপনি উপজিত হইতে থাকে এবং সমস্ত জীর্ণসিত ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায় । শাস্ত্র বারম্বার এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ।

আমি । সাধুবৈশাখী দেখিলেই কি তাহাকে সাধুজ্ঞানে পূজা করিব ? তাহাতে কি ভণ্ডের প্রভাব দেওয়া হইবে না ?

দ্বায়ী । সাধুর লক্ষণ দেখিয়া সাধু চিনিতে শিক্ষা করিবে । শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে সাধুর লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে । অদ্য আমি তাহারই কথঞ্চিৎ আপনাকে বলিব ।

ক্রমশঃ ।

## কর্তব্য জ্ঞান ।

মানবগণ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যদি আপন আপন কর্তব্য বোধ থাকে, যদি কর্তব্য পালনের অধিকার উপার্জন করিতে বা সেই অধিকার স্থির রাখিতে চেষ্টা থাকে, আপনার উপর কোন ভার অর্পিত আছে অনুক্ষণ ইহাই পর্যালোচনা করিয়া যদি তদনুসারে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে আর সংসারে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। ধর্ম-বিলম্ব, সমাজবিলম্ব, রাজ্যবিলম্ব প্রভৃতি লোলূপ রাক্ষসগণ মুখব্যাদান করিয়া সামাজিকগণকে আর গ্রাস করিতে পারে না। এই কর্তব্যজ্ঞান বা তদনুসারে কার্য করা যদি সংসারে প্রচারিত হইত, তবে এতদিন ধরাধাম স্বর্গের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ধারণ করিত, পাপস্রোত এতদিন শুষ্ক হইত। হুই একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কর্তব্যজ্ঞান শব্দটী হুই কথায় বলা হইল, তদনুসারে কার্য করা উচিত ইহাও সহজে বলা গেল, কিন্তু ব্যাপার বড় গুরুতর। কোন সম্প্রদায়ের কি কর্তব্য, কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহা স্থির করা তরল মতির পক্ষে কঠিন ব্যাপার। একরূপ অনেক সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়িক আছেন যাহারা নিজের কর্তব্য বিষয় কি, কোন অধিকারে নিজে অবস্থিত আছেন, আদৌ তাহার অনুসন্ধান রাখেন না, গতানুগতিকের ন্যায় কেবল কালস্রোতে ভাসিভেছেন, ঘট নাচক্রে যেখানে উপস্থিত করায় সেই স্থানেই অস্পন্দ দাঁড়াইতেছেন।

যে বিষয়ের অবতারণা করিব বলিয়া এত কথা বলিলাম সংক্ষেপতঃ তাহার পরিচয় দিতেছি। আজ কাল ধর্ম ধর্ম করিয়া চারিদিকে একটা হৈট্টেই হৈট্টে পড়িয়াগিয়াছে। শিশুর মুখে, যুবকের মুখে, প্রৌঢ়ের মুখে ধর্মকথা বই আর কথা নাই। চারিদিক দেখে শুনে বুড়োরা এখন ধর্মকথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেনই বা না দিবেন, অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ হৃদয় প্রপৌত্র বালককে ত্রোড়ে করিয়া “সাতে ভবতু” শিখাইতে বসিলেন, তিনি জানেন না যে প্রপৌত্র তাহার চৌদ্দ পুরুষের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইয়া বসিয়াছে। “সাতে ভবতু অপ্রীতা” ত অতি লঘুতর বিষয় কতশত কূটস্থ চৈতন্য কত অধ্যাসবাদ, কত মনোবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান তাহার বিরাট শরীরের মাড়ে তিন কোটী নাড়ীর প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে।

জুবিলির সময় যেমন কলিকাতার দৌল শ্রেণী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, প্রেক্ষাগৃহের শরীরও এখন তদ্রূপ নানাজাতীয় চৈতন্যমালায় বেষ্টিত । শঙ্করাচার্য্যের কূটস্থ চৈতন্য, কপিলের নিগূর্ণ পুরুষ, রামানুজের বিশিষ্ট-বৈষত, কত চৈতন্তর নাম করিব, তাহার শরীরের থাকে থাকে মূলিতেছে । ঋষিগণ-শাস্ত্রকারগণ প্রভৃতির উপদিষ্ট চৈতন্য, এখন চিত্তমধ্যে প্রকৃতরূপে জাগরুক হয় না, উহা কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, কেবল বকবাদের অমুকুল হইয়া একরূপ তোতাপাখি সাজায় । চৈতন্য হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে সদৃশকর অনুসরণ করিতে হইলে, তদুপদিষ্টমার্গে পদচারণ করিতে হইবে ।

আমাদের সমাজের ভিত্তি বসিয়া গিয়াছে, স্তম্ভস্থগুণ লাগিয়াছে, কেবল বাহিরে ধপ-ধপে চুণকাম করা, পচা কুমড়ার জায় একেবারে অস্তঃসার বিহীন হইয়াছে । আর সময় নাই, এখন সমাজের কল্যাণকাজীদের উচিত অকপটভাবে মনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, সামাজিক বিশৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া, উপযুক্ত নায়ক বা চিকিৎসকের নিকট আনুপূর্ব্বক রোগের বিবরণ বিজ্ঞাপন করেন । নতুবা তুলা রাশিহু বহির জ্ঞান সমাজ বিলম্ব ধীরে ধীরে একেবারে সমস্ত ভস্মসাৎ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই ।

পূর্বে বলা-গিয়াছে, চৈতন্তহৃদয়ে ধারণ করিতে গেলে সদৃশকর অনুসরণ করিতে হয়, এই সদৃশকরগণই আমাদের সমাজনায়ক বা ধ্বস্তরি চিকিৎসক । কিন্তু ভাগ্যদোষে এই সম্প্রদায়েরই লোক গতানুগতিকের ন্যায় কালশ্রোতে বা ঘটনা-শ্রোতে ভাসিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের ( গুরু সম্প্রদায়ের ) অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমাজবন্ধন ধর্ম্মবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া একরূপ অস্তর্হিত হইতে চলিয়াছে । বেদিন হইতে গুরু-সম্প্রদায় বিলাসি হইয়া কর্তব্য বোধ হারাইয়াছেন পাঠকগণ নিশ্চয় জানিবেন সেইকণ্ঠেই সামাজিক রোগের সূত্রপাত ।

সমাজের শীর্ষ স্থানীয় গুরু সম্প্রদায়ের অবনতিতেই আমাদের এত দুর্দশা সংসাধিত হইয়াছে । গুরু বলতেই সমাজের বল । শাস্ত্র গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—“গিরে রুঠে গুরুত্বাতা গুরোরুঠে নকচন” গুরু জুড় হইলে আর নিত্য নাই, দেখিলেন ঈশ্বর অপেক্ষা গুরুদের সামর্থ্য অধিক । নগুরোরধিকং তৎস্বং ন গুরোরধিকং তপঃ,—পরমার্থ বল, বা তপস্তা বল গুরুদেবের উপর কিছুই নহে ! পাপিনর তাহাই



অপার বিস্তৃত সমুদ্রে পতিত হইয়া চিংকার করিয়া বলে গুরুদেব রক্ষাকর  
আজ সমাজতরী বিশাল সাগরের উত্তালতরঙ্গে ভাসমানা, আর নিস্তার  
নাই, প্রতিকূল বায়ু (বৈবর্ধিদের ফাঁদ) বেষ্তপ বহিতেছে, তাহাতে অচিরাত  
কর্ণধারহীন তরী জলগত হইবে, গুরুদেব ! আর নিস্তার নাই আর কতদিন  
নিম্মিত থাকিবেন, জাএত হউন, সমাজতরী রক্ষা করণ ।

নৌকার মারি হইতে হইলে কর্ণের (হাইলের) কাঁটা কি ভাবে ঘুরাইতে  
হয় প্রবল তরঙ্গে কি ভাবে নৌকা সোজা রাখিতে হয় তাহা শিখিতে হয়,  
উৎসাহ বাক্যে দাঁড়িদের হৃদয় উচ্ছসিত করিতে হয়, ছেলে বেলা হইতে  
মারিগিরি শিক্ষা করিলে পরিণামে একজন ভাল নাবিক হইতে পারে ।  
এত গেল সামান্য মারি মাল্লা নৌকার কথা ; আমাদের প্রভাবিত নৌকার  
মারির (গুরুদেবের) কালক্রমে কিছুই শিক্ষা করিতে হয় না, কেনই বা  
হইবে নৌকাচালনের ভার এখন দূরস্থ পদাতি পথিকের উপর শুভ ।  
তাহারা নৌকার নিকটেও না থাকিয়া দূর হইতে কেমন অশ্রম নৌকা  
চালাইতেছেন । অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় কার্য করিতেছেন, কেনই বা ভয়  
নিভের নহে মহাজনের মালের দাবি দাওয়া নাই, তবে আর ভয় কি ?  
সম্মোরে তেরী বাজাও, সামাজিক দাঁড়িগণ জোরে দাঁড় টানিবে নৌকা-  
খানি একবার বাম ভাগে একবার দক্ষিণভাগে বা যে দিকে হয় চলিয়া বাউক,  
পন্নার বোলায় পড়ুক তাহাতে ক্ষতিকার ?

তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, শাস্ত্রকারদিগের হইতে কোন দোষ  
আছে । যে শাস্ত্রে গুরুদেবের উল্লেখ আছে তাহাতেই দেখিবেন তাহার  
শিক্ষার বিষয়, কর্তব্য নির্ণয়, অধিকার প্রভৃতি সমস্তই অতি বিশদভাবে উপ-  
দিষ্ট আছে । সদৃগুরু লক্ষণ কথা ;

শান্তোদাস্তঃ কুলীনশচ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ ।

শুদ্ধাচারঃ স্প্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ স্বেশবান্ ॥

আশ্রমী ধ্যান নিষ্ঠশচ তত্ত্বমজ্ঞ বিশারদঃ ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

উদ্বর্ত্তকৈব সংহতুঃ সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ !

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরু কচ্যতে ॥

অর্থাৎ

যে ব্যক্তি শান্ত দাস্ত, অর্থাৎ যিনি অন্তরিস্মিতকে ও বহিরেস্মিত

চক্ষুরাদিকে অঙ্গ করিয়াছেন, বিনি কুলাচার রত, বিনয়ি। পবিত্রবেশ ( শুভ  
বস্ত্রাদি) ধারি, পবিত্রাচার সম্পন্ন, সংকার্য্য দ্বারা বশবী, পবিত্র, কার্য্যকুশল,  
পুণ্ড্রিক, বর্ণাশ্রমবিহিত ঈশ্বরারাধনার রত, স্তুতিনিন্দ্যায় অচলচেতাঃ, সেই  
দিব্য পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। গুরুদেবের লক্ষণ অনেক  
স্থানে অনেক রূপে লিখিত আছে সমস্ত দেখাইতে হইলে প্রবন্ধটী অতি  
দীর্ঘ হইবে বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। সংক্ষেপত ইহাই বলা যাইতে  
পারে যে গুরুদেব বলিলে যেমন একটি স্বর্গীয় পুরুষের ভাব এখনও  
লোকের মনে উদয় হয় ঠিক সেই ভাবটী বাহাতে রক্ষা পায় গুরুদেবের  
অবস্থা তাহা করা কঠব্য। গুরুদেব! মন্তকের সহস্রার পথে আপনার  
স্থান, আপনি শিষ্য নয়নে লোকাভীত দিব্য পুরুষের জ্ঞান, সেই দেখা-  
দেখি সামাজিকের চক্ষেও ভাসমান, অতি গুরুতর ভাব আপনার উপর  
অর্পিত রহিয়াছে, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অক্ষরের বেক্সপ হাঁচ,  
যেমন ছাত্রবৃন্দেও ঠিক সেইরূপ অক্ষর হয়, যেমন শিক্ষকের জ্ঞান  
জ্যোতিঃ শিষ্যের হৃদয়ে চালিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার চরিত্র  
সমস্ত সমাজে অঙ্কিত হইবে, আপনি সকল কার্য্যের আদর্শ। শিষ্যের চরিত্র,  
সামাজিক গঠন সমস্তই আপনার দেখাদেখি হইবে। শিষ্যগণ যদি ধার্মিক  
হয় সেটী আপনার সহৃদয়ত্বের ফল, যদি অসংযততাঃ পাপী হয় সেটীও  
আপনার দোষ, অবশ্যই আপনি সেই পাপের ভাগী হইবেন; “তব্রত  
শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুব্রাত্তোতিনিশ্চিতং”; আপনি যে ভাবে চলাইয়া-  
ছেন শিষ্যগণ বা সমাজতরী সেই ভাবেই চলিতেছে, গুণ দোষের ভাব  
সমস্তই আপনার উপর। আপনি নিম্নিত থাকিলে চলিবে না; নিম্নায়  
কিরূপ ফল বচক্ষে অবলোকন করিতেছেন। এখন আর সে দিন নাই,  
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই হউক, বৈদেশিক সম্মিলনেই হউক, ঘটনাচক্রে  
বা কাল ক্রোড়েই হউক সামাজিকগণের মনোভাব এখন রূপান্তরিত  
হইয়াছে। কাজেই বলিতে কি গুরুদেব একরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া  
দাঁড়াইয়াছেন। হয় কি ছুর্জিন, কি ভীষণ কাল, যে গুরুদেবের নাম  
শ্রবণ করিলে চিত্ত যেন এক অনির্বচনীয় রসে পরিপ্লুত হইত, শরীর  
ভক্তি ভাবে রোমাঞ্চিত হইত, ক্ষণকালের জন্য পাপ সংসার যেন  
অদৃষ্ট হইয়া পড়িত, সেই মাহাত্ম্য নামে আজ কত কথাই শুনা যায়।  
কত ব্যঙ্গ, বিক্রপ, হাসি, ঠাট্টা গুরুর উপর চলিতেছে। এ দোষ

কাহার ? গুরুদেবের না শিষ্যের ? আমি বলিব, শত সহস্র লক্ষ অনন্ত বার বলিব, অগ্রে গুরুর দোষ; পশ্চাৎ শিষ্যের । শিষ্য বিধর্ষি, অভ্যাচারি, হুর্নতি হইল, তখন গুরুদেব গর্ভপ্রাব, পাণ্ডু ইত্যাদি কত শত মধুর বাক্য নিষ্ট ভৎসনা করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু যে সময়শিষ্যের চিত্ত রূপধগামি হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন গুরুদেব কোথায় ? শিষ্যগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইতেছে, যে বীজ মন্ত্র কর্ণে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে, উন্নত উপদেশ দিবার সময় হইয়াছে কিনা এ সমস্ত কর্তব্য বিষয়ের কি অনুসন্ধান হইয়া থাকে ? প্রতিবর্ষে বার্ষিক এইগণের সময় কি বেছায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে ? কখনই নহে তাহা হইলে সমাজের দশা কখনই একরূপ হইত না । গুরুদেবও উপহাসের পাত্র হইতেন না । ভারতবর্ষ কোন দিন ধর্মহীন হইবে না, ধর্ম্মিকের মান, সাধুর প্রতিষ্ঠা কোন দিন অন্তর্হিত হইবে না । আপনি নিজের কর্তব্যজ্ঞানকে হইয়া সমাজের নায়ক হউন, দেখিবেন আপনি ( গুরুদেব ) মাধায় থাকিবেন, সমাজ আপনার চিত্র-পদানত ।

আর এক সম্প্রদায়ের ( পুরোহিত সম্প্রদায়ের ) কথা বারাস্তরে প্রকাশ করিব । ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনারা যতই না কেন চেষ্টা করুন যত দিন গুরু পুরোহিত স্ব স্ব পদের অধিকারী হইয়া আপনাপন কর্তব্য সাধনে তৎপর না হইবেন তত দিন ধর্ম্মপ্রচার বাহিরে বাহিরে ভাসিয়া বেড়াইবে । যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার ইচ্ছা থাকে তবে সর্ব্বাঙ্গে গুরু পুরোহিতগণকে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হউন, দেখিবেন পঞ্চম বর্ষীয় বালক বালিকা হইতে শত বর্ষের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাবে মাতিবে, সমাজের এ বিপ্লব আর স্থান পাইবে না ।

গুরুদেবের কর্তব্য ও পৌরহিত্য আমরা বারাস্তরে প্রকাশ করিব ।



## নবমী পূজা ।

( গত মাসের পর । )

ভোলাদাস । মা গো ! তোর একটা কথাই যে অত্যন্ত চিন্তিত হই-  
লাম ! মা ; তুই এইক্ষণে বলিলি যে আদিরস ঘটিত তোর যে সকল  
ক্রীড়া ও কর্মাদি আছে তাহা রজোগুণ প্রকৃতির লোকের কীৰ্ত্তনীয়, কিন্তু  
ভক্ত শাস্ত্রে তোর ঐক্লপ যে সকল ক্রীড়া কর্মাদির কথা আছে, এবং শ্রুতিও  
তত্ত্বকে আদর্শ করিয়া কোন কোন পুরাণ শাস্ত্রে যে তোর ঐক্লপ ক্রীড়া  
কর্মাদি আছে তাহা কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি লোকেরই আলোচনীয়,  
এবং কীৰ্ত্তনীয়, এখন কোন্টা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব ?

অগদম্বা বৎস ! স্থির হও, শাস্ত্রে কখনও মিথ্যা কথা থাকে না,  
সমস্তই সত্য । আদিরসের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল বিষয় তত্ত্ব এবং  
তত্ত্বানুসারি-পুরাণাদিতে আছে তাহা আদিরস নহে, সেই সকল ক্রীড়া  
কর্মাদিও আদিরস প্রকাশক নহে, তাহা শাস্ত্র রস প্রকাশক । বাহার্য্য নিতান্ত  
অন্ধ, নিতান্ত জড়বুদ্ধি তাহার উহার কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কেহ শূদ্রার  
রস, কেহ বীভৎস রস, কেহ ভয়ানক রসাদির বিষয় বলিয়া অবলোকন করে;  
কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি । এখন হস্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রণালী শ্রবণ কর ।

হস্ত এবং পদেন্দ্রিয়ের দ্বারা দুই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে । এক,—  
স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া, দ্বিতীয়,—পরতঃ প্রবৃত্তা-ক্রিয়া । কেবল হস্ত এবং  
পদেন্দ্রিয়ের পরিচালনাদি জনিত তৃপ্তি লাভার্থে যে হস্ত পদের ক্রিয়া হইয়া  
থাকে, তাহা হস্ত পদের স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া । আর অন্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-চরিতার্থ-  
তার নিমিত্ত যে হস্ত পদের ক্রিয়া করা হয়, তাহাই পরতঃপ্রবৃত্তাক্রিয়া ।  
প্রথম জাতীয় ক্রিয়ার উদাহরণ,—কেবল আমোদের নিমিত্ত, অন্যের সহিত  
নিযুক্ত করা অর্থাৎ হাতাহাতী ও বলপ্রকাশ করা, এবং কেবল আমোদের  
নিমিত্ত পদচালন, অটল, এবং ধাবনাদি করণ । এইক্লপ ক্রিয়া কেবল  
হস্ত আর চরণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভার্থেই হয়, এ নিমিত্ত ইহা স্বতঃ প্রবৃত্তা  
ক্রিয়া । ২য় প্রকার ক্রিয়ার উদাহরণ,—পূর্বোক্ত রূপ ক্রিয়া ব্যতীত, হস্ত  
পদের স্বত প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই পরতঃপ্রবৃত্তা ক্রিয়া । সচরাচর হস্ত  
পদের যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই পরতঃপ্রবৃত্তা ক্রিয়া । রসনা, চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকাদির পরিভূষ্টির নিমিত্তই প্রত্যেক মনুষ্য সর্বদা হস্ত পদের পরিচালনা করিতেছে, অতএব যে সকল ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার নিমিত্ত হস্ত পদের ক্রিয়া হইবে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিটা যদি পূৰ্বোক্ত মতে আমার উপাসনার্থে বিকসিত হয়, তবে হস্ত পদের সেই সকল ক্রিয়াও আমার উপাসনারই অন্তর্গত, আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি যদি আত্মার্থে বিকসিত হয়, তবে হস্ত পদের সেই ক্রিয়া গুলিও আত্মার্থেই পরিগণিত হইবে। এতএব সেই সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের সমর্পণ প্রণালী বলিলেই হস্ত পদের বিষয় সমর্পণ প্রণালী বলা হইবে, অতরাং পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। তৎপর স্বার্থ-প্রবৃত্তা ক্রিয়া বাহা হয় তাহা অতি সামান্য, তদ্বারা কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, অতরাং তদ্বিষয়ে বাক্য বিস্তার করা অনাবশ্যক। এখন উপস্থিতানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি।

সৃষ্টির সময়ে সৃষ্টি বিস্তার আমারই অভিপ্রেত, তাহা পূর্বেরই ( ) বলিয়াছি, অতরাং “যথা সময়ে ঋতুচর্য্যা করিলে আমারই অভিমত কার্য্য করা হইল,” এই কথায় স্মৃত বিবাস রাখিয়া ঋতুচর্য্যা করিবে। তাহা হইলে উহার ইন্দ্রিয়জনিত পরিভূষ্টিটা, আমার অভিমত ক্রিয়া বলিয়া যে পরিভূষ্টি জন্মিবে, তাহারই অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে। ক্রমে সেই স্রুৎেরই প্রবলতা হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার স্রুৎ ক্রীণ ও অনুপলব্ধ হইবে। এবং ঐন্দ্রিয়িক স্রুৎের অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অন্তর্নিহিত হইয়া পড়িবে। অবশেষে কেবল আমার অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া ইন্দ্রিয়ানুরাগ এক কালে বিনিবৃত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ ইন্দ্রিয় বাসনা নিবৃত্তির আর একপ্রকার উপায় পরিকল্পিত আছে, যাহা আমি তদ্বাদি শাস্ত্রে বীরাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছি; তাহা অতীব গুরুতর বিষয়, এবং অতীব উচ্চতম লোকের অনুর্ত্তেয়। সাধারণ লোকে তাহার গূঢ় রহস্তে দস্তবেধ করিতেও পারে না, অতরাং সেই অনুর্ত্তান করিতেও পারে না। তাহারা ছাগলের ন্যায় রিপু চরিতার্থ করিয়া বীরাচারী হয়। অতরাং সে বিষয় এখন বলিব না; তুমি শীঘ্রই অন্যস্থানে তাহা শুনিতে পাইবে। এখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় নিবেদনের প্রণালী শুন।

নয়নেন্দ্রিয়ের দর্শনের সমস্ত বিষয়ের সহিত, যদি আমার ভাব এবং আমার অনুরাগ বিমিশ্রিত থাকে তবেই নয়নের বিষয় আমাতে সমর্পিত হইয়া দর্শনানুরাগ নিবৃত্ত হয় এবং আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তাহার

এই প্রণালী,—লোকে যে নানা প্রকার দৃশ্য ভাল বাসিয়া থাকে, রদ বিরক্তের গৃহ, উদ্যান ও শয্যাসনাদি দেখিতে ভাল বাসে, বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভূষণাদি দেখিতে ভাল বাসে, রূপ লাভণ্যাদিযুক্ত বিচিত্র আকৃতি দেখিতে ভাল বাসে এবং আরও কত কি ভাল বাসিয়া থাকে তৎসমস্তই আমাতে সমর্পিত হইতে পারে। আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপ নির্মাণ করিবে, আমার পূজার্থে দর্শনার্থে, এবং আত্মার্থার্থে মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই গৃহ এবং সেই উদ্যানাদিকে যথাভিমত পরিসজ্জিত করিলে, তাহা আমি অন্য কোন ধানে তুলিয়া লইয়া বাই না, কিম্বা “ইহা আমার; ইহা রাম দাসের নহে; রামদাস যেন ইহা কোন রূপে ব্যবহার করে না” এই রূপও বিজ্ঞাপনাদি দিই না, সুতরাং উহা আমার নিমিত্ত বিরচিত ও আমার সামগ্রী হইলেও উহা সন্দর্শন করিয়া কর্তার নিজ গৃহ এবং নিজের বিচিত্র উদ্যানাদি দর্শনেরই পরিভূষ্টি হইবে, এবং সে যখন আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত! তখন আমার হইলেই তাহার নিজস্ব বোধ হইবে, সে আমার স্বখে স্বখী হইবে। নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, অণুর, কস্তুরী মাল্যাদি দ্বারাও আমাকেই সাজাইয়া তাহার মধুরতা নয়নসাৎ করিবে, এবং আমারই পরম দর্শনীয় এক এক আকৃতির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। তাহা হইলেই রূপস্থায়ী মাতা পিতা ও পুত্র ভাৰ্য্যাাদিতে অনুরক্ত ব্যক্তি যেমন তাহাদিগকে মনোমত সাজাইয়া তাহাদের রূপ লাভণ্যাদি সন্দর্শন করিয়া অপরিমিত চাক্ষুষ আনন্দের অনুভব করে, এবং তদ্বারাই নিজের সজ্জিত হওয়ার স্পৃহা চরিতার্থ হয়, সেইরূপ পরিভূষ্টি লাভ হইবে। আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি নিবন্ধন আমাকে সাজাইলেই, আমার রূপ মাধুর্য্য দেখিলেই যেন তাহার নিজের সজ্জীকৃত হওয়ার স্বখ, নিজেরই রূপ লাভণ্য দর্শন করার পরিভূষ্টি, লাভ করিতে পারিবে, সুতরাং নিজের ভোগ স্পৃহাও চরিতার্থ হইবে।

এইরূপ সন্দর্শনে যদিচ পার্থিব রূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহাতে আমার ভাব সম্মিলিত থাকিতে উহা আমার সেই অলৌকিক রূপ এবং কৈলাসপুত্রী ও কৈলাসের উদ্যান দর্শনের সমান ফল হইবে। অর্থাৎ উহাতে পার্থিব রূপাদির ভাব অন্তরালে রাখিয়া আমার ভাবই সম্মুখে

উপস্থিত হইবে, সুতরাং উহা পার্শ্বিক রূপ দেখার মধ্যে পরিগণিত না হইয়া আমার রূপ দর্শন গণ্য হইবে। পার্শ্বিক রূপ দর্শনের পরিভূষ্টি হুৎও আমার রূপ সন্দর্শন জনিত সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে এবং পার্শ্বিক রূপ দর্শনের অমুরাগও আমার প্রতি অমুরাগের অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। এই গেল সাধারণ নিয়ম, এখন ইহার বিশেষ বিশেষ নিয়মও বলা যাইতেছে। ভোলাদাস। বাগিল্লিয়ের বিষয় যেমন গুণ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত চক্ষুরিল্লিয়ের বিষয়ও তেমন প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। তামসদৃশ, রাজসদৃশ এবং সাত্বিক দৃশ। যেকোন দৃশ নয়নগোচর হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাত্বিক প্রবৃত্তি পরিদীপনা হয় এবং নয়নের শীতল স্বাভাবিকতা হয়, তাহাই সাত্বিক দৃশ্য। শাস্ত কাকুণ্য রসের যেকোন দৃশ দেখিলে হৃদয়ে অভিমান, ক্রোধ ও দম্বাদির ভাব পরিদীপিত হইয়া বীর রসাদির পরিস্ফুর্্তি হয় এবং যে দৃশ নয়নের উত্তেজনা কারক তাহাই রাজস দৃশ। যে দৃশ নয়নসাৎ হইলে বিহ্বলতা এবং প্রেমানাদির ভাব উদ্দীপিত হয় এবং বীভৎসাদি রসের আবির্ভাব হয়, আর চক্ষুরিল্লিয়ের শিথিলতা সম্পাদন করে তাহা তামস দৃশ। এই ত্রিবিধ দৃশের মধ্যে যে যে প্রকৃতির লোক সে সেইরূপ দৃশের দ্বারাই আমার পরিচর্যা করিবে। তামস প্রকৃতির লোক তামস দৃশের দ্বারা রাজস প্রকৃতির লোক রাজসদৃশের দ্বারা এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্বিক দৃশের দ্বারা আমার পরিচর্যা করিবে। কারণ যে যে প্রকৃতির লোক সে সেই প্রকৃতির বিষয়ই অধিকতর ভাল বাসে, বিপরীত প্রকৃতির বস্তু কেহই ভাল মনে করে না। যাহা ভাল বাসে না তাহা আমাকে দিলে ক্ষতি ভিন্ন যে কোন উপকার নাই, তাহা পূর্বেই ( ) বলিয়াছি, যে বিষয় বা বস্তু যাহার প্রিয়তম তদ্বারাই আমার পরিচর্যা করিবে তাহা হইলেই কৃতকার্য হইতে পারে ইহাও পূর্বেই বলিয়াছি ( )।

ভোলাদাস। মাগো! যদি সমস্ত প্রকার দৃশাবলীর দ্বারা তোমাই পরিচর্যা করিল তবে তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার এবং নিজের কি উপায় হইবে, পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদের রূপ লাভণ্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না কি? যদি করে তবেই বিষয়াসক্তি হইল, সুতরাং আত্মাভিমান আসিয়া আক্রমণ করিল তবে আর তোর সংসার তোর কর্ম বলিয়া মনে করা যায় না। আর স্ত্রী পুত্রাদিকে ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা পালন না করিলেই বা কিরূপে সংসারাত্মকে থাকি যায়?

অগদম্বা।—তাহা অবশ্যই করিবে, কিন্তু তাহাতেও ভাব বিমিশ্রিত থাকিলে, ঐক্লপ কার্য্য দ্বারা অণুমাত্র অনিষ্ট হইতে পারে না। বৎস! আমি এমন শ্রুকৌশল করিয়া রাখিয়াছি যে, মানব ইচ্ছা করিলে সমস্ত কার্য্যই আমার সংস্কার দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পারে। আমি এইরূপ বিধি করিয়াছি যে “পবিত্রবাসাঃ পুত্ৰান্না শুক্ল যজ্ঞোপবীতকঃ। শুক্লোক্ষিষো বহু শিখোভূষা সৰ্বং সমাচরেৎ” ইহার অর্থ এই যে, ভগবদ্বিশেষে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালেই অপরিষ্কৃত এবং দোষিত বসন যুগল পরিধান করিবে, অভ্যঙ্গ স্নানাদি দ্বারা দেহটিকে অতি পরিষ্কৃত রাখিবে, শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং অপরিষ্কৃত উকীষ ধারণ করিবে, কেশকলাপ উত্তমরূপে বিবদ্ধ করিবে এবং চন্দনাদি দ্বারা বিচিত্র তিলক করিবে, তৎপরে দেব কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।” অতএব আমার দৈনন্দিন কার্য্যের অনুরোধেই তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ গ্রহণ এবং বেশ ভূষাও করিতে হইল। অতএব আমার উপাসনাতেও নিজের অপরিচ্ছদ এবং শ্বেতাশাদির শ্রুত ভোগও হইতে পারে, অথচ উহা আমার উপাসনার অঙ্গীভূত হইল বলিয়া আমার উপাসনার মধ্যেই পরিগণিত হইবে এবং আমার প্রিয় কার্য্য বলিয়া তাহাতে যে তৃপ্তি শ্রুতের অনুভূতি হয় তাহাও আমার পুত্রা জনিত তৃপ্তি শ্রুতের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে এবং তাদৃশ বেশভূষাদির অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অন্তরেই নিবিষ্ট হইবে; কারণ, ঐক্লপ বেশ ভূষাদি করার মূলই আমার প্রতি অনুরাগ। অতএব ঐ রূপ কর্ম্ম যত করিবে ততই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তৎপরে সজ্জীক হইয়া যখন ধর্ম্মাচরণের বিধি আছে, তখন জ্বরও তদনুযায়ী পরিচ্ছদ ও বেশভূষাদি করিতে হইবে। পুত্র কন্যাদিকেও আমার ভৃত্য সেবকাদি মনে করিয়া, তাহাদের শিশু অবস্থা হইলেও, আমার উপাসনার ও কর্ম্মাদিতে অধিকারী করিয়া রাখিতে হয়, তবেই তাহাদিগকেও যথোচিত পরিচ্ছদ ও বেশভূষাদি পরাইতে হইল, অথচ ইহা আমার নিমিত্তই হইতেছে বলিয়া নিজের কোন দায়িত্বজনক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমার সংসার ও আমার পরিবার বিবেচনায় যদি পুত্র কলত্রাদি বেশ ভূষাদি করে তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু ইহার মধ্যে আরও কথা আছে তাহাও বলা বাইতেছে,—এই যে



শ্রী পুত্রাদি এবং নিজের পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষাদি করার কথা বলিলাম ইহা ও আমার পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি এবং তাহার নিজের প্রকৃতি এত দূরের সমজাতীয় হওয়া চাই। অর্থাৎ বাহার তামশ প্রকৃতি সে আমাকেও তামস দৃষ্টাবলীরদ্বারা পরিচর্যা করিবে, এবং শ্রী পুত্রাদি পরিবার সহ নিজেরও তামস দৃষ্টেরই পরিচ্ছদাদি ব্যবস্থা করিবে। যে রাজস প্রকৃতির লোক সে আমাকে, এবং শ্রীপুত্রাদির সহিত নিজেকেও রাজস দৃষ্টাবলীর দ্বারা রঞ্জিত করিবে, আর যিনি সত্ত্ব প্রকৃতিক তিনি সাত্ত্বিক দৃষ্টতায়ুক্ত পরিচ্ছদাদি দ্বারাই আমাকে এবং নিজকে ও শ্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গকে সজ্জিত করিবে ইহার অন্যথা হইলেই বিপরীত ফল হইবে। ফলে আপন প্রকৃতির অনুমোদিত পরিচ্ছদাদি, লোকে স্বতঃই গ্রহণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে এই জন্যই আমার এক এক প্রকার পূজাতে এক এক প্রকার পরিচ্ছদাদি গ্রহণের বিধি আছে।

ভোলাদাস। মা! আর একটি সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, এইটি না বলিলে তৃপ্ত হইতে পারি না, মাগো! তুই বলিয়াছিস সমস্ত দৃষ্টাবলীর দ্বারা তোরই পরিচর্যা করিতে হইবে, তাহা হইলেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুরাগ নিবৃত্তি হইয়া মা তোর প্রতি অনুরাগ জন্মিবে; কিন্তু, মা, তুই যে প্রণালী বলিলি, তাহাতে কেবল তোর পূজার অঙ্গস্বরূপ দৃষ্টাবলী সমর্পণের উপায় বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মা! সংসারি লোকের নয়ন সকলদিকেই বিধাবিত হয়, গ্রাম নগর, পল্লী প্রভৃতিতে কত অসংখ্য দৃষ্টাবলী দেখিয়া নানা প্রকার তৃপ্তি লাভ করে, এবং তাহার প্রতি অনুরাগও হয়, সেইগুলি তোকে সমর্পণ করার উপায় কি?

জগদম্বা। বৎস! তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আমার শরণাপন্ন পুত্রের কোন প্রকারে কোন বিপদ হইতে পারে না, আমি সমস্ত বিষয়েরই যথাযথ উপায় বিধান করিয়াছি, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়েরও বিশেষ উপায় অবধারিত আছে তাহা বলা বাইতেছে। প্রথমে আমার ইদানীন্তন অন্যতম প্রিয়পুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কি বলিয়াছেন শুন,—

(গাওরা,—তিওট)

“স্বগম সাধন বলি তোরে, ওরে! আমার মূঢ়মন! সাধরে।

বধন বাহাতে অখে থাক, মন! তাতেই ভাব মারে ॥

যদি না থাকিতে পারি মন ! চিন্তামণি পুরে ।

চরাচরে স্ত্রীমা মায়েরে সকলে সঞ্চরে ॥

স্থলে অনলে শূন্য আছে মা ঘোর সলিলে সমীরে ।

অন্ধাণ্ড ক্লিপীগী স্ত্রীমা, মায়ে জাননারে ॥

ঘটে আছে পটে আছে, মা ঘোর সকল শরীরে ।

কামিণীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন হরে ॥

কমলাকান্তের মন ভয় করেছ কারে ।

বিরিঞ্চি বাহ্নিত নিধি ঘটেছে তোমারে ॥”

আমার কমলাকান্ত যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য, আমি সর্বভূতময়ী, সমস্ত বস্তুতেই আমি তাদাস্য সম্বন্ধে আছি, অতএব যেখানে অতিশয় দর্শনী-মততা ও সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়, সেইখানেই আমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া উহা আমারই সৌন্দর্য্য বলিয়া মনোনিবেশ করিবে, তবেই উহা বিষয়ের সৌন্দর্য্য না হইয়া আমার সৌন্দর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে । এবং সেই দর্শনের ফলও আমার মুক্তি সৌন্দর্য্য দর্শনের ফলের ন্যায়ই হইবে, ইহা করিলেই সমস্ত দৃষ্টাবলী আমাতে সমর্পণ করা হইল । এই কথা হয়ত পরেও আর একবার বিস্তার ক্রমে বলা যাইতে পারে, অতএব এখন (অতি সংক্ষেপেই বলিলাম, এখন ভ্রাণেঞ্জিয় বিষয় সমর্পণের প্রণালী শুন,—

শুণ প্রভেদে গন্ধ ও তিন ভাগে বিভক্ত ; তামস গন্ধ, রাজস গন্ধ এবং সাত্ত্বিক গন্ধ । যে গন্ধের দ্বারা হৃদয়ে শান্ত রস এবং ভক্তি বিবেকাদি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির পরিদীপনা হয় এবং যে ভ্রাণ ভ্রাণেঞ্জিয়ের নিকটে লবু-তর বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ভ্রাণ । যে গন্ধ অত্যন্ত সাক্ষে-তিক এবং আদি রসাদির সন্দীপক তাহা রাজস গন্ধ, আর যে গন্ধ অব-সাদক ও বীভৎস রসাদির উদ্বীপক তাহা তামস গন্ধ । এই তিন জাতীয় গন্ধযুক্ত পুষ্পাদি অব্যের দ্বারা তিন জাতীয় লোকে আমার পরিচর্যা করিবে । সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্ত্বিক গন্ধযুক্ত অব্যের দ্বারা, রাজস প্রকৃতির লোক রাজস গন্ধযুক্ত অব্যের দ্বারা, এবং তামস প্রকৃতির লোক তামস গন্ধযুক্ত অব্যের দ্বারা সেবা করিবে । কারণ, আপন প্রকৃতির অনু-মোদিত গন্ধই সকলের প্রিয়তম হইয়া থাকে । প্রিয়তম অব্যের দ্বারা আমার সেবা করিলেই বিহঙ্গমরাগ নিদ্রুতি হইয়া আমার প্রতি অনু-রাগ বৃদ্ধি হয় ইহা পূর্বেই বারং বারং বলিয়াছি । আপন প্রিয় গন্ধ অব্যের দ্বারা

আমার পরিচর্যা করিলে স্রাণেশ্বরের আপ্যায়ন জনিত যে অর্থ বোধ হয়, তাহা আমার ভোগ জনিত তৃপ্তি অর্থের অন্তরালে পড়িয়া যায় এবং গন্ধত্রযো ভোগের অনুরাগও আমার অনুরাগের অন্তর্নিহিত হয়। এখন শ্রবণের বিষয় বলা বাইতেছে।

বাক্য যে তিন প্রকারে বিভক্ত এবং এক এক জাতীয় বাক্য এক এক প্রকৃতির লোকের প্রিয়, তাহাও পূর্বেই বলিয়াছি। বাক্যের ন্যায় গান ও বাদ্যও তিন ভাগে বিভক্ত। যে রাগ রাগিণী ও স্বর তালগ্রামযুক্ত গান বাদ্য ভক্তি বিবেকাদি এবং শাস্ত্র করণ রসের পরিদীপক তাহা সাস্বিক গান বাদ্য, এবং যাহা আদি রসাদিও দস্তাদি রসোবুত্তির পরিদীপক করে, তাহা রাজস গান বাদ্য, আর যাহা বীভৎস রসাদির উদ্দীপন করে তাহা তামস গান বাদ্য। এই সকল গান বাদ্যাদির মধ্যে এক এক রূপ গীত বাদ্য এক এক প্রকার প্রকৃতির লোকের প্রিয়তম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মেক্লপ গান বাদ্য বাহার অধিকতর প্রীতিকর হয় সে সেই জাতীয় গান বাদ্যের সহিত, ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপক আমার জীড়া কলাপের বোঝনা করিয়া গান বাদ্যাদি করিবে এবং অস্ত্রের নিকটে শুনিতে গেলেও ঐরূপ গীত বাদ্যাদিই শুনিবে। তাহা হইলেই আমার ভাবে গদগদ হইয়া তাহার শ্রবণেশ্বরও চরিতার্থ হইবে। আমার উপাসনা করাও হইবে। সেইরূপ গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করা গীত বাদ্য শ্রবণের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া আমরা শুণ শ্রবণের মধ্যেই গণ্য হইবে; গীত বাদ্য শ্রবণের তৃপ্তিও আমার শুণ শ্রবণের তৃপ্তির অভ্যস্তরে নিবিষ্ট হইবে, এবং গান বাদ্যের অনুরাগও আমার অনুরাগে দ্বারা সমাবৃত হইবে, ইহার প্রণালী পূর্বেই বলিয়াছি। এখন স্পর্শেশ্বরের বিষয় শুন।

শব্যাসনাদির মুহু কোমলাদি স্পর্শ এবং গ্রীষ্মাদি কালভেদে জল, বায়ু, রৌদ্রাদির শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করিয়া মানব তৃপ্তি অর্থের উপভোগ করে। তন্মধ্যে আমার পূজার অঙ্গীভূত নানাবিধ অকোমল আসনাদির বিধি আছে, আমার পরিতৃপ্তি সাধন মানসে সর্বদাই ঐরূপ আসন ব্যবহার করিতে পারে, তদ্বারা আসন বসনের অকোমল স্পর্শের অনুভূতি হয় অথচ তাহা আমার নিমিত্ত করা হয় বলিয়া পূর্বোক্ত মতে বিষয়াকর্ষক না হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধকই হয়। তৎপর আমাকেও নানারূপ কার্য্যাসনাদি অর্পণ করার বিধি আছে। তাহা করিলে, আপন পুত্র

কস্তাদি পরিবারগণের উত্তম শব্যাসনাদি ব্যবহারে যেমন নিজের শব্যাসনাদি ভোগ স্বার্থের অনুরূপ হয়, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও সেইরূপ পরিভূক্তি হইতে পারে, আমাকে ভোগ করাইলেই যেন নিজের স্পর্শনৈন্দ্রিয়রও চরিতার্থ স্থখ হয় । তদ্বারা নিজের ভোগানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় । তৎপর অভ্যাস শীতোষ্ণাদি সময়ে বধন রোজ, অগ্নি, জল বায়ু প্রভৃতির স্থখকর স্পর্শানুভব করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে তখন তাহা আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া ভোগ করিবে । প্রচণ্ড আতপ জ্বালায় বধন জীব লোক পরিগীড়িত হয়, তখন আমিই মৃত্ত ভাব প্রকাশ করিয়া অশীতল সলিল এবং কমলীর সমীরণের অন্তরালে থাকিয়া সকলকে শান্তি প্রদান করে, তখন তাহা আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া ভোগ করিবে । আবার দুঃস্থ শীতের দ্বারা বধন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনও আমিই রোজাজলের অন্তর্নিহিতা থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করিয়া থাকি । এইজন্ত দেব দেব আমাকে বলিয়াছেন, “ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোপি গগণং যথেকা কল্যাণী গিরিশ রমণী কালি সফলম্ । ● ● ●” এই সত্য তত্ত্ব সম্বরণ করিলে হৃদয় ভক্তি রসে আগ্রস্ত হইয়া উঠিবে, তখন স্পর্শ স্থখ ভুলিয়া গিয়া আমার ভক্তি স্থথেরই আবাদ করিতে থাকিবে । সুতরাং তদ্বারাও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া আমার অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইবে । এইরূপে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করিতে হয় । অতঃপর রসেন্দ্রিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি ।

সদ্বাদি গুণ ভেদে আহারও প্রথম ত্রিবিধ, সাত্বিক আহার, রাজস আহার, এবং তামস আহার । এই ত্রিবিধ আহার ত্রিবিধ প্রকৃতিক লোকের প্রিয় হৈহা শ্রীমান্ অর্জুনকেও আমি কথাস্তরে বলিয়াছিলাম, “আহারস্যপি সর্বত্র ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ । ● ● ● আয়ুঃসম্ভবলারোগঃ স্থখপ্রীতি-বিবৰ্দ্ধনাঃ । কষ্টরূপলবণাত্মক তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ আহারান্নাভ্যবেষ্টা হৃৎশোকাশ্রয় প্রদাঃ । বাতরাসং গড়বনং পুতি পৰ্য্যুষিতঞ্চ যৎ । উচ্ছ্রষ্টমপি চামেব্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ● ● ● ত্রিবিধ লোকের প্রকৃতি ভেদে ত্রিবিধ আহার প্রিয় হইয়া থাকে । যে অস্বাদ্য আহারের দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্বৈর্য বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম স্থখ এবং প্রীতি বিবৰ্দ্ধন

হয়, বাঁহা রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে ভাবা আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর বাঁহা ছদা, কোন প্রকার বিকট এবং উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) জৈদৃশ ত্রব্য সকল সাঙ্গিক, এবং ইহা সাঙ্গিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল ত্রব্য কষ্ট অন্ন লবণ রসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ ও ক্রান্ত্য কারক, উত্তাপ বর্দ্ধক উহা রাজস আহার, এবং রাজস প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারে দ্বারা দুঃখ শোক ও নানাপ্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধ পক ও বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পুষ্টি গন্ধ যুক্ত পথ্যুয়িত উচ্ছিষ্ট এবং আমীষাদি আহার, সকল তামস প্রকৃতির লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরামিষ হবিষ্যাহার এবং হবিষ্যের যোগ্য যে সকল ফল মূলাদি তাহাই সাঙ্গিক আহার এবং সাঙ্গিক প্রকৃতির প্রিয়, পবিত্র মৎস্ত মাংসাদি সম্বলিত যে আহার তাহা রাজস এবং রাজস প্রকৃতির লোকের প্রিয়। তন্মধ্যে যে সাঙ্গিক প্রকৃতির মানব সে আমাকে নিরামিষ হবিষ্য ফল মূলাদি দ্বারা অর্চনা করিবে, যে রাজস সে বিহিত মৎস্যমাংস, এবং অন্যান্য রাজসভোগ প্রদান করিবে; আর যে তামস সে তামস ভোগের দ্বারাই আমার সেবা করিবে, এবং অবশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। এই রূপ করিলে তাহার রসেন্দ্রিয়ের স্পৃহান্বিত হইয়া আমার প্রতি ঐকান্তিক অহুসার হইবে, ইহার প্রণালী বিস্তার পূর্বক বলিয়াছি, আর বিস্তার আবশ্যক নাই।

এইরূপে আপনাপন প্রকৃতির অনুমোদিত সমস্ত প্রকার ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার পরিচর্যা করিতে হয়। এই জন্যই শাস্ত্রেতে আমার উপহারাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি নিষেধ আছে। কোন্ খানে কোন্ বস্তু দিতে বিধি আছে, আবার কোন্ খানে তাহারই নিষেধ আছে, কোন রূপ আচরণ করিতে একবার বিধি আছে, আর একস্থানে আবার তাহারই নিষেধ আছে, তাহার মুখ্য কারণই, লোকের প্রকৃতি ভেদ নিষেধ অধিকার ভেদ, তবে অবশ্যই এ বিষয়ে আরও ১১টি কারণ না আছে তাহা নহে, তাহাও বোধ হয় স্থানান্তরে তুমি জানিতে পারিবে। হতবুদ্ধি মূর্খগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া মিছামিছা শাস্ত্রের দোষারোপ করে।

## পাগল ।

মনভরে মাতোয়ারা, কপালে তোলা নয়নভারা পাগলের বুকভরা ধন  
 পাগলী তুই কে রে ? আজ দল পেয়েছি, বল পেয়েছি, আর ত কাকেও  
 ভয় করি না ; পাগলামীর গ্লানি গল্পনা লজ্জা নাহিনা আর ত হৃদয়ে স্থান  
 পায় না, আজ প্রাণের কবাট খুলিয়া দিয়া বাহ তুলিয়া গগন ছড়াইয়া গান  
 ধরিব—“লোকে আমার পাগল বলে ও পাগল বলে কি তার ক্ষতি হবে ?  
 লোকের কথা, কথার কথা, লোক কি আমার সঙ্গে থাকে ।” তুই যদি মা  
 পাগল হয়েছিস, আমার তবে লজ্জা কি ? পাগলীর ছেলে পাগল হবে এ  
 আবার আশ্চর্য্য কি ? তবে এই টুকু লোকে বলতে পারে—মাতৃদোষে  
 পাগল হলো । আজ মা তাই হলেন, লোকের সঙ্গে বিবাদ করা গৌল  
 যোগ বই কিছুই নয়, তাই নিরুপায়ে তোমার পায়ে জিজ্ঞাসি যা মনে  
 হয়—তুমিই একবার বল, তোমার চরণতলে ও কি ? আ । সর্বনাশ সর্ব-  
 নাশ !! হও তুমি সর্বাঙ্গধামিনী, হও তুমি বসুন্ধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু  
 আমার এ প্রশ্নের উত্তর করা তোমার বাবার মাথাতেও কুলাইয়া উঠবে  
 কি না সন্দেহ । বাপান্ত করিলাম বলিয়া রাগ করিও না । তোমার বাপও  
 নাই তার অস্তও নাই, আর যদি বল আছে—তবেত সে পাহাড়ে বাপের  
 পাথুরে মাথার এ প্রশ্নের উত্তর হবেই না, সত্য কথাই বলেছি তাতে আর  
 রাগ কি ? সে বাহোক তোমার বাপান্ত ছেড়ে দিয়ে একবার আমার বাপান্ত  
 করি এস, সত্য করিয়া বল দেখি তোমার চরণ তলে হৃদয় ঢেলে জীবন্ত  
 মরণে মরে আছেন ওই ভাল মানুষ দেবতাটি কে ? কি বলিবে বল মা ;  
 উনি কি তোমার ছেলে না বাবা ? অথবা তোমার ছেলের বাবা ? নিশ্চয়  
 করিয়া, না পারিবে তুমি বলিতে, না পারিবেন উনি বলিতে, না পারিব  
 আমি বলিতে । শেষ কথাটি তুমি বলিতে পারিবে, কিন্তু তবুও বলিবে  
 না—তাই পাগল, প্রাণের দারে অস্থির হইয়া বলিয়াছে—কোথা—খে এসব  
 আসে কোথায় যার, ও তা ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে ভাবনা শেষে  
 ভাবনা পায়,—তাই বল পাগলী মরা করে—পাগলটা তোর কেবা হয়—  
 বলমা পাগল কি তোর চির কালের পাগল, অথবা যে দিন তোর চরণতলে  
 আগুন ছলে হৃদয় ছেলে জীবন্ত শব সাজিয়াছেন, সেই দিন হতে পাগল ?

পাগলি ! তোমার দয়ার বলে এমন সাদা সিঁথে দেবতাটিকে ছাই ভস্ম মাখিয়ে পাগল সাজাইয়াছ—মা ! তুমি নিজের সাজিয়াছ, সাজিতে শিখিয়াছ তাই সাজাইতে পারিয়াছ—এমন সাজা কবে সাজাবি, যে দিন এই রাজা প্রজা পরিপূর্ণ পার্শ্ব সংসারের সকল সাজা ঘুচে যাবে—কবে সেই আনন্দময় প্রশানে শুভ্রে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দময়ীর চরণ নিয়ে আনন্দের খেলা করিব, আনন্দে অধীর হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলিব—মা সংসার পাগলের খেলা । বন্ধা বিষ্ণু পাগলীর চেলা, যে বুকে পাগলের খেলা, খেলা সবে তার—মাতৃ দোষে পাগল হয়ে, পিতৃ দোষে চরণ পেয়ে, আত্ম দোষে নেচে গেয়ে, সংসারের পার পায়ে—তাই জোর করে মা আবার বলি পাগলীর ছেলে কেনা নয় ? যার বাবা পাগলা, মা পাগলী, সেও কখন ভাল হয় । আর যারা বাবা মায়ের ধার ধারে না, ভুঁই ফোড়া নাম জাকাতে চায়, তেমন ছেলে থাকার চেয়ে কতি কি, মা ! গোমায় যাওয়ায় । শুধু তাই পরকে পাগল বলা কেবল পাগলামী বই আর কিছুই নয়—ভবের এই রাজী দেখে, রাজী থেকে, পাগলী কেবল পাগল না হয়, না হলে তাই মানুষ যারা পাগল তারা এ কথা জেন নিশ্চয় ।

ছেলেটা কালকে হলো আজকেই হলো, বাবার মরণ বহুদিন হয়, তবু হার আমি থাকব, রাজা হব, এর চেয়ে পাঞ্জি আবার কে হয় ।

যদি কেউ বলে তোমায়, কি কর হার, নিকটে যে মরণ সময় ; তুমি তার আগে আশুন, করিবে খুন, কেন না সে অমঙ্গল কর, যদি কি বুদ্ধির দ্বীপ, অমঙ্গলটা বুকে উঠলে মরণ নয়, তা এ ভবে সব অমঙ্গল, মরণ কেবল মহা মঙ্গল, তার আর নাই ক্ষয় । তাইতে দেখ জীবন ত্যেজে, মরে আছে, পাগলীর চরণ করে আজন্ম, পাগলের রাজা যে জন, জীবন মরণ ও পদ পেলে সব সমান হয় ।



২য় ভাগ।

১২৯৪ সাল।

৪র্থ খণ্ড।

## “ মায়া । ”

মধুর মধুসামিনী, সুস্নিগ্ধগলর বাহে শরীরকান্তি অপনোদিত হই-  
তেছে, মন প্রফুল্লিত, প্রাণ শীতল। মল্লিকা ও মালতীযুগ বিকসিত হইয়া  
দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। চল্লিকা অতি নির্মল। প্রকৃতি অতি  
বিচিত্র বৈশভূয়ার ভূষিত। সমস্তই মেঘীর ও ক্ষুদ্রিময়। প্রতি আননে  
উৎসাহের রেখা বিভাসিত; এমন সুখময় সুসময়ে বিশ্বনাথের রক্তপুর সন্দ-  
র্শনে কোতুলল অগ্নিল। ক্রমে কোতুললে প্রমোদিত হইয়া, বিকসিত  
চম্পক-দ্বায় পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলাম। চতুর্দিক্  
নিরীক্ষণ করিয়া কোতুললের তর্পণ সাধন হইল। ক্ষণকাল পরে তাবা-  
স্তর সজলটিত হইয়া, রঙ-খুরের নানা রঙ অস্ত্রুত হইতে লাগিল। কোথাও  
হরিৎ কোথাও শ্বেত, কোথাও নীল কোথাও পীত। মল্লিকাওচ্ছের  
কোন বৃক্ষে বিকসিত মল্লিকাযুগ কোমুদীসহ হাস্যাত্মক করিতেছে, যথো-  
যথো মধুকরগণ পরিহারার্থ বক্তার করিতেছে। পার্শ্বে, শুক নীরস কুম্ভ-  
মের প্রতি তাহার আর দৃষ্টি নাই। কিঞ্চিৎ পূর্বে স্রুচতুর ভ্রমর তাহার  
মধুর ভিখারী ছিল। একবৃক্ষে একটা কুমুম সৌরভ সম্পন্ন ও বিকসিত,  
অস্ত্র কুমুম শুক, পতিত ও গলিত। বসন্ত প্রভাবে কোন বৃক্ষে নবীন প্রাঙ্গ-  
মাল উদগত হইয়া অপূর্ণ শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন বৃক্ষ পত্রবিহীন



কোন বিটপ শুক, কোন বিটপ সরস। নীড়ে বা কোটরে, অচির-জাত পক্ষি-শাবক জনক জননীর পক্ষপূট সমাচ্ছাদিত। কোথাও ডিম্ব মধ্যে কলল-সমাবেশ। কোন পক্ষ নিরাপদস্থান অন্বেষণ করিতেছে, কোন জন্তু বিহারার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কেহ আহারে, বিমুখ হইয়া, নিত্রার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছে, কেহ আহারের জন্ত ব্যতিব্যস্ত। কোন মানব উৎকল স্বদয়ে বজ্রসহ প্রমালাপ তৎপর, কেহ বা আলাপ পরাশ্রুত, কেহ বা তাল লয় সুসঙ্গত মধুর গানে, শ্রোতৃবর্গের কর্ণকূহর পরিতৃপ্তি করিতেছে, কেহ বা প্রিয়-বিনাশে রোদ্ধমান। কোথায় জন্মোৎসবে পরিজন আমোদমাগরে সত্তরণ করিতেছে। কোথাও প্রতিবেশিগণ সমবেত হইয়া, শব্দসুহ শ্রবণে গমন করিতেছে। কেহ স্কুধার নিবৃত্তি সাধন করিতে না পারিয়া, অশেষ ক্রেশ ভোগ করিতেছে। কেহ সুখাদ্য ভোজনে অবহেলা ও অনাদর প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। কেহ নিমজ্জিত কেহ আগরিত। ঐ যে নক্ষত্রজাল পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধজ্যোতিঃ চন্দ্রমার বিমল মরীচিমালার, জগৎ হাসিতেছিল, কণকাল পরে আর সে দৃশ্য নাই। বায়ু কোণে বিতস্তি পরিমাণ মেঘ খণ্ড, ক্রমে বিপুলতা ধারণ করিয়া, আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল, জগৎ তমোময়। কণে কণে কণপ্রভা বিক্ষুরিত হইতেছে, কাদম্বিনী গভীর গর্জনে সকলের অন্তরে আতঙ্ক জন্মাইয়া ধরাডল সিঞ্চন করিল। আবার কোথায় সে সমস্ত অপসারিত হইয়া, নির্মল আকাশের প্রকাশ। যে পথ প্রান্তর পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এখন পক্ষিগ। এইরূপ যতই নিরীক্ষণ করি, নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে অন্তরে চিন্তা করি, দেখি, জগৎ, জগৎ নহে, যেন ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজালে যেমন অঘটন ঘটিত হয়, অসম্ভব সম্ভাবিত হয়, এ স্থলেও তাহাই। ঐন্দ্রজালিক ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া, সকলের বিস্ময় জন্মায়, অথচ দর্শকগণের সেই মিথ্যাকাণ্ডে প্রচুর আমোদ জন্মিতে থাকে। আবার যখন ইচ্ছাহয় ঐন্দ্রজালিক, ইন্দ্রজালের উপসংহার করিয়া নির্গুণ হয়। এই বিশাল ইন্দ্রজালের ও এক অনন্তশক্তি—ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-প্রভাবে, উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ সম্পাদন করিতেছে। উহাই মারা। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-ব্যবসারে নিবৃত্ত স্তবরাঃ ঐন্দ্রজালিক আখ্যায় আখ্যাত। পরম ঐন্দ্রজালিকও মারী, মারাময়, মহামার ও মহামারী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত। আমরা যখন ইন্দ্র-

জ্ঞান দর্শন করি, দর্শন করিয়া বিমুক্ত হই। তখন প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তথ্য জ্ঞানে, তাহাতে আসক্ত হই। যখন বিরাগভরে উহার বাহিরে থাকি তখন বুঝি উহা মিথ্যা। মায়ার কার্য্যও তদমুরূপ। আসক্তভাবে বিচরণ কর, মায়াপাশে বদ্ধ হইবে, দেখিবে “আমার” “আমার” অথবা “আমি” “আমি”। বিরাগভরে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, বুঝিতে পাইবে “আমার” “আমার” নহে। বালক ইচ্ছাজাল পরিদর্শনে বিম্বিত হইয়া, আশু সমীপে বিনয় নম্র সহকারে উহার কারণ দ্বিজ্ঞান করিল, কাকনিক আশুজন আক্সাদের সহিত, উহার প্রকৃতি বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দিল, উহা সত্য নহে মিথ্যা; বালক বুঝিল, শিখিল, তদবধি স্থির করিল, ইচ্ছাজাল মিথ্যা মিথ্যা। মায়ী, মহামায়ার অপূর্ণ কোশলে সর্বতঃ বিস্তৃত। মায়ার অন্তত লীলার মুক্ত হইয়া, যে আসক্ত হইতেছে, তাহাকে তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইবার জন্য, মায়াদীনকে মায়াপাশ ছেদন করিবার জন্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি-মহামায়ার আশুপুরুষের জ্ঞানময় নির্মল, নিষ্পাপ, পরম পবিত্র স্বরূপে প্রকাশ করিয়া, জানাইয়া দিলেন “নাসিদ্ধং সংসারী” “তত্ত্বমসি”। এই মহাবাক্যে যে প্রবুদ্ধ হইল সে বুঝিল অগৎ মায়াময়, মিথ্যা। একমাত্র পরব্রহ্ম সত্য। প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সততই দেখে, অগতের কোথাও হাসিরানি, কোথাও কান্না, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ সজ্জ্বলিত হইতেছে। উহা আমোদজনক, কিন্তু আসক্তি ঘটিলে বড়ই বিষম, পদে পদে বন্ধন। আসক্ত ব্যক্তি স্তুতরাং বদ্ধ; এবং বিরক্ত,—মুক্ত। বিরক্ত যে দিগ্ নিরীক্ষণ করেন কেবল দেখেন মায়ী—ইচ্ছাজাল। অঘটন পটীয়নী মায়ার প্রকৃতি, অতি সজ্জ্বল হই চারিটী কথায় বলিয়া এখন মায়াবাদ সম্বন্ধে কিছু, আলোচনা করা যাইতেছে। মায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ লিখিয়া, বা বলিয়া, শেষ করিতে পারে না; অগতঃ যিনি পর্যালোচনা করেন, পর্যালোচনা করিয়া চিন্তার গভীরতলে নিমগ্ন হন, তিনি প্রতিপদে, প্রতি পুরমাণুতে, মায়ার বিচিত্র লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং কার্য্যকলাপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ময়বাদ বৈদিক। স্তুতরাং স্বকপোল করিত নহে। অনেকে ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত বলিয়া, প্রতিপক্ষে হই এক কথা বলিয়া—ছেন, তাহা অসার ও বিবেচ্য মূলক। সেই লেখাগুলি দেখিলেই উহা প্রতীতি

হইতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করাবতার । নিরোধ করা তমো-  
 জ্ঞের কার্য্য, তমোমল অপসারণ করিয়া সত্বের বিকাশ জন্ত তমোনাশক  
 শিব উপাস্য। নাস্তিকগণ প্রায় প্রবল হইয়া পবিত্র আৰ্য্যধাম নিরোধ  
 করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই তমোরাশি বিনাশ জন্ত শঙ্করাবতার ।  
 স্মৃতরাং তাঁহার প্রতিপক্ষে একদল লোক ছিল, ইহা সহজেই অনুমতি  
 হইতেছে। সেই নাস্তিক-জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা  
 যৌক্তিক ও সত্য; বিশেষতঃ ধর্ম্মাবাহিক আচার্য্য পরম্পরার উপদেশ  
 বিভাগিত এবং গুরুর অনুমোদিত। সেইজন্যই শঙ্করভাষ্যের এত গৌরব  
 ও শ্রদ্ধা। দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে রামানুজ প্রমুখ কতিপয় অধস্তন, পণ্ডিত  
 শঙ্করভাষ্যের প্রতিকূলতাচরণ করিতে গিয়াও উহার নিকটে উপস্থিত হইবার  
 পূর্বেই নিস্তেজ হইয়া প্রান্তে অবস্থান করিতেছেন। তাদৃশ লোকের  
 ছুই একজন মার্য্যবাদকে অবৈদিক বলিয়া লোকের মনে অশ্রদ্ধা জন্মা-  
 ইতে চেষ্টা করিয়া নিজেরাই অশ্রদ্ধের হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, সত্যের  
 জয় চিরকালই প্রবল হইয়া উঠে। মার্য্যমুন্দেরা যাহাই বলুন না কেন,  
 মার্য্যারা ভিন্ন, মার্য্যাপাশচ্ছেদন করিবার উপায়ান্তর নাই।

“মার্য্যবাদ অট্টোদিক” এই কথা কোথায় আছে তাহার অনুসন্ধান করা  
 বাউক। নাই নাই করিয়াও অর্থাশাস্ত্র প্রচুর রচিয়াছে। বহুবিধ শাস্ত্র  
 থাকিলে তাহার মধ্যে যদি কোন মত দ্বৈধ থাকে, তবে শাস্ত্র-সাক্ষর্য্য  
 ঘটিয়া অনেকের মনে অশ্রদ্ধা বা সংশয় জন্মিতে পারে, এজন্য দয়ালু  
 শাস্ত্রকারগণ ঐক্যানুমোদিত অংশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন এবং বেদ  
 বিরুদ্ধাংশ পরিত্যজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন।  
 ঐতিহ্যই প্রমাণ, ঐতিহ্যই শরণ। শাস্ত্রকার স্পষ্টাক্ষরে আজুল দিয়া দেখাইয়া  
 বলিলেন, উহা গ্রাহ্য বা উদার কিমদংশ গ্রাহ্য। যথা—

“অক্ষপাদ প্রনীতেচ কাণাদে সাম্ব্যযোগয়োঃ।

ভ্যজাঃ ঐতিহ্য বিরুদ্ধেংশঃ ঐতৈয়ক শরণৈব নৃভিঃ।”

জৈমিনীয়ে বৈয়াসে চ বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।

ইত্যাদি পরাম্পর বচনে দেখা যাইতেছে, জৈমিনি ও ব্যাস ঐতিহ্যদ্বয়ের  
 যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত উপদেশ, পরং তাঁহারাই মহাজন, তৎপ্রমাণিত-  
 পথে বিচরণ করিলে পার পাওয়া যাইবে। জৈমিনি ও ব্যাস ভিন্ন, ন্যায়

শাস্ত্রাণ্ডাভাঙ্গাদির ঐতিবিক্কাংশ পরিতাঙ্গ্য । যাহা অগম ও সদাচারযুক্ত তাহাই উপাসনীয় । \*

এখন যদি মারাবাদ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন কোন শাস্ত্রে না থাকে, তবে উহাতে কথঞ্চিৎ অগ্রদ্ধা জন্মিবে বিচিত্র কি? এবং উহা শঙ্করাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত বলিয়া অনেকে গ্রাহ্য করিতেও না পারেন; বস্তুতঃ তাহা নহে । পূর্বে দেখান গিয়াছে ব্যাস-বাক্যে কোন ঐতিবিক্কা কথা নাই । বাস বেদান্ত দর্শনকে, স্থল-বেদান্ত অনুধান করিয়া সঙ্কলন ও রচনা করেন । উহা সূত্রাকারে বিরচিত, সূত্রগুলি অঙ্গাকারে গ্রথিত । সূত্রাং সূত্র ভাৎপর্গ্য গুরুমুখে অবস্থান করিয়া কার্য্যকালে বহির্গত হয় । শঙ্করাচার্য্য ধারাবাহিক আচার্য্য পরম্পরায় উপদেশ বলে বলিষ্ঠ হইয়া গুরু জ্ঞান-কন্দর হইতে ভাষারত্ব উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহা তীক্ষ্ণ ও নির্মল করিয়া ধরাধামে প্রচার করিয়াছেন, নাস্তিকগণ তাহার জ্যোতিঃ সত্য করিতে না পারিয়া রাজিকরের ন্যায় পলায়িত বা লুক্কায়িত হইয়াছে । যাহা হউক, মারাবাদ যদি ঐতিতে থাকে এবং ব্যাস সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য উহা বৈদিক যুক্তিযুক্ত এবং শিষ্টাঙ্গমোদিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।

বেদ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । এই ব্রাহ্মণ ভাগেই উপনিষদ বা বেদান্ত ভাগ রহিয়াছে । মন্ত্র ভাগ সংহিতা বলিয়া পরিচিত এবং অনেক স্থলে বেদ বলিলে যেমন ঐ সংহিতা ভাগ বুঝাইয়া থাকে, কারণ, বেদান্ত ভাগ উপনিষদ প্রভৃতি ভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত হয় । তাহা বলিয়া মন্ত্রভাগ বেদ, ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, ইহা মূর্খের বা স্বেচ্ছের বিবেচনা । জৈমিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন “ মন্ত্র ব্রাহ্মণ-সমষ্টির্বেদঃ ” । এইরূপে আপস্তম্বাদি প্রাচীন স্মৃতি বাক্যও আছে । সূত্রাং সংহিতাভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ, উপনিষদ ভাগ যাহা বল সমস্তই বেদ । কার্য্য লৌক্যার্থার্থে মন্ত্র,

\* এতদ্বারায় ইহা বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলি বেদ জানিতেন না । তবে যে সব বেদ বিক্কা কথা আছে, তাহা অভ্যুপগম ও প্রোতীবাদের দ্বারায় বলা হইয়াছে, ইহা তত্তৎ স্থানেই আছে, সূত্রাং কোন বিরোধ নাই । বাস্তবিক সকল আৰ্য্য শাস্ত্রই এক ও বিরোধবিহীন । বে—সঃ

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রভৃতি একই বেদ ; খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত । কোন গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়ই সেই গ্রন্থ, আর শেষ দুই অধ্যায় সেই গ্রন্থ নহে, ইহা একান্ত অর্কবাচীনের বচন । মার্নাবাদের ঋতির উত্তরভাগেই রহিয়াছে । যথা--

“বিশ্বাহি “মার্না” অবসিদ্ধাবনু ।”

সামবেদ কৌশুমী শাখা ।

দ্যৌরিবাসী

বিশ্বাহি “মার্না” অবসিদ্ধাবঃ , ,

ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখা ।

মন্ত্র কাণ্ডের এই দুই স্থল ভিন্ন অন্যত্রও আছে, এতদ্ভিন্ন উপনিষদ্ ভাগ দেখা যাইতেছে । মার্নাবাদ উপনিষদ্ ভাগে বিশেষ রহিয়াছে, পরং উহাই মার্নাবাদের মূল মন্ত্র । বেদান্ত মার্নাবাদের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই । সুতরাং মার্নাবাদ বৈদিক ।

ইচ্ছ মার্নাভিঃ পুরুষং জয়তে ॥ বৃহদারণ্যক ।

এই ঋতি সম্পূর্ণরূপে মার্নাবাদ স্থাপন করিয়াছে । এতদ্ভিন্ন খেতাখ-তরে রহিয়াছে ।

“মার্নাক্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ মার্নিনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্যাবয়ব ভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥”

ঋতান্তরে পরমেশ্বরকে মহামার্ন, এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে ।

“সৰ্ব্বজং সৰ্ব্বশক্তি মহামার্নঞ্চ তদ্ব্রহ্ম ॥”

অতএব মার্নাবাদ ঋতির অস্থিগত, সুতরাং বৈদিক এবং উহা ভারতাদি প্রাচীন প্রামাণিক শাস্ত্রেও অস্বত্ব্যত হইয়াছে ।

“দৈবীহেবাগুণময়ী মম মার্না হরত্যা ।

মামেব যে প্রপাদ্যন্তে মার্নামেতাং ভবন্তি তে ॥”

ভগবদগীতা ।

এখন দেখা যাইতেছে, ঋতি, স্মৃতি ও ভারতাদি শাস্ত্রে মার্নাবাদ রহিয়াছে, অতএব মার্নাবাদ শ্রৌত, মার্নাবাদ স্মার্ত ।

এখন স্থিররূপে বলা যাইতে পারে যে, পদ্মপুরাণ-মার্নাবাদকে অবৈদিক বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে কটাক্ষতঃ গোপনে গ্রাহি করিতে বসিয়াছেন, উহা পদ্মপুরাণের কলঙ্ক । পদ্মপুরাণকে অক্ষত রাখিতে হইলে বলিতে হয় উহা

প্রক্ষেপ। কোম গৌড়া বৈতবাদি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া শঙ্করভাব্যের প্রতি  
অশ্রদ্ধা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে তাহাই অনাদৃত  
হইয়া ভাব্যরত্নের বিমল জ্যোতি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। পাঠক-  
বর্গের অবগতির জন্য পদ্মপুরাণের সেই বচন তুলিয়া দিতেছি।

### পদ্মপুরাণে পার্শ্বতীর প্রতি ঈশ্বরবাক্য ।

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্ ।  
যেবাং শ্রবণ মাত্রেণ পাতিভ্যং জ্ঞানিনামপি ॥  
প্রথমং হি মঠৈবোক্তং শৈবং পাণ্ডপতাদিকম্ ।  
মচ্ছত্ৰ্য্যং বেশিঠৈর্কিঠৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্ ॥  
কণাদেন তু সম্ভোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ ।  
গোতমেন তথাস্ত্রায়ং সাম্ভ্যাক্ত কপিলে নচ ॥  
দ্বিজশ্রুনা জৈমিনিনা পূর্ববেদমপার্থতঃ ।  
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্ ।  
দ্বিষণেন তথা প্রোক্তং চার্কাক মতিগর্হিতম্ ।  
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা ।  
বৌদ্ধশাস্ত্র মনং প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্ ।  
মায়াবাদ মসচ্ছাত্রং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ ॥  
মঠৈব কথিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ।  
অপার্থং শ্রুতি বাক্যানাং দর্শয়ন্তোঁক গর্হিতম্ ॥  
কর্ম্মস্বরূপভ্যক্ত্যত মত চ প্রতিপাদ্যতে ।  
ব্রহ্মণোহস্য পরং রূপং নিগূর্ণং দর্শিতম্ ময়া ॥  
সর্ব্বস্য জগতোহপাস্য নাশনার্থঃ কলৌ যুগে ।  
বেদার্থবদ্ব্যশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকম্ ॥  
মঠৈব কথিতং দেবি ! জগতাং নাশকারণাং ॥”

প্রায় শাস্ত্রেরই নিন্দা, ইহাতে বর্ণিত আছে। পরব্রহ্ম নিগূর্ণ, এই কথাও  
ইহার লেখার বিনিমিত। মায়াবাদকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া নিন্দা  
করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি মায়াবাদ অসং শাস্ত্র নহে, ময়া-  
বাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নহে এবং মায়াবাদ অবৈদিক নহে। উহাতে শ্রুতির  
অপার্থ নাই, ধারাবাহিক আচার্য্য পরম্পরার বিমল উপদেশ। উহা গুরু

অমুমোদিত । তবে কেন বলিব না, পদ্মপুরাণ প্রক্ষেপ দোষে দূষিত হইয়াছে । আবণ্ড দেখা যাইতেছে “মন্দির কথিতং দেবি ।” এই বাক্যাংশে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে,—মায়াবাদ প্রচারিত হইবার বহু পূর্বে এই বচন রচিত হইয়াছে, নচেৎ “কথিত” পদ থাকিত না । বলার সময়ের অনেক পূর্বে মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া উহা পরে ঈর্ষাময়ী লেখনী প্রসূত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । বাহ্য হউক, মায়াবাদ বৈদিক ইহা দেখান হইল । এখন আর একটি কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে ।

অনেকে বৈতবাদী মায়াবাদকে বৈদিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যেমন শাণ্ডিল্য সূত্রে অগ্নেয়রাদি সূতরাং মায়াবাদ বৈদিক । তাহাতে সন্দেহ নাই । অনেকে “মায়” এই কথাটি বাস সূত্রে নাট্য বলিয়া উগা বাসের অভিপ্রেত নহে বলিতে চাহেন, তাহাও সঙ্গত বোধ হয় না । কারণ ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “সর্কোপেতাচ উদর্শনাৎ ।” এই সূত্রে সর্কোপেতা মায় ভিন্ন আর কিছু নহে ।

“সর্কোপেতা মায় শক্তিমত্তো ব্রহ্মণঃ, ইত্যাদি টীকা । এই সূত্র ভিন্ন “প্রকৃতিশ্চ”—একটি সূত্র আছে । পূর্বে দেখান গিয়াছে, মায় ও প্রকৃতি একই কথা । মায়ার নামান্তর প্রকৃতি । সূতরাং কি দিয়া বলিব যে উগা বাসের অভিপ্রেত নহে, যখন প্রত্যক্ষ প্রকৃতিতে রহিয়াছে, তখন বাসের অনভিপ্রেত নহে, ইহা একরূপ নিশ্চয় ।

মায়াবাদ বৈদিক, সূতরাং শিষ্টাভিমোদিত । লোকে ঈর্ষা কব্যয়িত্ব-লোচনে বাহ্য দেখুন, তাহা কখনই প্রচারিত হয় না । সূতরাং গ্রাহ্য হয় না । এখন এই মায়াময় সংসারের ভিতরে ভিতরে বিচরণ করিয়া মায়ার লীলা বাহ্যে অতিক্রম করা যায়, তাহার অন্য সত্তা মহামায়ার নির্গল মধুময় চরণসরোজের ছায়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা মতিমান ব্যক্তি মাত্রেই কর্তব্য । বাহার যেমন শক্তি, বাহার যেমন জুটিয়া উঠে, তাহার যেমন ভাবেই আরাধনে মনোনিবেশ করা কর্তব্য ।

## “ অথ যজুর্বেদীয় কদ্রাধায়ঃ । ”\*

নমস্তে কৃত্র মন্তব উত্তোত ইষবে নমঃ ।

বাহুভ্যা যুত তে নমঃ ॥ ১ ॥

যাতে কৃত্র শিবা তনু রঘোরাহপাপকাশিনী ।

তয়া ন শুধা শতুমরা গিরিশঙ্ক্যভি চাকশীতি ॥ ২ ॥

সামিযুক্তি রিশন্তহন্তে বিভর্ষাস্তবে ।

শিবাস্মিরিত্র তাক্কুর মাতিংসীঃ পুরুষজগৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থ । হে কৃত্র ! তোমার ক্রোধকে নমস্কার । তোমার বাণকে নমস্কার । এবং তোমার বাহুবুগলকে নমস্কার ॥ ১ ॥

ভাবার্থ । যিনি পাপিগণকে, হুঃখ দিয়া ক্রন্দন করান,—ঈদৃশ পরাৎ-পর পরমেশ্বকে কৃত্র কহে । প্রাণিগণ যে পাপ ফলে, হুঃখ পায়, সে স্থলে কৃত্র, কর্তা, কর্ত্ত ও করণ এই ত্রিবিধ কারক হইয়া, প্রকাশ পাইয়া থাকেন ।

ক্রোধ কর্ত্তা, হুঃখ (বাণ) কর্ত্ত, এবং হুঃখ সাধন শারীর চেষ্টা-যুক্ত বাহুবুগল করণ । বাহুবুগল, ক্রোধজনিত কার্য্যের প্রধান সহায় । এইজন্য পাদাদিত্র উল্লেখ না করিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ হইয়াছে । বস্তুতঃ “দেখিও কাকে যেন দধি না ধার” এখানে, কাক শব্দ, কেবল কাককে না বুঝাইয়া, দধি ভক্ষক সকল প্রাণির বোধক, তজ্জপ এই বেদের বাহ শব্দ কেবল, হস্তেন্দ্রিয় না বুঝাইয়া, ক্রোধ জনিত যে হুঃখ বাণ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই হুঃখ-বাণের সাধন, সকল ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইবে । ফলিতার্থ, ক্রোধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হয় । ইন্দ্রিয় বিচলিত হইয়াই হুঃখকে আনয়ন করে । উপাসক, এস্থলে ক্রোধকে কৃত্রের অন্যতম স্বরূপ বলিয়া দেখিতে-ছেন, হুঃখকে কৃত্রদেবের অন্যতম অঙ্গ বাণ দেখিতেছেন এবং হুঃখ সাধন ইন্দ্রিয় সকলকেও কৃত্রদেবেরই বাহ বলিয়া ভাবনা করিতেছেন । বস্তুতঃ

\* এই প্রবন্ধটি আমরা যথাযথ প্রকাশ করিলাম । বেদের এরূপ রূপক বর্ণনা, সকল হিন্দু ভাল লাগিবে কি না, বলিতে পারি না । বেদের এই সমস্ত বিষয় বাতান্ত, ভালরূপ আলোচনা হয়, তজ্জন্যই আমরা এ প্রবন্ধটি যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই সন্নিবেশিত করিলাম । বে, সং ।



অমৃতত্ব করিয়া দেখ, সমস্তই সত্য ; বাক্যের সম্বন্ধে স্পষ্ট থাকিলেও অর্থেতে পূর্ণ সত্যতা বিরাজিত রহিয়াছে ।

সবলার্থ । হে কল্প ! তোমার শরীর মঙ্গলরূপ । তোমার শরীর সৌম্য দর্শন । তোমার শরীর পুণ্যকল প্রদাতৃ । হে গিরিশস্ত ! তুমি, তোমার ঈদৃশ মঙ্গলময় শরীর দ্বারা, আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ২ ॥

ভাবার্থ । কল্প শব্দ নানার্থ । যিনি হুঃখ বিনাশন অর্থাৎ শিব বা মঙ্গল রূপ, তাঁহাকেও কল্প কহে । এ মন্ত্রে যিনি মঙ্গলরূপিশিব, সেই কল্পদেবের নিকটে উপাসক প্রার্থনা করিতেছেন । যিনি শিব, তিনি কল্প ; সুতরাং সৌম্য-দর্শন । এই সৌম্যদর্শনের দর্শন, পুণ্যের প্রথম ফল ; দ্বিতীয় ফল চতুর্দর্শ প্রাপ্তি, সেটি এই সৌম্যদর্শন-শিব-দর্শনান্তর ভাবি । যিনি কৈলাসে অবস্থিত হইয়া, সর্বত্র প্রাণিগণের, সুখ বিস্তার করেন, তাঁহাকে “ গিরিশস্ত ” কহে । যেমন পুরীবাগ্নি(গ্যাস) তাহার আকরে(গ্যাস আকিবে) থাকিয়া নলের ভিতর দিয়া সর্বত্র নগরময় আলোক বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বরও গিরিতে ( কৈলাসে ) থাকিয়া প্রাণিগণের সুখ, নাড়ির ভিতর দিয়া, সর্বত্র শরীরময় সুখজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন ! অথবা, বাক্যে অবস্থিত হইয়া, যিনি সুখ বিস্তার করেন, তাঁহাকে গিরিশস্ত কহে । বাক্য বলিতে বেদ-বাক্য । বেদবাক্যে অর্থরূপে নিত্য অবস্থিত । অর্থস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য, তাঁহার অবস্থিতি বেদ-বাক্যে নিত্য সম্বন্ধে, সেই সম্বন্ধ বাচ্যবাচক ভাব । বাচ্য ঈশ্বর বাচক বেদ শব্দ । সম্বন্ধ নিত্য, যখন তখন সম্বন্ধিও নিত্য । এখানে সম্বন্ধি হুই, ঈশ্বর ও বেদ । ইহারা উভয়েই নিত্য । ঈশ্বর উপলক্ষণ মাত্র, ঈ অর্থ-শব্দে, ঈশ্বরের বিধি নিষেধও বুঝিবে । সুতরাং যিনি বেদ শব্দে অর্থরূপে অবস্থিত হইয়া, সেই নিজ স্বরূপ বেদার্থ দ্বারা, মামবগণের কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন, তিনি “ গিরিশস্ত । ” অথবা ‘ গিরি ’ বলিতে মেঘ ; যিনি মেঘের মধ্যে থাকিয়া, বৃষ্টি দ্বারা জগতের কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন, তিনি “ গিরিশস্ত ” অথবা যিনি গিরি নিবাসী অথচ সর্বত্র—সকল স্থানের সংবাদ অবগত হইয়া থাকেন, তিনি “ গিরিশস্ত ” । “ মঙ্গলময় শরীর দ্বারা, আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ” বেদের এই বাক্য, ঈশ্বর যে আমাদের ন্যায় ইঞ্জিরাত্মীন নহেন, তাহা প্রমাণ করিল । আমরা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিয়া থাকি, কিন্তু কল্প বা শিব দ্বারা জ্যোতিঃ স্বরূপ, তিনি তাঁহার শরীর দ্বারাই দর্শন করিবেন সন্দেহ কি ?

সরলার্থ। হে গিরিশস্ত! অস্ত করিবার জন্য তুমি চেষ্টে যে বাণ ধারণ করিয়াছ; হে গিরিত্র! সেই বাণ কল্যাণ-কর কর, পুরুষ হিংসা করিও না; জগৎ হিংসা করিও না ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। কল্পের হস্তে জগৎ অস্ত করিবার শস্ত্র আছে। মনে করিলে তিনি, সকল সময়েই অস্ত করিতে সমর্থ, তথাপি অকালে অস্ত করা তাঁহার স্বভাব নহে, যেহেতু তিনি “গিরিত্র” অর্থাৎ গিরিতে অবস্থিত হইয়া, তৃত্ত সকলের রক্ষা কার্য্যও তিনিই করিতেছেন। ব্রাহ্মণ যেমন একই মুখ দ্বারা, অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ উভয়ই প্রদান করেন, তজ্জ্ঞপ কল্পও একই বাণ দ্বারা, অস্তও করিতেছেন এবং রক্ষাও করিতেছেন। অভিশাপোমুখ ব্রাহ্মণ যেমন স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপের স্থানে আশীর্ব্বাদ দেন, তজ্জ্ঞপ কল্পও নাশ করিবার জন্য উদ্যত-বাণ হইয়াও স্তবে তুষ্ট হন এবং সেই কল্প-সন্তোষ-রূপ মানবের পুণ্য, নাশ-জনক হৃদয়ট লুপ্ত হইয়া যায়, তখন স্তুতরায় কল্পকেও “আন্তোভাব” হইতে হয়, তাঁহার অস্তকারি উদ্যতবাণও তখন শুভকারী হইয়া উঠে। “পুরুষ হিংসা করিও না” এখানে পুরুষ বলিতে কেবল প্রার্থনিতার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে বুঝাইবে। “জগৎ হিংসা করিও না” এখানে ‘জগৎ’ সাধারণকে বুঝাইতেছে। এই শেষ বাক্য, সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা যে, কর্তব্য ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি ।

যথা নমস্কারমিচ্ছগদয়ন্তঃ স্মৃনা অসৎ ॥ ৪ ॥

সরলার্থ। হে গিরিশ! স্তুতিরূপিমঙ্গলবাক্যদ্বারা, তোমাকে লাভ করিবার জন্য, আমরা প্রার্থনা করিতেছি; যথা,—আমাদের সকলকেই নর-পশাদি জগৎ মাত্রকেই এরূপ কর, বাহাতে নীরোগ ও স্বস্থচিত্ত হয় ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ। মঙ্গলবাক্য বেদ বাক্য। প্রদান উদ্দেশ্য বৈষ্ণবপুরুষের সন্দর্শন সেই সন্দর্শন, একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে, কখনই হইতে পারে না। সেই জন্য মঙ্গলবাক্য বা বেদবাক্য অবলম্বন করাই, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং বেদ বলিতেছেন যে, আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক, সে আদৌ আমার আদি বরূপ বেদ আশ্রয় করুক। আর যে বেদ আশ্রয় করিবে, সে, সাধারণের হিতকামী হউক।

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈবো। ভিষক্ ।

অহৌংশ সর্বাঙ্গস্তরনং সর্বাশ্ব বাতুধানোধ্যরাচাঃ পরাম্বব ॥ ৫ ॥

সরলার্থ । ক্রতু, আমাকে সর্বাধিক বলুন । ক্রতু, অভিযয় বক্তা এবং দেবগণের হিতকারী ও প্রথম শ্রেণীর এক জন অদ্বিতীয় ভিষক্ । হে ক্রতু ! তুমি সর্প ব্যাজাদি হিংস্রকগণকে, বিনাশ করিয়া, অধোদেশে গমনশীল রাক্ষসীগণকে, আমাদিগের নিকট হইতে, দূর করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ । ঈশ্বর বড় না করিলে, কেহ বড় হয় না । ঈশ্বর যদি বলেন, “তুমি বড়” তাহা হইলে তুমি সর্বাধিক্য লাভ করিতে পারিবে, অন্তথা নিজ পুরুষার্থে কখনই কেহ বড় হয় না । পুরুষার্থ-বিহীন নিরাকর, মহা-মূৰ্খ, অধচ বড়লোক এরূপ ব্যক্তি, লোকে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত ইহার উদাহরণ বুঝিবে । ক্রতুদেবের নামোচ্চারণে রোগনাশ হয়, এই জন্য ইনি ভিষক্ । বাস্তবিক কিছু থল লুড়ি লইয়া, ঔষধ প্রস্তুত করেন না । দেব শব্দ সত্বগুণের আধান্যদ্যোতক মাত্র ; সুতরাং দেব-ভাবাপন্ন সাধিক প্রকৃতি সর্ব জীবেরই, ক্রতু হিতকারী । সর্পাদি হিংস্রক জাতি সকল তমঃ প্রকৃতি । ইহাদের বিনাশ যত শীঘ্র হইবে, ততই ইহাদের উন্নতি হইবে, সেই জন্যই বেদে ইহাদের বিনাশ কামনা প্রকৃত হইয়াছে । যে সকল মারাবিনী পাপভারে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছে, তাহারা ই অধোগমনশীল রাক্ষসী । ইহাদের সঙ্গ অসৎ সঙ্গ, । এই অসৎসঙ্গ লোকে প্রারম্ভঃ অনিবার্য্য । তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইল ।

অগৌ বস্তাত্মো অকুণ উত বক্রঃ শুমঙ্গলঃ ।

যেচৈনঃ ক্রতু অভিভোদিস্কু

শ্রিতানুসংস্রশোবৈবাঃ হেড় ঈমহে ॥ ৬ ॥

সরলার্থ । যে এই প্রত্যক্ষ রবিরূপী ক্রতু, এবং যে সকল কিরণরূপী অসংখ্য ক্রতু, ইহাকে চারিদিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমাদের অপরাধ নিমিত্ত ইহাদের যে ক্রোধ হইয়াছে, আমরা এক্ষণে সেই ক্রোধ ভক্তি দ্বারা নিবারণ করিতেছি । এই প্রত্যক্ষ ক্রতু, উদয়ে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অন্তকালে অরূপ বর্ণ এবং তন্তিন্ন সময়ে পিঙ্গলবর্ণ । ইনি আমাদের সর্বথা মঙ্গল-রূপ ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ । সূর্য্য, রক্তের অন্ততম রূপ । এইরূপ, রক্তের প্রত্যক্ষ, সাধা-  
রণের উপাস্য স্বরূপ । এই অন্ত বিজ্ঞাতিগণের, ইনি আরাধ্য দেবতা ।  
ইহার কিরণ সকল, ইহার অংশ বিশেষ । এইজন্য কিরণ সকলকেও রক্ত  
বলা যায় । সাধারণে সুলচক্ষু দ্বারা, সূর্য্যকে অঙ্গ পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন,  
কিন্তু “যোসাবাদিতো মোহমস্মীতি” ঋতি দ্বারা সূর্য্যোহিত জাস্বাই পর-  
মাত্মা, সেই পরমাত্মা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহেন, তবে যে পরিধি নিরমিত  
হইয়াছে, সে কেবল পৃথিবীর পরিধি দ্বারা ঔপাধিক । যেমন আকাশের  
পরিধি নাই, তথাপি পৃথিবী সম্বন্ধে থাকিয়া, পরিধি কল্পিত হয় । উপরে  
আকাশের দিগে দৃষ্টি কর, দেখিবে—আকাশ যেন একখানি সরাব ন্যায়  
ঢাকা রহিয়াছে । বাস্তবিক কি আকাশ সরাব ন্যায় ? তবেত পরিধি আছে ?  
না, ইহা প্রকৃত নহে । ইহা পৃথিবীর সম্পর্কজাত ভ্রম-ঔপাধিক । সেইরূপ  
সূর্য্য-জাস্বা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ভিন্ন নহেন, সূর্য্যমণ্ডলেরও পরিধি নাই ।  
আকাশবৎ অনন্ত অসংখ্য কিরণ সমূহই সূর্য্য মণ্ডল এবং সেই সূর্য্য  
মণ্ডল ও পরমাত্মা, বা তৎশক্তি—বা রক্ত একই বস্তু ; এবং কিরণও এক  
অভিন্ন । কালপদার্থবৎ কল্পিত ভেদ বিশিষ্ট, ইনি আমাদের গায়ত্রী শক্তি ।  
ইনি আমাদের নারায়ণ । ইহারই উপাসনা করিয়া আমরা, সর্ব রোগ, শোক  
হইতে মুক্ত হইয়া থাকি । এই প্রত্যক্ষ রক্ত আমাদের শুভাশুভ কর্মের  
সাক্ষী । অপরাধ করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন । এ কোথ আমাদের  
ন্যায় নহে । তবে, দণ্ড ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে হইলে, দণ্ডদাতার জন্মের  
যে দণ্ড দিবার ইচ্ছা, এখানে সেই ইচ্ছামাত্র বৃদ্ধিতে হইবে । এই ইচ্ছা,  
অপরাধের জ্ঞান হইয়া থাকে । ভক্তি দ্বারা অপরাধের শাস্তি করিলে, সে  
ইচ্ছারও শাস্তি আছে ॥ সূর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে, পরে  
ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে ।

অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উটেনং গোপা অদৃশন্নদৃশন্ন দহাৰ্য্যঃ সদৃষ্টো যুড়য়াতিনঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থ । যে এই আদিত্যরূপী রক্ত, নিরন্তর উদয়াস্ত করিয়া  
বেড়াইতেছেন, ইনি নীলগ্রীব, ইনি বিলোহিত । ইহাকে গোপেরাও  
দেখিতেছে । ইহাকে উদকহারিনী অঙ্গনারাও দেখিতেছে । ইনি দৃষ্ট  
হইয়া আমাদের সকলকে সুখী করুন ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ। এই মণ্ডলবর্তী কৃত্রই পরমাত্মা । ইনিই স্বীয় কিরণ দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি ও লয় করিতেছেন । এইরূপ আলোচনা করিলে, ইনি দৃষ্ট হইয়া এইরূপে ইনি বধন দৃষ্ট হন, তখন আমরা স্থম্বী হই । এই কৃত্রই উদয় হইয়া, ভীষ্মকিরণ বিস্তার এবং অন্তঃকারী সাক্ষকিরণ বিস্তার করিয়া, জগৎ রক্ষা করিতেছেন । চল্লম্বা হইতে যে কিরণ আঠসে, উহা সূর্য্যের সাক্ষ কিরণ । “অজ্রাহ গৌরমহত” এই মন্ত্রে এ বিষয় স্পষ্ট আছে । বিষধারণ করিয়া ইনি, নীলশ্রীব হইয়াছেন । পৃথিবীর অর্ধাৎ কি জল, কি স্থল, সর্ব্ব-স্থানেই জীবন হানি কর, বিব বা বাষ্প আছে এবং প্রত্যাহ হইতেছে, সে সমস্ত এই সূর্য্য বা কৃত্রদেব, আপন কিরণ দ্বারা, আকর্ষণ করিতেছেন, সূতরাং নীলশ্রীব বা নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হইলেন । এবং এই সূর্য্য-রূপী কৃত্রই, পৃথিবী, চল্ল, ও নক্ষত্র সকলের রঞ্জন-কারী, সূতরাং ইহাকে “বিলোহিত” বলা যায়, বাহারা জ্ঞানী, দর্শন-চক্ষুঃ, তাঁহারা ইহাকে নীলশ্রীব বা নীলকণ্ঠ দেখিতে পান, কিন্তু ইহাঁর বিলোহিত ভাব, সাধারণেই দেখিতে পাইতেছে । এমন কি, বাহারা অতি সূর্য্য, চাঁদা-গোয়ালী এবং কক্ষ-বৃত্তা কৃত্তা জলানয়নকারিণী সামান্ত অজনাগণও ইহাঁর বিলোহিত মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে । অতএব এই কৃত্রদেবের রূপ সকলেই দেখিতেছে । এই কৃত্রই সকলে আনন্দিত হইতেছে । আনন্দ ইহাঁর দর্শন বিনা হয় না । যিনিই সম্বীৰ, তিনিই সানন্দ এবং যিনিই সানন্দ, তিনিই ইহাঁর যে কোনরূপ হউক না কেন দেখিতেছেন বা দেখিয়াছেন । ধূমের সহিত বহির যেমন আধনাভাব সম্বন্ধ, তজ্জগৎ আনন্দের সহিত কৃত্র দর্শনেরও আধনাভাব সম্বন্ধ । সুখ বিকাশাদি যেমন আনন্দের চিহ্ন, চৈতন্ত্যের অব-স্থিতি যেমন আনন্দের চিহ্ন, তজ্জগৎ আনন্দও কৃত্র দর্শনের চিহ্ন এবং আত্মো-ন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতিও কৃত্র দর্শনের চিহ্ন বুঝিতে হইবে ।

নমোহস্ত নীলশ্রীবায় সহস্রাকার মীচুবে ।

অথো যে অন্য সত্ত্বনোহহং তেভ্যোহকরং নমঃ । ৮ ।

সরলার্থ । অনন্তচক্ষুঃ, সেক্তা, নীলশ্রীবকে নমস্কার করি । এবং যেসকল প্রাণিরা ইহাঁর কৃত্ত্য আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি । ৮ ॥

ভাবার্থ । অনন্তচক্ষুঃ বা সত্ত্বাক ইজের পর্য্যায় শব্দ । কৃত্র ইজরূপী । ইহাকে দেবাদিদেব মহাদেব ইজ বলিয়া ব্যবহার করিতে পার । পর্জন্য

সেজ্ঞা, বা বরুণদেব একই পৰ্য্যায়। ক্রতু আমাদের সেজ্ঞা। অতএব  
ইহাকে পৰ্জ্জন্তাদি শব্দেও ব্যবহার করিতে পার। সুতরাং এই ইন্দ্র, সূৰ্য্য,  
বা ক্রতুদেবের অসুগত ভূতাপণ এখানে তাঁহার উপাসক ভক্তগণ। কেহ  
কেহ “মেঘ, ব্রহ্ম প্রভৃতি বাদশ্ব রাশিকে কহেন। ক্রতু, আমাদের স্তার  
চক্ষুর্নিশিষ্ট না হইলেও জড়পদার্থ নহেন, কিন্তু তাঁহার অনন্তদৃষ্টি,—এই  
জন্তই তিনি ‘বহুশ্রাব ইন্দ্র’ নামে অভিহিত। যদি এরূপ, তবে জড়পদার্থ-  
ব্যং একরূপ নিষমিত তাপই প্রদান করেন কেন? না, সে কথাও বলিতে  
পার না, কেন না ইনি যেমন তাপপ্রদ সেইরূপ আবার জলপ্রদ, অতএব  
ইহাকে সেজ্ঞা বা পৰ্জ্জন্ত্য বা বরুণদেব বলিয়া জানিবে।

## জন্মান্তর । \*

চলিত মানবদেহ লাভ করিয়া, ধর্মের উপাসনা ও অধর্মের পরিহার করাই  
সর্বতোভাবে কর্তব্য। যদিও নিরবশেষে ধর্মোপাসনা ও অধর্ম পরিহার  
করা সংসারীর পক্ষে একান্ত দুর্ঘট, তথাপি সহদূর পারা যায়, তৎপক্ষে যত্ন  
করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্মই আমাদের পরম মিত্র ও অধর্মই আমা-  
দিগের পরম শত্রু।

ধর্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধার্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পতি ।

ধর্মেন পাপমপমুদন্তি ধর্মেন সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তন্মাকর্মং পরমং বদন্তি ॥

তৈত্তিরীয়ব্রহ্মসূত্র ১১

ধর্ম সমস্ত জগতের গৌরবস্বরূপ, ধর্মিষ্ঠ লোকের নিকটেই প্রজাগণ  
উপগত হয়। ধর্ম দ্বারা পাপের অপনোদন হয়। ধর্মবলে সমস্ত বস্তুই  
প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ধর্মই পরম পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।  
ধর্মের পরিণাম ইষ্টনিত্তি ও অধর্মের পরিণাম অনিষ্ট প্রাপ্তি।

\* পূর্বস্থলীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জীবন্ত কৃষ্ণনাথ স্মারকানন্দ মহাশয়ের  
প্রবন্ধ সাগরে-যথাযথ প্রকাশ করিলাম। বে, স, ১।

ধর্মাবিবর্ত্তে চ্যাব্বাজাং পুত্রস্থখাদিচ ।

অধর্মাব্যাধি শোকাদি উত্যাগি ॥

দেবীপুরাণ ॥

ধর্মহেতুক আয়ুর্বাধি হয় । এবং রাজ্য, পুত্র ও সুখাদি উৎপত্তি হয় ।  
অধর্মহেতুক ব্যাধি শোকাদি হইয়া থাকে ।

আমরা জ্ঞাত্তরে, যে সকল ধর্মার্থের অনেক ধর্ম করিয়াছি, তাহারাই  
ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলরূপে পরিণত হয় । বর্ত্তমান সময়ে যে কিছু ধর্মার্থের অর্জন  
করি, তাহার ফল জ্ঞাত্তরে উৎপন্ন হয় ।

মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন যথা—

ধর্মশনৈঃ সন্ধিস্থায়াদলীকমিব স্মৃতিকাঃ ।

পরলোক সাহায্যার্থং সর্কভূতান্যপীড়য়ন্ ॥

নামুজ্জ্বলসহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতি ।

ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতিধর্মস্থিতি কেবলঃ ॥

একঃ প্রজারতে অন্তরেক এব প্রজীরতে ।

একোহমুভুক্তো নুতমেক এবচ হৃদয়ম্ ॥

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাঠলোষ্ট্রে সমঃ কিতৌ ।

বিমুখাবাদ্বাবাতি ধর্মন্তমনুগচ্ছতি ॥

তদ্বাদ্ব্যর্থঃ সহায়ার্থং নিত্যং সন্ধিস্থায়াদলীকমিব ॥

ধর্মেণ হি সহ্যেন তমন্তরতি হৃদয়ম্ ॥

ধর্মপ্রধানঃ পুরুষঃ তপস্য জ্ঞতকল্মষম্ ।

পরলোকং নরত্যাগ ভাবন্তঃ স্বশরীরিণম্ ॥

যেমন উই নামে এসিদ্ধ পিপীলিকাগণ, অঙ্গে অঙ্গে বন্দীক অর্থাৎ শরীর  
ভাগস্থান রূপ স্মৃতিকাকূট সঞ্চর করে, সেইরূপ পরলোকের সাহায্যার্থ, অঙ্গে  
অঙ্গে ধর্ম সঞ্চর করা কর্ত্তব্য । কিন্তু তাহাতে পরপীড়া না হইতে পারে ।  
যে হেতু, পারলৌকিক সাহায্যের নিমিত্ত পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র বা  
জ্ঞাতিবর্গ কেহই বিদ্যমান থাকেন না, কেবল ধর্মই সহায়রূপ হইয়া বর্ত্ত-  
মান থাকেন । জীবগণ একাকী অন্তঃপ্রবণ করে । একাকীই পরলোক  
যায় । এবং পাপ পুণ্যের ভোগও একাকী করে, তাহাতে বন্ধুগণ, কেহই  
সহকারী থাকেন না । অর্থাৎ বন্ধুগণের অনুরোধেও ধর্ম পরিত্যাগ করিতে

নাই । বন্ধুগণ মৃতদেহটী, কাষ্ঠখণ্ড বা মৃতখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরাধুখ হইয়া প্রতিগমন করে, কেবল ধর্ম্মই মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে যায় । সেই হেতু পারলৌকিক সাহায্যের নিমিত্ত নিত্যই অন্ন অন্ন ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্তব্য । যে হেতু সগামুভূত ধর্ম্ম দ্বারা দুষ্টের নরকাদি দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । প্রারম্ভিত দ্বারা অপনীতপাপ অথচ ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে, ধর্ম্মই দীপ্তিমান ও ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া, পরলোকে প্রাপণ করিয়া পাকে ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কেবল, জন্মান্তরেই ফলপ্রসব করে এমন নহে । অবলম্বন হইলে, বর্ত্তমান জন্মেই ফলোৎপাদন করিতে পারে ।

ত্রিভিকর্ষৈব স্ত্রিভির্গাঈ স্ত্রিভিঃ পঠৈক স্ত্রিভির্দীনৈঃ ।

অত্য়ৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিষ্টৈব ফলমশ্নুতে ॥

অবলম্বন পাপপুণ্যের ফল, তিন বর্ষ, তিন মাগ, তিন পক্ষ বা তিন দিনেই হউক ইহজন্মেই ভোগ করে ।

অধর্ম্ম স্থলে মনু ও লিখিয়াছেন—

ইহ দৃশ্যরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা ।

প্রাপ্তু বস্তি দ্রাস্ত্রানো নরা রূপনিপর্য্যায়ম্ ॥

“কোন কোন দ্রাস্ত্রা ঐহিক দৃশ্যমানুসারে, কেহ কেহ জন্মান্তরীণ দৃশ্যমানুসারে, বর্ত্তমান জন্মে অন্ধত্ব, বধিরত্বাদিরূপ রূপবৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।”

অতএব আমরা সংসার দশায়, যে কিছু সুখানুভব করি, প্রায় সেসমস্তই জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফল । যে সকল দুঃখানুভব করি, তাহাও জন্মান্তরীণ দৃশ্যের ফল ।

পুরাকৃতানি পাপানি ফলভ্যাম্মিৎ স্তপোধনাঃ ।

রোগদৌর্গত্যরূপেণ তথৈবেষ্টবধেনচ ॥

মৎস্যপুরাণ ॥

“হে তপোধন গণ ! পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপ সমুদায়, হইজন্মে রোগ, দারিদ্র্য ও ইষ্টবিরোগরূপে পরিণত হয় ।”

যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন, তাঁহারা এই আমাদের এই সকল বাক্যের লক্ষ্য । যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, জন্মান্তরের সত্য



প্রমাণ না করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট এ সকল কথা প্রস্তাব করা নিতান্ত উপহাসাত্মক হইবে সংশয় নাই । অতএব জন্মান্তর স্বীকার সম্বন্ধে, যে সকল প্রমাণ গ্রহণকারেরা উপভুক্ত করিয়াছেন, তাঁহা এখানে প্রদর্শন করা আবশ্যিক । জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই । কেবল শব্দ অর্থাৎ প্রত্যয়িত বাক্য ও অনুমান, এই উভয়বিধ প্রমাণই প্রমাণরূপে আদৃত ও বলবৎ হইতে পারে । অর্থাৎ প্রমাণে এ বিষয়ে ঐ সকল আগুবাক্য এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, কোন না কোন একখানি গ্রন্থের যে কোন স্থান উদ্ধৃতি করিলেই, তাদৃশ প্রমাণ উপলব্ধ হইতে পারে । শব্দ প্রমাণের একরূপ সৌলভ্যসম্বন্ধে যে সকল লোক জন্মান্তরের পক্ষে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই ঐ সকল বাক্যগুলিকে আগু অর্থাৎ প্রত্যয়িত বলিয়া গণ্য করেন না । একারণ বেদাদিবাক্যরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করা অনুপযোগী বিবেচনার, অনুমান অর্থাৎ যুক্তিরূপ প্রমাণই এ স্থলে প্রদর্শনীয় । অতএব কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

১ম । মৃতদেহটী যখন ক্রমে ক্রমে ক্ষিত্যাদিক্রমেই পরিণত হয় দেখিতেছি, তখন অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, আমরা দিগের দেহটী অড়মর ভূতসমষ্টিমাত্র । যদি ক্ষিত্যাদি ভূতনিচয়ের চৈতন্য থাকিত তাহা হইলে, তদ্বারা বিনির্মিত দেহের ও চৈতন্যরূপ ধর্মটী স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারিত । কিন্তু অড়মর ক্ষিত্যাতির তাদৃশ ধর্ম কখনই অনুভূত হয় না, সুতরাং ঐ ক্ষিত্যাদি বাহার উপাদান তাহার চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা কি । অতএব ইহাই স্বীকার্য, যেমন জলের উষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ নহে, কোন একটি উষ্ণ উষ্ণতার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকায়, উষ্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ঐ উষ্ণতার অপগম হইলেই পূর্ববৎ স্নগীত্ব হইয়া যায় । তদ্বৎ এই ভৌতিক দেহের অভ্যন্তরেও কোন একটি চৈতন্যময় পদার্থ অবস্থিত থাকায়, দেহকে চেতন বলিয়া মানিতেছি, ঐ চেতন্যের বিনির্গম হইলেই দেহটী পূর্ববৎ অড়মর হইয়া থাকে । ঐ চেতন্যটীই আত্মা ।

এরূপে যদি দেহাতিরিক্ত আত্মনাশক একটি পদার্থ দেহে থাকিল, ও মৃত্যুকালে ঐ আত্মার দেহ হইতে বিনির্গমও অঙ্গীকার করিতে হইল, তবে ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে, যে দেহের উৎপত্তি কালে আত্মনাশক একটি পদার্থের উৎপাদ্যমান স্কলদেহে আবির্ভাব হয় । ঐ স্কলদেহে আবির্ভাবকেই

ভাষার অর্থ বলে ও ঐ স্থলদেহে আবির্ভাবের পূর্বে তাহার যে স্থানে আবির্ভাব ছিল, তাহাকেই অন্ত্যাত্ম বলে ।

এস্থলে এরূপও বলিতে পারেন যে “আত্মা একটি পৃথক পদার্থ বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে সে কোন স্থানেই যায় না, উহার একেবারে বিনাশ হইয়া যায় । এবং অন্যকালেও সে কোন স্থান হইতে আসে না, প্রত্যেক দেহোৎপত্তি কালে তাহার উৎপত্তি হয় ।”

আত্মার উৎপত্তি মানিলে, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ঐ আত্মার উপাদান কারণ কি ? অচেতন জড়পদার্থ, না, চৈতন্যময় পদার্থ ? অচেতন পদার্থে চৈতন্যের উপাদান হইতে পারে না, সুতরাং চৈতন্যময় পদার্থই তাহার উপাদান বলিতে হইবে । তাহা হইলে চৈতন্যময় বস্তুদ্বারা চৈতন্যময় আত্মার, সৃষ্টি মানিতে, আত্মার উৎপত্তির পূর্বেও চৈতন্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হইল, ও উপাদানভূত চৈতন্যময় পদার্থ এবং কার্যভূত চৈতন্য পদার্থের কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায়, উৎপত্তির পূর্বেও চৈতন্যময় আত্মা পদার্থ ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল । তবে তাহার আত্ম উৎপত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ।

যদি কহেন “চৈতন্য পদার্থ পূর্বেও ছিল বটে, কিন্তু সে পদার্থ আকাশের ন্যায় দেহ সম্বন্ধ শূন্য ছিল । দেহের উৎপত্তিকালে ঐ দেহে তাহারই সম্বন্ধ হয়, দেহ বিনাশকালে ঐ আত্মার আকাশবৎ পৃথক্ ভাব হয় । লোকান্তরেও যায় না, উৎপত্তিকালে কোন লোকান্তর হইতে আগত হইয়াও দেহবদ্ধ হয় না ।”

এরূপ বাদীকে এই প্রশ্ন করা যায় যে, তাদৃশ আত্মার দেহসম্বন্ধ হওয়ার প্রতি কারণ কি । দেহসম্বন্ধ আপনা আপনি হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করা যায় না । তাহা হইলে অন্ত্যাত্ম জড়পদার্থের উৎপত্তিকালেও চৈতন্যের সম্বন্ধ হইত ও জীবদেহের কোন কোনটাতে চৈতন্যের লক্ষণ হইত না । যখন অন্যান্য জড়পদার্থ কোনটাতেই চৈতন্যের সত্তা দেখি না, জীবদেহেই অব্যতিচারি রূপে দেখিয়া থাকি, তখন তাদৃশ সম্বন্ধের নিরস্তা কেহ আছে অবশ্যই বলিতে হইবে । যদি তদর্থ সর্ব নিরস্তা একজন ঈশ্বর মানিয়া, আত্মার দেহ সম্বন্ধ তদধীন বলিয়া, অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মমুগারেই ঈশ্বর, জীবের দেহসম্বন্ধ ঘটনা করেন । দেহসম্বন্ধ কেবল ঈশ্বরধীন নহে, ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে । নচেৎ

ঈহাকে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাঁহার সদোকৃত্য প্রতিপাদন করা হয় । যেহেতু তিনি কতকগুলি আত্মাকে অভ্যন্ত হৃৎখম্ম দেবাবিশ্বীরের সহিত এবং কোন কোন আত্মাকে অভ্যন্ত হৃৎখম্ম পঞ্চাদি দেহের সহিত সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, এমনটা তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা দোষ সম্ভাবিত হয় । এবং হৃৎখম্ম বিধান করায়, তিনি নিশ্চয় অর্থাৎ সর্বলোকের স্বণাম্পদ বা অতি নির্দয় হইয়া উঠিলেন । কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টি মানিলে, তাদৃশ দোষস্পর্শ হইতে পারে না । যেমন য়েষ, ব্রীহিষবাদি সমস্ত পাদপের উৎপত্তির প্রতি জলদান দ্বারা সাধারণ কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রীহিষবাদি পাদপের অবয়ব ভেদ সম্পাদন করে না । তত্ববীজগত অসাধারণ এক একটা বস্তুই, অবয়বভেদের উৎপাদন করিয়া থাকে । তৎ ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে সাধারণ কারণ । অথ হৃৎখম্মভোগী দেহভেদের পক্ষে উদাসীন হইয়া থাকেন । তাদৃশ দেহভেদের অসাধারণ কারণ জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মগুলিই তাদৃশ দেহভেদের সম্পাদক । এক্ষেপে ঈশ্বর কখনই অপরাধী হইতে পারেন না ।

এক্ষেপে দেখুন কর্ম্মানুসারে দেহ সমৃদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিলেই অন্যান্য স্বীকার করা হইল কি না । অন্যান্যের না থাকিলে, উৎপত্তিকালে জীব কর্ম্ম কোথায় পায় । অবশ্যই অন্যান্যের আছে । তৎকালীন কর্ম্মানুসারেই দেহসমৃদ্ধ বলিতে হইল । এই নিমিত্ত মধ্যমি বাদরায়ণ ব্রহ্মসীমাংসা গ্রন্থে সৃষ্টির কর্ম্ম সাপেক্ষতা স্বীকার করতঃ ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈশ্চরণ্যদোষের পরিহার করিয়াছেন যথা—

বৈষম্যনৈশ্চরণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ।

অথ হৃৎখম্ম নানাবোনি সৃষ্টি করায় এবং হৃৎখম্ম বিধান করায়, ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা নৈশ্চরণ্য অর্থাৎ সর্বলোক স্বণাম্পদতা বা নির্দয়তা হউক ? না, তাহা হইতে পারে না । যে হেতু, সৃষ্টি কর্ম্মানুসারিণী । শাস্ত্রে ও সৃষ্টির কর্ম্ম সাপেক্ষতা দেখাইয়াছেন ।

২য় । আরও দেখুন, মনুষ্যবালক গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, বাবৎ স্তমাপান করিতে না পার, তাবৎকাল মুখব্যাধন করিতে থাকে । এই মুখব্যাধনটী তাহার আহারের অভিনায় ব্যঞ্জক । ইহাতে অবশ্যই অনুমিত হইবে যে, ঐ বালকের ক্ষুধার কষ্ট হইতেছে, তন্নিবন্ধনই আহারের চেষ্টা করিতেছে । বলুন দেখি, ক্ষুধা অন্য হৃৎখম্ম যে, আহার করিলেই শান্ত

হয়, ইহা কে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে। স্তনটী তাহার মুখে ধরিলে যে, চোষণদ্বারা দুগ্ধের আকর্ষণ করে, তাহাই বা কে জানাইল। কাহাকেও জানাইতে হয় না। কেবল অন্যান্তরীণ সংস্কার বশতঃ তাদৃশ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

৩য়। উত্তানশয় বালকের নিকটে একটা গুরুতর শব্দ হইলে, বালক আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কেন উঠে, আমার প্রতি গুরুতর আঘাত হইল ভাবিয়াই ভয়ে আতঙ্কিত হয়। আঘাত হইলে, মরিব বা একান্ত কষ্ট পাইব, ইহা না বুঝিলে, কখনই ভয়ের সঞ্চার হয় না। যে যাহাতে কখনই কষ্ট পায় নাই বা অস্বস্তি লোকের তাদৃশ ব্যাপারে কষ্ট পাওয়া কখনই অসম্ভব করে নাই, সে তাহাতে ভীত হয় কেন? কেবল অন্যান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাদৃশ ভয় পাইয়া থাকে বলিতে হইবে।

৪র্থ। পশুজাতি সর্প দেখিলেই ভীত হইয়া থাকে। সর্প দংশনে মৃত্যু হয়, ইহা তাহাদিগের ঐহিক জ্ঞানগোচর কখনই হয় নাই। কিন্তু দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া পলায়ন করে। কেন করে? কেবল অন্যান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাদৃশ ভয় উপস্থিত হয় বলিতে হইবে।

৫ম। বানরশিশু মাতৃগর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই, হস্ত দ্বারা একটা শাখা অবলম্বন করে, শাখা অবলম্বন না করিলে, শূন্তের ধারণা শক্তি না থাকায়, কখনই থাকিতে পারিব না অবশ্যই পতিত হইব, তৎকালে তাহার ঈদৃশ জ্ঞান না হইলে, শাখা অবলম্বন করে না। তাহার তাদৃশ জ্ঞান কিরূপে হয়? সে কখনই বানরীর প্রসব দেখে নাই, আগনিও আর কখন প্রসৃত হয় নাই, তবে তাহার শূন্তের ধারণা শক্তি নাই এ জ্ঞান কেন হইল? কেনই বা সে শাখাবলম্বন করিল। কেবল অন্যান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাহার তাদৃশ জ্ঞানোদয়ও তাদৃশ প্রবৃত্তি হয় বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। একটা বৃক্ষের নিকটে যদি আর একটা বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে শেষ বৃক্ষটী পূর্বতন বৃক্ষের পরিসর পরিত্যাগ করিয়া, বীর শাখা বিস্তার করতঃ হেলিয়া উঠিবে। যদিও অপর বৃক্ষের লঘু লঘু পল্লব ঐ বৃক্ষের অন্ত স্পর্শ করে বটে, তথাপি তাহার এমন ঠেং লাগে না যে ঐ ঠেংের বলে হেলিয়া উঠে। তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে হইবে যে, বৃক্ষবোনি প্রাপ্ত জীব, সমভাবে উঠিবার প্রতিবন্ধক আছে অনুভব করিয়াই, বীর কলেবরকে বক্র করিয়াছে। প্রতিবন্ধক থাকিলে যে শিরঃসঙ্কোচ করিতে হয়, এ অনুভব

তাহার কিরণে হইল। কেবল অনাস্তরীয় সংস্কার বশতঃই তাহার তাদৃশ জ্ঞান ও প্রভৃতি হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

অতএব ভগবান্‌ মনু বলিতেছেন। বথা—

অপুংগাঃ কলবস্তোযে তে বনস্পত্যঃ স্মৃতাঃ ।

পুংপিণঃ কলিনশ্চৈব বৃক্ষান্তৃতরতঃ স্মৃতাঃ ॥

ওক্ষুঃশস্যং বিবিধঃ তথৈব তৃণ জাতরতঃ ।

বীজকাণ্ডকৃহাণ্যেব প্রতানা বন্য এবচ ॥

তমসা বহুরুপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা ।

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে স্তৃংহুঃখ সমন্বিতাঃ ॥

বনস্পতি নামক কতকগুলি বৃক্ষ পুষ্প রহিত হইয়াও কলবান্‌। কতকগুলি বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল উভয় বিশিষ্ট, এইরূপে বৃক্ষ উভয়রূপ। মল্লিকাদি ও শর ইক্ষু প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ওক্ষু ও শস্য এবং বিবিধ প্রকার তৃণজাতি ও অলাবুলতা প্রভৃতি, প্রতান ও ওড়ুচী প্রভৃতি বন্য, ইহারা সকলেই বীজ হইতে জন্মে, কেহ কেহ শাখা হইতেও জন্মে। পূর্বোক্ত পাদপগণ অধর্ম্ম কর্মজন্ত বিচিত্র হুঃখকলক তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তঃসংজ্ঞা অর্থাৎ বাহ্য-চৈতন্ত্য ক্রিয়াহীন অথচ স্তৃংহুঃখ সমন্বিত হইয়া থাকে।

বধন উদাহৃত হলে, অনাস্তরগত সংস্কার স্পষ্টরূপে অস্বপিত হইতেছে, তখন অনাস্তর মানিতে বিশ্বাস হওয়া কখনই উচিত হয় না।

এহলে এক আপত্তি হইতে পারে।

যদি অনাস্তর সংস্কার বলেই পূর্বলিখিত হলে তাদৃশ জ্ঞান হয়, তবে অনাস্তরের অনাস্ত্র সংস্কার গুলির বলেও অনাস্ত্র জ্ঞান হউক না কেন শিকার প্রয়োজন কি ?

একথা বলিতে পারেন। তাহার প্রতিবচনও আছে। অনাস্ত্রের সমস্ত সংস্কারই থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল সংস্কার নানা অনেন্দ্র কলোপধান করিতে না পারায়, সুদূরপে অবস্থিত থাকে। জীবের স্থল শরীরান্তর পরিগ্রহ হওয়াতে ঐ সকল সংস্কারের কলোপধান, শিকার ব্যতীত হয় না। আহার, ভয়, সৈধুন প্রভৃতির সংস্কার, বাহ্য প্রায় প্রতি অনেন্দ্রই কলোপধান করিয়া থাকে, তাহাই দৃঢ়তর রূপে অবস্থিত, স্মরণ্য তাহারই ফল, বিনা শিকার ব্যটিয়া থাকে। সে সকল বিষয়ে কাহারও নিকট শিকালাভ করিতে হয় না। এই মিস্ত্রিই সকল সংস্কারের কার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়া দেখা যায় না।

অমুন্য হিরীকৃত হইল যে, আমরা বর্তমান অন্তো যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা প্রায় অন্যান্তরীণ সদস্য কর্ত্ত্বেরই পরিণাম, ও বর্তমান অন্তো, যে সমস্ত সদস্য কর্ত্ত্ব করিতেছি ঐ সকল কর্ত্ত্বই ভাবিঅন্তোর সুখ দুঃখ প্রাপ্তির নিদান । অতএব আমরা পদে পদে দুঃখাহুতবকালে যেমন অন্যান্তর কর্ত্ত্বদোষের অনুভূপ করিতেছি, ভাবিঅন্তো, যেন বর্তমান অন্তোর কর্ত্ত্বগুলির সমস্ত তাদৃশ অনুভূপ করিতে না হয়, এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া একান্ত উচিত । কর্ত্ত্বের প্রতি সতর্ক হইলেই, আমরা কখন দুঃখের বার্তা জানিতে পারিব না ।

অতএব মহাকবি শান্তিশতককার লিখিয়াছেন ।—

নমস্যামোদেবান্নহু হতবিধেষুপি বশণা  
বিধির্কল্যঃ সোপি প্রতিনিরতকর্মে কলমঃ ।  
কলং কর্মারম্ভং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা  
নমস্তৎকর্মেভ্যোবিধিরপি ন যেভঃ প্রভবতি ॥

## আমাদের ।

“ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি পালটি  
লুটি নিল যা ছিল সারও ।

সকলিত গিয়াছে, রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, বিদ্যা গিয়াছে, গৌরব গিয়াছে, ধর্ম গিয়াছে, বিশ্বসংহারক কালের করাল আসে সকলিত গিয়াছে । শুধু কেন আমাদের কথা মনে হয়, কেন তবে কাঁদাল হইরাও ছিন্ন কহাকে নিছের বলিয়া টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে ? চোখের উপরেইত দেখিতেছি—বিধর্ষা বিদেহী লাভ লব্ধ তের নদী পার হইরা এখানে আসিয়া, আমাদের ঘরের জিনীষ, সুখের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে, কথাটি কহিবার শক্তি নাই ;

দেখিতেছিলাম আমাদের কত আদরের সামগ্রী, কত বতনের ধন, মাথার মণি ধর্মকে লইয়া ছোট, বড়, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই বুঝুক বা নাই বুঝুক টানাটানি করিতেছে, কতই অপমান করিতেছে; মুখের উপর আমাদের অস্পৃশ্য যবনেও আমাদের পূজ্যপাদ আর্ধ্য ব্যক্তিগণকে কত অকথ্য বলিতেছে, কেহ কুবক, কেহ গোয়ার, আবার কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতাই উড়াইতে চায়—এবস্থি কত লোকে কত কথা বলিতেছে! কৈ কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারি না? চোর হইলাম, বঞ্চক হইলাম, জালিয়াং হইলাম, মিথ্যাবাদী হইলাম, পৌত্তলিক হইলাম, অধার্মিক পাবও নরকের কীট হইলাম, ইংরাজ বাহা মনে আদিল তাহাই বলিল; কিন্তু এত লাজনার মধ্যে, এত বিড়ম্বনার মধ্যে, সর্ব্বস্বহীন কালালের ঘোর নরক বজ্রনার মাঝেও “আমাদের” কথাটি মনে হইলে কি-জান্নি-কেন প্রাণের ভিতরে একটু স্মৃতির লহরী বহিয়া যায়, এবিবাদও নৈরাশ্রের অন্তর্যামসে একটু কেমন হাঁসির বিজলি ছুটিয়া যায়, বুকেটা কেমন যেন আমোদে ও ভরসার ফুলিয়া উঠে, ভিখারীর ভগ্ন কুটীরে থাকিয়াও রাজ্যস্থ অমুভব করি।

হৃদীর স্মৃতি, পূর্বস্মৃতিই একমাত্র অবলম্বন। আমাদের কিছুই নাই তবে এখন তাহাই আছে, বাহা ছিল বলিয়া আমরা এখনও আছি, এখনও কথাবার্তা কহিতেছি, এখনও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছি। বাহা ছিল তাহার স্মৃতি, বাহা ছিল তাহা যে আমাদের ছিল এই জ্ঞান। এই স্মৃতি, এই জ্ঞান, এবং তজ্জনিত একটু যে স্পর্কার ভাব আমাদের আছে ইহাই এখন আমাদের একটু জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছে, তাই আমাদের মধ্যে জাতি-জাত্যটুকু এখনও শুকাই নাই। কিন্তু যে রকম সংস্কারের মেলা লাগিয়াছে তাহাতে বুঝি বা আমাদের জ্ঞানটাও আর থাকে না, এ স্বেচ্ছাচারের এক-টানা শ্রোতে ‘অহম্মমতি’ ভাবটাও ভাসিয়া যায়। বুদ্ধার নরনতারা অন্ধের নড়ি, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন এ আমাদের “আমাদের” জ্ঞানটা যাইলে ভারতের সমূহ কতি। আর্ধ্য জাতির সর্ব্বনাশ, আর্ধ্যসন্তানের সমূলে, বহুবংশ-নিধনবৎ উদ্ভলনের স্রোতপাত হইবে। তাই এখন আমাদের কথাটা মনে পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার মোহমায়ার আমরা বড়ই আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছি, আর নিজের কথা পরের কথা কোন কথাই মনে হয় না। মাতাল যেমন উন্মত্ত হইয়া, আত্মজ্ঞানহীন হইয়া, আলুথালু বেশে কত কি আবল ভাবল বকিতে

ব কিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পাগল যেমন কা'র কথা লইয়া, কা'র ভাবে কি জানি, কেমন রকমে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, হয়ত কেহ পালিদিলে তাহার উপর স্মৃধী হয়, আবার অল্প কেহ ভাল কথা, বৃকান কথা বলিলে তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়; আমরাও তেমনি নেশাখোর মাতালের মত, উদ্ভাদের মত, কত খেয়ালের উপর কত কথা বলিতেছি, কত রঙ্গই করিতেছি, নিজেদের বুদ্ধিদোষে কত সহই লাজিতেছি, তাহার আর অবধি নাই। অথচ যেমন মাতালকে মাতাল বলিলে চটিয়া উঠে, পাগলকে পাগল বলিলে মারিতে যায়, তেমনি অসুস্থ দূরদর্শী কেহ যদি উচিত কথা বলে, তবেই তাহার উপর দেশশুদ্ধ লোক চটিয়া লাগ। এমন শোচনীয় অবস্থা কেন হইল, এ দুরারোগ্য রোগ কোথা হইতে আসিল, এ অসুস্থতার মূল কোথায়? হয়ত ইতিহাস খুঁজিলে তাহা পাওয়া যায়, ইহার কারণ নির্ধারিত করা যায়।

মহাদি ধর্মশাস্ত্র ও কামন্দকী বার্ষ স্পত্য নীতিশাস্ত্রাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পূর্বতন আর্য্যঋষিগণ, একটা সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য সদাই ব্যস্ত। যেমন সৌরজগৎ কেমন এক শৃঙ্খলার পরিচালিত হইতেছে। যেখানের যে এছটি, যে তারটি, ঠিক সেই ভাবে সেই সেই কার্য্যগুলি করিতে থাকিলে বিশ্বসংসার সুশৃঙ্খলার, সামঞ্জস্যের ভাবে সাম্যের সহিত পরিরক্ষিত হয়, তেমনি আর্য্যসমাজের যেখানে যেটি আছে, সামাজিক উন্নতি করে, বাহাদের জন্য যে-যে কার্য্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদেরই ঠিক সেই কার্য্যগুলি যথানিয়মে করিতে হইবে—নচেৎ সমাজের কাছে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। পাছে শূত্র, নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্য না করে ব্রাহ্মণ পাছে উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাই শাস্ত্রকারগণ পদে পদে কত বিধি-বিধান, কত অশুশাসন বাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। সংসারে জন্মিলেই মানুষ সামাজিক হইলেন, সমাজের সুখ দুঃখ সকলি সমভাবে তাঁহাকে সহ করিতে হইবে—জিনি তখন সমাজের দাস। বাহাতে সমাজের উন্নতি হয়, বাহাতে সমাজে অশ্রের অভাবে লোক মারা না পড়ে, বাহাতে পাপের বুদ্ধি সমাজে না হইতে পারে, তুমি বতটুকু পার সাধামত ততটুকু তোমাকে করিতে হইবে। আর্য্যসমাজের ইহাই মূলমন্ত্র। কোটা কোটা লোকের সমাজের মধ্যে সকলেই কিছু ধনী হয় না, স্মৃধী হয় না, কর্ণের কলে তুমি একজন বড়ই ধনশালী হইলে, আর্য্যসমাজ তোমার ধনরাশী লোহার শিক্তকে চাবী দিয়া রাখিতে দিবে না, তোমার ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, তোমার ইহকাল পরকালের শুভ সম্পাদনের জন্য প্রচুর মুদ্রা তুমি লও, কিন্তু কতকাংশ ঐ যে অন্ধ, খল, বৃদ্ধ, অতুঙ্গ, দীন, দুঃখী অশ্রের জন্য, বস্ত্রের জন্য, হা হা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের বতটুকু দুঃখ মোচন করিতে পার তাহা কর, বিনয়্যার উন্নতির জন্য, ধর্মের বিস্তৃতির জন্য। যদ্যপি কিছু পার তাহা কর, ইহাই আমাদের সমাজের নিয়ম। এ নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ করিলে তুমি সমাজের নিকট দায়ী, তুমি সামাজিক পাপের পাপী।



ব্যারীজ্ সাহেব আমাদের দেশে Poor Law নাই বলিয়া বড়ই চমকিত হইয়া ছিলেন ; কিন্তু তিনিও জানেন না যে, আমাদের সামাজিক মূল নীতি এই যে, বাহাতে সমাজে মোটামুটি ভাবে সকলেরই অনবস্থের অভাব ঘুটিয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে। এখন বাণিজ্য দারার, দেশে ধনাগম অধিক হইলেই, অর্থনীতি শাস্ত্রবিদরা যেন চতুর্দর্শন লাভ করেন। কিন্তু সে ধন কি রকমে কতটুকু সাধারণ ভাবে বিস্তৃত লাভ করিল, তাহা কেহ দেখেন না। ইউরোপীয়ের চক্ষে ইংলণ্ড এখন বড়ই ধনী। কিন্তু ভারতের অর্থনীতিবিদগণ ইংলণ্ডকে হতভাগা ছাড়া অন্য কিছু বলিবেন না। কারণ তথায় কতকগুলি লোক কুবেদসদৃশ ধনশালী, এবং অপর সকলকেই ঐশাচ্ছাদনের জন্য ঘোর যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও অনেকে অভুক্ত থাকেন ইহা আমাদের চক্ষে সামাজিক মহাপাপ। সমাজের সকলে খাইয়া পরিয়া, মোটাভাত মোটা কাপড়ে সুখে দিন কাটাইতে থাকুক, আর যদি তাহার মধ্যে তোমার তেমন বাহাদুরী থাকে ত ন্যায়ের-পথ অবলম্বন করিয়া, ইহার উপর যাহা পার ঐশার্জন কর, ইজের ন্যায় ভোগবিলাসে ভাসিতে থাক, কেহ তোমার কোন কথা বলিবে না। বরং তাহাতে সমাজের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হইবে না। এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত বলিয়াই, পূর্বে ভারতীয় সমাজে অল্পকষ্ট অতি কম ছিল দুর্ভিক্ষ ছিল না! তাই শেকালের লোকে নির্ভাবনার দিন কাটাইত, তখন এ ছাই “জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence)” ছিল না। আজকাল মান নাই, অপমান নাই, যেখানে যাও সেই খানেই দেও দেও, নাই নাই শব্দ এ নরকের দৃশ্য পূর্বে ছিল না। তাই এখন আর তেমন গালভরা দেশছোড়া হাঁসিও নাই, সে আমোদ আমোদ নাই, সে দান ধ্যান নাই, সে সদাশ্রুত অতিথি সংকার নাই ; সে সুখ কৈ, সে শান্ত ভাব কৈ, সে সাম্যও নাই।

মাহুকের আশাতৃষ্ণাটা যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। আশা, আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও সমাজ চলে না ; কিন্তু আবার উহার অতি বুদ্ধিও ভাল নহে, সমাজে মুখ থাকে না। সকলকেই এক একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইবে, গণ্ডীর বাহিবে গেলেই, সমাজে অসন্তোষের বীজ বপন করা হইবে, তখন আড়াআড়ীটা বাড়িয়া উঠিবে, একটা অমম্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ান। জুড়িয়া বসিবে, কিসে অন্তকে চাপিয়া রাখিতে পারি, ইহাই সকলের চেষ্টা হইবে এবং পরিশেষে সাম্য বিনষ্ট হইয়া, সংসার ও সমাজ অনবস্থের সংগ্রাম স্থল হইয়া উঠিবে। এই জন্ত আমাদের সমাজে গণ্ডীগুলি এত পরিহার করিয়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম। তোমার নকলনবিবী ইংরাজী বুদ্ধিতে হয়ত এছাই (Caste System) জাতিভেদ-প্রথা ঘোর বৈষম্য পূর্ণ বোধ হইবে। কিন্তু ইহাই স্বভাবসিদ্ধ এবং মহৎ সমাজের একমাত্র অবলম্বনীয়। পূর্বের সে সমাজ শৃঙ্খলা উঠাইয়া দিয়াই, এমন হিন্দু সমাজ এত হুংখের আকর হইয়াছে। এখন জেলের

মাধার চেয়া ভেঙী। চুনোট কোর্ভা তেলীর তেলের তাঁড়ের স্থানে হাড়ির দাঁতের ছড়ী। সুচতুর ইংরাজের কুট নীতি আজ্ কার্যো সকল প্রসব করিয়াছে। সমাজে সাম্য থাকিলে, বাহার বাহ্য কর্তব্য সকলেই তাহা করিলে, সমাজে একটা শৃঙ্খলা থাকে এবং উজ্জ্বল দেশে একটি সমবেত শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই শক্তির বলে হরত কালে একটি মহাশক্তির সৃষ্টি হইতে পারে এবং বিজেতার লৌহনিগড় ভিন্ন হইয়া বাইতে পারে। তাই ইংরাজের স্ক্রোকশলে হিন্দু সমাজে ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, লোকের আর কর্তব্য বোধ নাই, তাই সে একতা নাই, সে সম বেদনাও নাই। বাহ্য হউক এই মূল নীতির অমুসারী কার্য্য করিয়া সমাজ ঠিক সেই মতে গঠিত করিয়া, আমরা বড়ই শাস্তি নিকেতনে ছিলাম। আৰ্য্য ঋষি-গণের এই সমাজ নীতি অমুসরণ করিয়া যদি মনে মনে একটি সমাজ গড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আমাদের আৰ্য্য সমাজ যেন সাত প্রায় চড়াইয়া ( Climax ) রচিত করা হইয়াছে। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি পররাষ্ট্র নীতি, ধর্ম্মনীতি সকল ব্যাপারই এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। বাহ্যই বলুন দেশ বলুন, ধর্ম্ম বলুন, উচিত বলুন সকলইত মানুষ লইয়াই টানাটানি। সেই মানুষ সমাজে সকলের মধ্যে মিশিয়া মিলিয়া কেমন করিয়া থাকিবে, এই কথা লইয়াই সমাজ-নীতির কত গোলমাল চলে, যে সমাজই যে কোন প্রকারে গঠিত হউক না কেন, ব্যক্তি মাত্রে-রই আমিত্ব জ্ঞানটা প্রায় এক ভাবেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি সকলেরই নিজ নিজ আমিত্বগুলিন সমবেত হইয়া, একটা দেশব্যাপী সামাজিক ‘আমি’ সৃষ্টি হয়। তুমি, আমি, আমরা, নগেন্দ্র সকলেরই স্বার্থপরতা মাথান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘আমি’ গুলি মিশাইয়া একটি সামাজিক ‘স্বার্থ’ সৃষ্টি হয়। যিনি এই প্রকাণ্ড সামাজিক ‘স্বার্থ’ মাথান ‘আমিত্ব’ে’ নিজের ক্ষুদ্র ‘আমিত্ব’ টুকু ডুবাউয়া উহারই মঙ্গলবিধানে বস্তুবান্ করেন তিনিই দেশহিতৈষী। আবার যিনি মোটের উপর এই সকলের ‘আমি’ কে বজায় রাখিয়া, তাহার হই একটি বিচ্যুতি সামুলাইয়া লইতে বদ্ধ পরিকর করেন, তিনিই প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। পূর্বে যে মূলনীতির কথা বলা হইয়াছে, সেই নীতির উপর এই ‘আমিত্ব’ জ্ঞানটুকু থাকা চাই। ইহার উপর ধর্ম্মন্যায় জড়াইয়া যে দয়া দান্ধিয়া মিশাইয়া, স্নেহ মমতা ঢালিয়া দিয়া যে একটি সমাজ গঠিত হয়, তাহা যে শাস্তির পবিত্র নিকেতন হইবে তাহাতে আর অণুমান সন্দেহ কি? কিন্তু বিধি বিধবনার সে স্মৃধ সে স্বচ্ছন্দতা আমরা নিজেই হারাইলাম।

ইংরাজ সাম্য বলিলে বাহ্য বুঝেন, অথবা লোকতঃ আমাদের বাহ্য বুকাইয়া থাকেন, তাহা হইতে আমাদের সাম্যটা সম্পূর্ণ পৃথক্। এখন ইংরাজের সে সাম্যের কথা পড়িয়া, বাল্যকালাবধি মূল সমাজ তত্ত্বের বিরোধে অভিনব সমাজ নীতির কথা শুনিয়া আমাদের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে বহুদিন পরপদতড়নে সঙ্কুচিত থাকিয়া যনের সে ক্ষুণ্ণি, হৃদয়ের সে প্রশস্ততা,

বুদ্ধির সে ধীরতা ও প্রবেশ শক্তি সকলই লয় পাইয়াছে। স্বাধীন বুদ্ধি থাকিলে, দেখিয়া গিয়া অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। কিন্তু পরাধীন জাতির পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। শৌর্য্য, বীর্য্য হারাইয়া আমরা পরাধীনতার কঠোর নিগড় নিজ হইতেই পরিলাম; আর তাহা বাড়িয়া উঠিয়া স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল, পরতন্ত্রতা অঙ্গের ভূষণ হইল, ধীরে ধীরে এক এক করিয়া সমুদায় নোচিত গুণগ্রাম হারাইতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া কেমন যেন ব্যঙ্গের মতন হইয়া গেলাম। পরতন্ত্রতা থাকিলে বাহ্য থাকিত, পরতন্ত্র হইয়া সে সব যুচিয়া গেলই, অধিকন্তু পড়া পাণী হইয়া উঠিলাম। এই শুকত্রে পরিণত হইবার সমসময়ে ইংরাজ ভারত জয় করিলেন। মুসলমানের বরং এদেশীয়তা অনেক পরিমাণে রাখিয়াছিল, সমাজের আদর্শ বাঁধন তখন ছিল হয় 'নাই, আমাদের বলিবার তখনও অনেক বিষয় ছিল। কিন্তু ইংরাজ শিক্ষার গুণে, তাহার মোহিনী মন্ত্রণা-লে ইহ সংসারে আর আমাদের "আমাদের" বলিবার কিছু রাখিলেন না। নানা ছলে কৌশলে, সকল জিনীষেই ভেজাল করিতে লাগিলেন। সমাজনীতি বিলাতী চক্ষে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। কান্সালের ভান্সচূরা বাহা ছিল তাহাও যুচিয়া গেল। কুবের যদি কান্সাল হন, ইল্ল যদি পথের ভিখারি হন, তবে তাঁহাদেরও আমাদের মত বুদ্ধিগন্ত হইতে হয়। হার রে যাহা-দের কাছে কোটা কুবেরও তুচ্ছ ছিল, যাহাদের প্রভাবে শত শত ইল্ল ও ভীত ও ভ্রান্ত থাকিতেন, যাহাদের বীরত্বে ধরাধাম কম্পিত হইত, তাহারা আজকালকার হিন্দুতে পরিণত হইয়া, যে এখনও মাথা তুলিয়াছে ইহাই তাহাদের পূর্ব পুরুষের পুণ্য ফলে বলিতে হইবে। "ভাজিল চূর্ণিল উলটি পালটি লুটি নিল বা ছিল সার ও" সবই গেল তবে আছে একটা 'আমাদের' জ্ঞান। ভান্স হউক, মন্ড হউক, নিন্দনীর হউক, অবাবহার্য্য হউক তবু সে সব যে 'আমাদের' অভাব তাহা যে 'আমাদের' আদরের ধন, যতনের সামগ্রী। বিদেশী ভূমি গালি দেও, ভূমি নিন্দা কর, দুঃখীকে নিঃসহায় দেখিয়া কটু কাটবা বাহা ইচ্ছা তাহাই বল, তাহাতে দুঃখ নাই, পরিতাপ নাই—তবে মনে জানিও যে 'আমাদের' বাহা তাহাই গ্রাহ। ভূমি গালি দিলেও 'আমার' জিনীষটি আমি ছাড়িব না। পৌত্তলিকতা 'আমাদের' জ্ঞাতিভেদ 'আমাদের' পুরাণতন্ত্র আমাদের তাই উহার আমাদের চক্ষে এত আদরের। যতদিন এই প্রাণ ভরা আমাদের কথাটি, আমাদের মাঝে ব্যবহৃত থাকিবে, ততদিন ইংরাজ ভূমি শত সহস্র কৌশল করিলেও হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। একদিন না একদিন তাহা আগিয়া উঠিবে। 'আমাদের' যে জাতীয়তার ভিত্তি তাহা কি জান না? ভগবান এ নৈরাত্তের মাঝে আশার জ্যোৎস্না রেখা প্রদীপ রাখুন।



২য় ভাগ ।

১২৯৪ সাল ।

৫ম খণ্ড ।

## সুখ ।

স্বার্থ প্রবৃত্তির নিকট সকল প্রবৃত্তিই দাস্যবৃত্তি করিতেছে । স্বার্থপ্রবৃত্তির অনুজ্ঞাবাতীত কোন প্রবৃত্তিই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না । সকলেরই স্বার্থ এক । কেবল্ বানভেদে ভিন্ন পথে প্রত্যেকে স্বার্থসাধনোদ্দেশে প্রস্থিত হয় । “অন্যোচ্ছানধীনেচ্ছা বিবয়” ই স্বার্থ, অর্থাৎ বাহা করিবার ঠেকা অন্যেক্সার অধীন নয় । সুখসম্ভোগ এবং দুঃখনিবৃত্তিই স্বার্থ বা স্বপ্নরোজন ; কেন না আমরা কোন কার্য্যসাধনেক্সার সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তি চাই না । বরং সমস্ত কার্য্যই একমাত্র সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সুখরূপ লক্ষ্য স্থানে যাটবার পথ, প্রবৃত্তিভেদে ভিন্ন হইয়াছে । কেহ ঐ আকাশের চাঁদ ধরিতে প্রবৃত্তির পথে অর্থাৎ ইঞ্জিরের বিষয়ে বিচরণ করেন, কেহ বা নিবৃত্তির পথে বিচরণ করেন । কেহ সুখের আবছারা দেখিয়া অগ্রসর হন । কচিং তড়িৎ বিভাত সুখের কিরণে পথহারা হন । কদাচিং কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত সুখ সাক্ষাৎকার ঘটে ।

অসৎপ্রবৃত্তি সুখের প্রবল প্রতিবন্ধক । অসৎ প্রবৃত্তিরূপ ঘোর ঘন ঘটার সুখশলী সতত সমাচ্ছন্ন । তাই আমরা নিরন্তর সুখাপানে বঞ্চিত থাকি । সৎপ্রবৃত্তিরূপ প্রভঞ্নের প্রবলবেগে স্বদয়াকাশ হইতে সুপ্রবৃত্তি মেঘ

বিদূরিত হইলে অশ্ব-শশীর উদয় হয়। তাই বলি সকলেই যখন “দিল্লিকা লাভু” একমাত্র অশ্বের তরে ধারে ধারে বেড়াইতেছে, তখন একবার সংপ্রবৃত্তির তোবাম্বাদ করিয়া দেখিলে হয় না? কাশীতে বাইবার ইচ্ছা। তাই, পথ অপরিস্ফুট। তথাপি কাহাকে দ্বিজাঙ্গাও করিব না—পাছে ভ্রমের কান হইয়া যায়। বল দেখি, কেমন করিয়া উদ্দেশ্য সকল হইবে?

হঠলোকের সহবাসে কুপ্রবৃত্তি ক্ষুরিত হয়। ইহার এই এক মহৎ দোষ—একটা কুপ্রবৃত্তি স্বপ্নে উদ্ভূত হইতে না হইতে, পালে পালে অপর কুপ্রবৃত্তি তাহার অল্পবর্ধন করে। গীতার ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন।

“সঙ্গাৎ সংস্কারতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজারতে ।

ক্রোধাদভবতি সম্রোহঃ সম্রোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ ॥

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥

ইহার তাৎপর্য—কুশলীর কুহকে, কুশলার, কুদৃষ্টান্তে মন স্বভাবতঃই কলুষিত হয়। মন কলুষিত হইলে কাম্যবস্তুর পাইবার জন্য, তৃষ্ণা সমুদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উপভোগতৃষ্ণা অতিশয় বলবতী হইলে ক্রোধবৃত্তি আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ যে কাম্যবস্তু লাভের অন্তরায়ভূত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ হয়। ক্রোধ হইলে চিন্তা চঞ্চল হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। মোহ হইলে নিজের পূর্বাগর অবস্থা আর মনে হয় না। কাজেই নিজ কুশল সাধনের উপায় স্মৃতি পথাক্রম হয় না। স্মৃতি বিভ্রম হইলে বুদ্ধির বিপর্যায় ঘটে। বুদ্ধি বিপর্যাস্ত হইলে লোক নষ্ট হয়, অর্থাৎ সে লোকের ইহলোকে ও পরলোকে অশ্বের সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের অন্তঃকরণের কুবৃত্তিই যে হুঃখের মূল এবং অশ্বের প্রতিবন্ধক, ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। অসুখাদিশায় যখন অন্তঃকরণ কুবৃত্তি মেঘে আবৃত না থাকে, তখন সকলেই অনুভব করিতে পারেন “অশ্বমহ-মবাঙ্গঃ” অশ্ব আশি নিত্যা গিরাহিলাম। অনেকেই বিবেচনা করেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয়োপভোগে অশ্ব আছে। বস্তুতঃ তাহাতে অশ্বের পরিবর্তে হুঃখের মাত্রাই অধিক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়োপভোগ যতদিন না ঘটে, ততদিন কেবল কামতৃষ্ণার হুঃখের জ্বলে জড়োভূত হইয়া অশেষ যন্ত্রণার কাল কাটাইতে হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ঘটিলে (অর্থাৎ কাম্য বস্তু পাইলে) কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবৃত্তি অন্য সুখানুভব হয়। আবার যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা। পুনর্বার বিষয়োপভোগ না হইলে আর পশ্চাদ্ভ্রাত তৃষ্ণা নিবৃত্তি

হয় না, বরং পদে পদে দুঃখ অনুভব হয়। যে কোন প্রকারে তৃষ্ণার অভাব হইলে সুখ এবং তৃষ্ণার সম্ভাব হইলে দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব তৃষ্ণা নিবৃত্তি জনিত সুখই কাম্যবস্তু-লাভের সুখ। তাই যদি হইল, তবে কর্দ্দমে পদক্ষেপ করিয়া পঙ্কিল পদ ধৌত করা অপেক্ষা কর্দমাত্ত পথে বিচরণ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য। অশেষ দুঃখাকর তৃষ্ণা করিয়া তাহার নিবৃত্তি জন্য সুখ অনুভব করা অপেক্ষা তৃষ্ণা পরিহার করিয়া যতঃসিদ্ধ সুখ অনুভব করাই উচিত। কুপথ্য ভোজন করিয়া অসুস্থ হইলাম, পরে ঔষধের দ্বারা রোগ নিবারণ করিয়া, আরোগ্য সুখ অনুভব করা অপেক্ষা কুপথ্যাদী না হওয়া কি ভাল নয় ?

কথাটা একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি। মনে করুন, গ্রামের বাগীচে কলমের চারার ভাল আম দেখিয়া আমার লোভ হইল। সেই আমটা খাইতে প্রবল তৃষ্ণা হইল। সেই তৃষ্ণার অহোব্রাজ উদ্বেগ সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে চৌর্য্যবৃত্তির প্রসাদেই হউক, অথবা কাকুতি মিনতির কৃপায় হউক, কিম্বা মিত্রতার খাতিরেই হউক এত সাধের আমটা উদরসাৎ করিয়া, চিরপ্রবহু সঞ্চিত লোভ তৃষ্ণার শাস্তি করিলাম। এবং তজ্জনিত কিঞ্চিৎ সুখও অনুভূত হইল। নিরপেক্ষ ভাবে সুখ দুঃখের অনুপাত করিয়া দেখিলে দেখিবে, দুঃখের সম্মানই অধিক। পক্ষান্তরে দেখ, আমি যদি অপাত্রে তৃষ্ণা না করিতাম, তাহা হইলে আর এত উদ্বেগ, এত আয়াস, এত লাজ্জনা-এত নানতা স্বীকার করিতে হইত না। তুমি বলিবে—ভক্ষণ জনিত সে “দিল্লিকা লাভু” সুখটুকু পাইতে না। একটু স্নান দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে, সে সুখও আমার কাছ ছাড়া ছিল না। আমি পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি, তৃষ্ণার অভাবই সুখ এবং তৃষ্ণার সম্ভাবই দুঃখ। আম্র ভক্ষণ করিয়া যে তৃষ্ণার অভাব করিলাম, যদি লোভের পূর্বে সে অভাব করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আর পরের কাছে তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য সুখের মুষ্টিভিক্ষা করিতে হইত না। পাঠক, একটু প্রণিধান করিলে আমার বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ হইবে, তথাপি প্রকারান্তরে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

সকলেই জানেন, সুখ স্বসংবেদ্য অন্তরের ধর্ম। প্রতিবন্ধকের অভাবে আপনিই ফোটে প্রতিবন্ধকের সম্ভাবে আপনি টোটে। দুঃখই সুখের প্রতিবন্ধক, দুঃখের অভাব হইলে আপনিই সুখের উদয় হয়, ইহা নির্নিবাদের

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং হুঃখই সুখোদয়ের একমাত্র প্রতিবন্ধক। চিন্তে কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি উদ্ভিত হইলে যতদিন চরিতার্থ না হয়, ততদিন তাহার অভাব অনিত্য বলবৎ হুঃখ হয়। সে সময়ে হুঃখরূপ প্রতিবন্ধক থাকার সুখের সাক্ষাৎকার ঘটে না। যখন কামাদি প্রভৃতি চরিতার্থ হয়, তখন তাহার হুঃখের অনুবৃত্তি থাকে না, সুতরাং সুখ স্বয়ংই আবির্ভূত হয়। কেন না তাহার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হুঃখ আর নাই। প্রণালী কাটিয়া অন্তঃপুরে জল আনিয়া অপর প্রণালীর দ্বারা বাহির করিয়া স্বচ্ছন্দতাল্লাভ যেমন দুর্ভুক্তির কার্য্য, ইহাও তাই, কেননা যে হুঃখের অভাবে সুখের উপলব্ধি হইতেছে, সে হুঃখ না করিলে হুঃখাতাব থাকিত, সুখও উপলব্ধ হইত। অতএব সাবধান, বাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া আহার বিহার প্রভৃতি কার্য্য পরম্পরা নির্বাহ করিতেছ, কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া, হেলান যেন তাহা (সুখে) হারাইও না। গীতার উক্ত হইয়াছে।

“শক্ৰোত্তীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ ।

কামক্রোধোত্তবং বেগঃ সমুর্জঃ সমুখী নরঃ ।”

অর্থ—এই সংসারে কাম, ক্রোধে চক্ষুরাদির ও মনের কোভরূপ বেগ আছে। যে ব্যক্তি সেই বেগের উত্তব কালেই আত্মবিন তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যোগী ও মুখী। এস্থলে কাম শব্দের অর্থ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা রাক্ষসীই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। যখন ঘৃণিষ্ঠির তৃষ্ণাতুর হন। তৎকালে শৌনক তাঁহাকে সহুপদেশ দিয়াছেন—

“রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকুষাতে ।

ইচ্ছা সংসায়তে তস্মাত্তত্তৃষ্ণা বিবর্জিতে ॥

তৃষ্ণা তি সৰ্ব্বপাপিষ্ঠা নিভ্যোগেণ করীশ্বতা ।

অধশ্চ বহ্লাটৈব ঘোরাপাশানুবন্ধিনী ।

বা হৃদ্যজা হৃদ্যতিভির্বা ন জীর্ষাতি জীর্ষাতঃ ।

যোহসৌ প্রাণাস্তকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং তাজতঃ সুখম্ ॥”

পুরুষ অহররাগাভিভূত হইলেই কামনা তাহাকে আশ্রয় করে। অনন্তর সেই বহলাভের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইলে তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে। তৃষ্ণার মত পাপিষ্ঠা সংসারে নাই; নিরন্ত উবেগকরী, অধশ্চবহলা এবং পাপের অনুবন্ধ করিয়া দেয়। হৃদ্যতি হইলে তৃষ্ণা ত্যাগ করা যায় না। নিজে

প্রাচীন হইলেও তুষ্ণা প্রাচীন হয় না। যে তুষ্ণাক্রম প্রাণাত্মিক রোগ হইতে মুক্ত হয়, সেই সুখী।

পাঠক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথের স্মরণ দেখাইলাম। যদি হৃৎপথের স্মৃতি প্রথিত কণিক স্মৃতির ঘোরে বিভোর হও, তবে প্রবৃত্তির পথে বিচরণ কর, তুষ্ণার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আত্মগারা হও, অনন্তকালের জন্য আত্মাকে নরকপথের পথিক কর। আর যদি নিবৃত্তির পথের পথিক হও চিরকাল ভ্রমানন্দে ভুগ্ত থাকিবে।

## “ শক্তি । ”

আমরা স্থিরভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই, জগতের অন্তরালে কোন পদার্থ নিষ্প্রিত থাকিয়া জগৎ বিচালিত করিতেছে। এবং জগতের যে কোন কার্য সম্পাদিত হইতেছে, সমস্তই শক্তির অনুবলে। এই শক্তির রক্ষা ও পরিবর্ধন জন্ত সকলেই ব্যস্ত। বাহাতে শক্তি থাকে তৎপক্ষে সকলেই বিশেষ সাবধান। হাত নাড় পা নাড় বাহা কর সমস্তই শক্তি সাপেক্ষ। একটি কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন। যেখানে বেরূপ শক্তি তৎরূপ কার্য হইয়া থাকে। যদি শক্তি না থাকে তবে কার্য সম্পন্ন হইবে না। অতএব বলা বাহুল্য যে প্রত্যেকের শক্তির সেবা করা একান্ত প্রয়োজন ও নিত্য কৰ্ত্তব্য কৰ্ম। সংসারে থাকিয়া ব্যবহার ক্ষেত্রে অত্যাচ্ছ হইতে বাসনা কর শক্তির প্রয়োজন। সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য বিগিনে বিচরণ করিয়া মোক্ষফল চাও শক্তি সেবা আবশ্যক হইবে। অহুদিন শক্তি সাধন কৰ্ত্তব্য। আমরা জগতে তিনটি কার্য দেখিতে পাই। এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় স্থিতি, তৃতীয় বিনাশ। উহা শক্তির লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ কার্যত্রয় সংরক্ষণ জন্য শক্তি বিভিন্নরূপে প্রয়োজিত হয়। এবং আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ শক্তি মূলে এক। বস্তু সমূহের আধার শক্তি \*। জাগতিক বিভিন্ন

\* গ্রীক শব্দের তর্কচূড়ামণি প্রণীত ধর্মব্যাক্য্যে দ্রষ্টব্য।



শক্তি গুলি মূল শক্তির অংশ । জ্ঞান বিশেষে সংলগ্ন হইয়া বিভিন্ন কার্য করে । এতক্ষণ আমরা যে শক্তির কথা বলিয়া আসিলাম । বহুদ্বারা অগৎ পরিচালিত স্বীয় উপাদানে অবস্থিত এবং অশেষ পরিধামে নিরোজিত, সেই শক্তিরও আবার একটিমাত্র আধার আছে । শক্তি শক্ত ছাড়িয়া ভিত্তিতে পারে না । যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র তাবে অবস্থান করিতে পারে না । সেইরূপ মূল শক্তিও শক্ত-পরিহীণ হইয়া থাকিতে পারে না । অগ্নি ও দাহিকা, জড় ও জড় শক্তি, মূলশক্তি ও শক্ত, চিৎশক্তি ও চিৎ । সেই চিৎ একমাত্র সত্য । কালক্রমে একরূপে বিদ্যমান । দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছিন্ন হয় না স্তরায় অনন্ত । এই তত্ত্ব আমরা পরমতিষ্ঠিত্বিণী প্রীতি মুখে শুনিতে পাই, যে “ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ” ।

মূল শক্তিকেই আদ্যাশক্তি বলে । শক্তি ও শক্ত অভেদে অবস্থিত । চিৎ ও চিচ্ছক্তি অভেদে বর্তমান । স্তরায় শক্তি শক্ত ছাড়িয়া জড় কার্য নহে । যেখানে শক্তির ক্রিয়া সেখানে তাহা আপাততঃ শক্তির ক্রিয়া বলিয়া প্রতীতি হইলেও বস্তুর শক্তির ক্রিয়া নহে শক্তের ক্রিয়া । আমরা পূর্বে বলিয়াছি শক্ত ছাড়িয়া শক্তির সত্তানাই । স্তরায় কিছুই নহে । শক্ত, অভিধান ক্রমে শক্তির বিকাশ, স্ফোচ বা উপসংহার করিতে পারেন । কারণ উহা জড় শক্তি নহে, চিচ্ছক্তি । এই জড়ই এখানে ইহাও বলা যাইতেছে যে, পূর্বে যে মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তির কথা বলা গিয়াছে উহা শক্ত-সম্বলিত । শক্ত-শূন্য শক্তি নহে, কারণ তাহা কিছুই নহে । ঐ শক্ত সর্বাংগে বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞার সংজ্ঞিত । শক্তি ও শক্ত অভেদে বর্তমান । শক্ত বহন শক্তি লীলা উপসংহার করিয়া স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তিনি নিলোপ নিগূর্ণ । কলতঃ সত্ত্ব ঐ অবস্থা হইলেও কেবল প্রলয় সময়ে ভগবানের যে অবস্থা, সেই স্বরূপকেই আমরা নিগূর্ণ নিরঞ্জন বলিয়া, কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লইতে পারি । অন্যথা তৎস্বরূপ যোগ জ্ঞান ভিন্ন অনুভব করিবার সাধ্য নাই । মনে ধারণা হইবে না । কেবল বিতণ্ডা করিতে সমর্থ হইবে মাত্র ।

শক্তির অনন্ত লীলা ও অনন্ত ক্রমতা । শক্তিই মারা । পরমেশ্বর মারা সুখে অগৎসর্জনাদি করিয়া থাকেন, তখন তিনি বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন নামে অভিহিত হন । ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরমার্থতঃ এক । মারা নির্ভ সৎ ব্রহ্মঃ তত্ত্বমোগ্য ভেদে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ।

“সচ পরমেশ্বর একোহপি যোপাধিভূত মারানিষ্ঠ সখ রজ স্তমো-  
গুণ ভেদেন ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর শব্দ বাচ্যতাং তদ্বতে,,। বেদান্ত  
পরিভাষা ।

মায়া বা শক্তি তদমূৰ্ত্তপ ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ও শৈবী বলিয়া ব্যবহৃত হয় ।  
বস্তুতঃ একচিৎ একমায়া । শক্তিই কার্যভেদে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবান্নিকা ।  
শাস্ত্রে উহার অনেকশঃ উল্লেখ আছে ।

“শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবান্নিকা,, ইতি ।

“ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্ম শক্তয়,, ইতি ॥

“সৰ্গ স্থিত্যন্ত কারিণীং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবান্নিকাম্ ।

স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব অনার্দনঃ ॥”

“ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানাব্রহ্ম শক্তয়ঃ ।

বিষ্ণু শক্তিঃ স্মৃতা প্রোক্তৈস্মৃতেঃ পরম শক্তিভিঃ ॥”

ইহা ভিন্ন ঋতিতে ও রহিয়াছে

“তে ধ্যান যোগানু গতাপশ্যান্

দেবায় শক্তিং স্বগুণে ত্রিগুচাং ।”

অতএব এক অধিতীর পরব্রহ্ম সূতরাং এক শক্তি, ইহা বিশেষ রূপে  
উপপাদিত হইল । নীরূপ পরমেশ্বরের ঐরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, শক্তির  
কোনও ছায়া অবলম্বন করিতে হইবে । উহাই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী  
রূপে উপাসিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা সংসাধিত হয় । ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন সন্ধ্যা  
করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাতে ঐ মূর্ত্তির উপাসিত হয়, ইহা চিরন্তন নিত্য পদ্ধতী ।  
অতএব ব্রাহ্মণগণ শাক্ত । এবং শক্তিগণ সৰ্ব্বোপরি অবস্থিত । উপাসনা  
করিতে হইলে তাহাকে শাক্ত হইতেই হইবে । এখানে ইহা ও বলা যাইতেছে  
যে, হুগাঁ, কালী প্রভৃতি ও উহাঁই । এখন এই এক কথা হইতে পারে যে,  
যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজিত হয়, উহা প্রকৃত মূর্ত্তি কি স্বকপোল  
কল্পিতা (আমরা বলি স্বকপোল কল্পিতা নহে । অবস্থাভেদে, হৃদয় শতদলে  
সাধক যে ভাবে নিরন্তর ধ্যান যোগে সমাহিত থাকেন, পরমেশ্বর তাহার মানস  
সকল করিবার জন্ত ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবিভূত হইয়া, অথবা ঐ সকল মূর্ত্তি  
পরিগ্রহ করিয়া সাধকের মনোবাহা পরিপূরণ করিয়া থাকেন । পরমুখিত  
সাধকগণ ও সেই মহাজন নির্দিষ্ট পথের পাহ হইয়া তত্ত্ব ফললাভে সন্মগ্ন  
হইবে, এই আশায়ই ঐ সমস্ত মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন । ঐ সকল মূর্ত্তি

মন গড়া খাম খেরাল বা বালকের জীড়া পুতুল নহে। আবার একান্ত ভক্ত সাধক, যখন ব্রহ্মানন্দে পরম প্রীতি অমৃতব করিয়া, অমৃতোপভোগ করেন, তখন তাঁহার পবিত্র হৃদয়, দৈবাবেশে আবির্ভূত কোন বিগ্রহ না পাইলে, হৃদয় সিংহাসন বেন শূন্য শূন্য বোধ করেন। তখন সাধক ভক্ত, সাধ করিয়া এক দিবা বরণীর মূর্তিকে হৃদয় রাজ্য সমর্পণ করিয়া, সংসার চক্রেতে বিদায় গ্রহণ করে। ত্রিতাপ ও হৃদয় গ্রহি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলোপ পায়। আশ! সাধকের সেই অবস্থা ভূতলে অতুল। তিনি ধন্য তিনিই কৃত-কৃত্য তাঁহাই অন্য সকল, যিনি এরূপ বরণীর মূর্তিতে আত্ম বরণ করিতে পারিয়াছেন।

অগতের প্রতি পদার্থ বা প্রতি কার্য, যেমন সাধিক, রাজসিক বা তামসিক মিশ্রিত। উপাসনাও তেমন সাধিক রাজসিক তামসিক আছে। সর্বাঙ্গিক সাধিক উপাসনাই প্রশস্ততম। শক্তি সাধনও সাধিক হইলেই চরমোৎকর্ষে উন্নীত হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে। অতএব উপাসনা পথে বিচরণ করিয়া অমৃত ফল লাভ করিতে হইবে। উপাসনা শক্তি অবলম্বন ভিন্ন হইতে পারে না। উপাসনা মানস ব্যাপার বিশেষ। এইজন্ত সকলের কর্তব্য বাহ্যতে শক্তিমূর্তি হৃদয় পটে অচিরে চিত্রিত থাকে। এবং সকলের শক্তি সাধনতন্ত্রে প্রণীত হওয়া কর্তব্য। তাহার সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম বলিয়াছি, ব্রাহ্মগণ শাক্ত, পরে বলিয়াছি উপাসকগণ শাক্ত। যে পঞ্চাশতনী দীক্ষা প্রচলিত আছে, উহার প্রত্যেকেই ব্রহ্ম শক্তির আলম্বনে দীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মই কখন কালী, কখন বিষ্ণু, কখন ক্রম প্রভৃতি নাম ও উপাধির মাত্র পার্থক্য, বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। গুণ তারতম্য ও অবস্থাভেদে শক্তি সাধনের বিভেদ আছে, তাহাতেই কেহ শাক্ত কেহ বৈষ্ণব। তা বলিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের পৃথক জ্ঞানে হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, অভেদ জ্ঞানই কর্তব্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রেও এবিধ উক্তির অভাব নাই। সকলেই এক লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য বিভিন্ন মার্গে আবেশ করেন। কৃষ্ণ ও কালী অভেদ দেখাইবার জন্য কৃষ্ণকালী মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। যে চণ্ডী গৃহে অদ্যাপি পঠিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলেও অভেদ জ্ঞানই প্রতীতি হয়। এক ব্রহ্ম, এক মায়ী ইত্যাদি উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই চণ্ডীতে নিখিল আছে।

যাদেবী সৰ্বভূতেষু বিষ্ণু মায়েতি সংস্থিতাঃ ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১১

এইরূপ বহুবিধ শ্লোকে অভেদ প্রদর্শিত হইরাছে এবং সমস্তই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির কার্য বলিয়া বর্ণিত আছে ।

“বিষ্ণু মায়া চেতনা চ বুদ্ধিঃ নির্দ্বা তথা ক্ষুধা ।

হায়া শক্তিস্তথা তৃষ্ণা কান্তিঃ জ্ঞানচলচ্ছকঃ ॥

শান্তিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিঃ লক্ষ্মী বৃত্তিঃ স্মৃতিস্তথা ।

দয়া তুষ্টিঃ মাতা চ ত্রাস্তিৰ্য্যাস্তিচিতিস্তথা ॥”

এইরূপ উক্তি বাহ্যের অসম্ভাব নাই অতএব ইহা দৃঢ়রূপে বলা বাইতে পারে যে এক ব্রহ্মোপাসনা উপাধি ভেদে বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত মাত্র পরমার্থতঃ এক সত্য নিত্য নিরঞ্জন । তাঁহার পরাশক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন, স্থিত ও অন্তিমে তাহাতেই-বিলীন হইবে ।

শক্তি সেবার হ্রাস হওয়াতেই ভারতে দুর্গতি । দৈহিক শক্তিকে বল বলে । ইন্দ্রিয় সামর্থ্যকে ওজঃ বলে ও মনের শক্তিকে সাহস বলে । আমাদের এই তিনটাই ব্যভিচার দোষে হুট হইয়া রাহে শুষ্ক চন্দ্রমার ভায় নিশ্চুড় হইতেছে । দিন দিন উপচয় না হইয়া, অপচয় হইতেছে । আবার আহার ও বিহার প্রভৃতির সহিত, উহার প্রত্যেকের সম্বন্ধ । আহারাদির পবিত্রতা ও সাধিকতা সংরক্ষিত না হইলে কখনও দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হইবে না । সুতরাং একান্ত প্রার্থনীয় শক্তিদেবীও ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিতে আরম্ভ করিবেন । আমাদের প্রাণনশক্তিও ধর্মতা অবলম্বন করিতেছে । যে শক্তি, প্রাণনশক্তিকে প্রকৃত অন্নগ্রহে নিরোধ করিয়া বড় শ্মিরহিত \* হইতেন এবং জীবন্ত হইয়া ভূমানন্দ পান করিতেন, তাঁহাদের বংশধর গণের মধ্যে আজ রেইলওয়ে গাড়ীতে, যবন-স্লেচ্ছ সংপৃষ্ট কর্কটায়মান এক খণ্ড কটীর ভয়াংশ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত লোলুপ দেখা বাইতেছে । তাহা উদরস্থ বা কবলস্থ না করিলে তাহার কিছুই ক্রেশ বা ক্ষতি নাই, তথাপি যেন ঐ স্থানে উহা না করিলেই তাহার বিশেষ আশ্রয় হইয়া থাকে । বাহারা নীরস একখণ্ড “বীজকুটে”র লোভে অতি পবিত্র সনাতন ধর্ম ও জগৎ পুণ্য বংশ

\* ক্ষুৎ পিপাসে, শোক মোহো জরাস্থতা বড় ধর্ম ।

পরিভ্রাণ করিতে চাহে, তাহার। ধরণীর ভার ও দেশের কলঙ্ক ও কুলের অজার, ইহা আর বলিতে হইবে না।

পুরাকালে আহার বিহারের মেধ্যামেধ্য বিচার ছিল। ধর্ম্মাচরণে মন প্রাণ দিবানিশি ব্যাপৃত থাকিত তাহাতেই, মানসিক শক্তির সম্প্রসারণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া জগৎজুগ ভারত পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমরা এখনও বলি আবার শক্তি সাধনে তৎপর হই। এস আমরা পবিত্র হৃদয়ে শক্তির সেই অমৃতময় প্রস্রবণ অজস্র পান করি, আবার পৃথিবীতে আমরা পরম শাক্ত বলিয়া পরিচিত হই। জাতীয় মজ্জা আগরিত হইয়া গেই, পরমারাধ্যা সঙ্গীবনী শক্তি দেবীর চরণস্নোহ্ন মকরন্দ নিরন্তর পান করি। আবশ্যক হইলে হৃদয় শতদলকে নিমেষ মধ্যে উৎপাটন করিয়া পবিত্র চরণে অঞ্জলি প্রদান করি, তিনি দয়াময়ী অবশ্যই আত্মাদিগকে দশ হস্তে দশদিগ্ হইতে রক্ষা করিবেন। আমাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া হৃৎ দূর করিবেন। তখন আমাদের বহিঃ শাক্ত কি করিবে? মেঘমূখের স্তায় পলায়ন করিবে। আমরা অন্তঃ শাক্তকে, আত্মা-দেব সহিত ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে জ্ঞানালি দ্বারা বলি প্রদান করিব এবং দেহ উৎসর্গ করিয়া সংসারানলে আহুতি প্রদান করিব, প্রারব্ধ উহার দক্ষিণ। এইরূপ শক্তিসাধন অস্ত্র প্রত্যেকে দীক্ষিত নাহিলে অতি তুচ্ছ লোভে মনকে বিষয়ী করিয়া বিষয় স্রুৎসাগরে নিমজ্জিত করিলে আর নিস্তার নাই বরং হুর্গতি, উহার তর্পণ নাই বিরাম নাই স্রুৎও নাই। আত্ম ব্রাহ্মণ জাতির এত হুর্গতি, শূত্র, ধন, স্নেহ ও ব্রাহ্মণ প্রায় একাকার হইতেছে লোভ তাহার একতর কারণ; যেলোভ এক সময়ে ব্রাহ্মণের জিনীমা স্পর্শ করিতে ভীত হইত, আত্ম তাহার অন্তঃ-পুরে। কালবশে এরূপ হুর্বিপাক পৃথিবীতে আর কোন জাতির ঘটে নাই। শক্তিহীন হইলে এমনই আশ্চর্য্য কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় যে, একটু চিন্তা করিলে বিলক্ষণ বিষয় রসের সঞ্চার হয়। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কুচক্রে পড়িয়া কুসুলের বাতালে অবলীলাক্রমে ব্রহ্মবজ্র অথবা স্নেহ লাভিতেছেন। সাজিয়াই কান্ত নহেন, মুকুরে আবার সেই মনো-মোহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার অস্ত্র ব্যস্ত হন। শক্তিশূন্য হইয়াই এ স্রবৎ অচিন্তা রচনা রচিত হইতেছে। যদি একান্ত মনে অশেষ সাধনার আবার শক্তিসিদ্ধির বিশেষ ব্যয় না ঘটে, তবে সর্ব্ববিধেই ধিকার লাভ করিয়া

নানাবিধ ক্লেশ হইবে। আমরা পূর্নাগর দেখিয়া এই স্থির করিতেছি যে এখনও সারাহ হইয়া নাই, সূর্য্য ডুবেনাই, বিপাকগণ বড়ই কেন জুটী কুটীলানন হউক না, সকলে সমবেত হইয়া মন প্রাণ তরিত্তা শক্তিসাধন করি এবং ষোড়শোপোচারে যথাসাধ্য, শক্তি সেবা করিয়া পরম শান্ত হই।—

## ধর্ম্ম ।

আমরা হিন্দু আখ্যায়িকাগণের মস্তান, এককালে ধর্ম্মই আমাদের জীবন, ধর্ম্ম আমাদের একমাত্র বল ছিল, কিন্তু হার কালের করালপ্রাণে পতিত অন্যান্য ত্রৈলোক্যের স্তায় আমাদের সেই অমূল্য রত্নটীও নষ্টপ্রায়; কিন্তু ইহার কারণ কি? যাহাই হউক তাহা বলিবার জন্য আমার এ অবতারণা নহে। যে কোল কারণেই হউক আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইয়াছে, এবং যেটুকু অদ্যাপি ও বর্ত্তমান আছে তাহাও নানা প্রকার অর্থে গৃহীত হইয়া বিকৃত হইয়াছে এবং তাহাতে আচরণকর্ত্তাদের সাধনে স্মৃকল প্রসব করে না।—অতএব আমার এখানে একমাত্র বক্তব্য যে ধর্ম্মসাধন করিবার পূর্বে ধর্ম্ম-গিণাসুগণের ধর্ম্মপদার্থ কি জানা উচিত এবং তাহা বর্ত্তমান সময়ে কোন অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

১ম ধর্ম্ম কি? “চোদনা লক্ষণার্থে ধর্ম্ম” ইতি জৈমিনী—

সূত্রঃ “চোদনয়া বেদেন লক্ষ্যতে অর্থঃ শ্রেয়ঃ সাধনং”

ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্ভিষ্টে প্রয়োজ্যাদয়-লক্ষণং

অন্য সম্যগমুষ্ঠানং স্বর্গো মোক্ষস্ত জারতে”

ইতি ভবিষ্য পুরাণম্

বেদাদি দ্বারা লক্ষিত শ্রেয়ঃ সাধন যে বস্তু তাহার নাম ধর্ম্ম। শ্রেয়ঃসাধন হই প্রকার স্বর্গাদিসাধন আর নিঃশ্রেয়ঃ সাধন অর্থাৎ মুক্তিসাধন।

সংকল্প পূর্ব্বক কার্য্য করিলে স্বর্গাদি হয় কিন্তু তাহাতে পুনরায় ভববন্ধনা সহ করিতে অন্তঃপ্রবণ করিতে হয়, কারণ ইহা সংসারে বিচরণের স্যায় স্বর্গাদি বাসও ভোগমাত্র, ইহ সংসারে সংকারণের অন্তর্ধান দ্বারা স্বর্গাদি

লাভ হয় এবং তথায় কিয়ৎকালের জন্য বাস করিয়া, তথাকার ভোগপূর্ণ হইলে, জীবপুনরায় দেহধারণ-পূর্বক সংসারে অবতীর্ণ হইবে।

বহিঃ কামনা পূর্বক কার্য্য কর্মপদ বাচ্য, তপাপি উহা উৎকৃষ্ট ধর্ম নহে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য আত্মজ্ঞানে সহকারি কারণ বলিয়া মোক্ষ সাধন। ইহাতে কামিষ নাই। (“কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহান্ত্য কামতা” ইত্যাদি মনু ২অ ২য় শ্লোক)। “আত্মাবারে প্রৌভব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যশ্চেত্যোতাবদরে খলুভূতং”। অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তি হইতে হইলে আত্মার শ্রবণ মননাদি করিতে হয়, এই শ্রবণ মননাদিই প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু আত্মধর্মিক শ্রবণ মননাদিতে পদার্থ জ্ঞানের অবশ্যকতা, পদার্থ জ্ঞানিতে হইলে শাস্ত্র ও গুরুপদেশের আবশ্যকতা —

“ধর্ম বিশেষ সূত্রেণ জ্ঞেয় গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবয়ানাতঃ পদার্থানাম্ স্বাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব জ্ঞানিঃশ্রেয়সং।” “জ্ঞেয় গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবয় পদার্থানাম্ স্বাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাম্ তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং হেতুঃ।

তচ্চ দৈবর চোদনাভিবক্তাং ধর্মাদেব।

ইতি কণাদ সূত্র ভাষ্যঃ

“ভিন্নিঃশ্রেয়সং-তথাচ দৈবর বেদনয়া প্রতিপাদিতাং আত্ম

ধর্মিক শ্রবণ মননাদ্যাভ্যাক ধর্ম্মানিঃ শ্রেয়সং” ইত্যর্থঃ

কণাদভাষ্য টীকা

সরলার্থ। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকও করে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আবার ধর্ম কারণ, এই ধর্ম আত্মার শ্রবণ মননাদি তাহাতে জ্ঞেয়াদি পদার্থ জ্ঞানের আবশ্যকতা।

ভাবার্থ। পদার্থ জ্ঞান হইলে আত্মার শ্রবণ মননাদি ইহবে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান অনিবে তাহা হইলে মুক্তি হইবে। এইপ্রকার আত্ম চিন্তনই ধর্ম এবং ইহাই মুখ্যধর্ম। ভগবান্ মনু যে দশকঃ “ধর্মলক্ষণঃ” বলিয়া যে ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন তাহা উক্ত ধর্মের অঙ্গ, কারণ উক্তপ্রকার ধর্ম যাজনা করিতে হইলে শাস্ত্র দান্ত হওয়া আবশ্যক সূত্রসাং উহাকেও ধর্ম বা অঙ্গধর্ম বলে।

২য়। ব্রাহ্মণ্য অর্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অর্থ প্রভৃতির ধর্ম ইত্যাদি যে ধর্ম পদ ব্যবহার কর. তাহা কিন্তু উক্ত ধর্ম নহে। ঐ ধর্মের অর্থ ইত্যর

ভেদাঙ্গমাপক অর্থাৎ বাহ্য আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তদিতর হইতে ভিন্ন ।

৩য় । “নাঋত্যাং মাংস মশীরাং” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তিথি ভেদে জব্য বিশেষ ভোজন নিবেদন করিয়াছেন তাহাও ধর্ম বলিয়া খ্যাত, তাহার অর্থ উক্ত ধর্ম নহে, কিন্তু শরীর ধর্ম অর্থাৎ চক্ষু স্বর্ষ্যাদির গতি ভেদে পৃথিব্যাতির ও তজ্জাত জব্যাদির গুণের পরিবর্তন হয় । যে যে তিথিতে যে যে জব্য ভক্ষণ নিবেদন করিয়াছেন, সেই সেই তিথিতে সেই সেই জব্যের গুণের ব্যতিক্রম হওয়ার তাহা খাইলে পীড়া হয় । যদি শরীরে সুস্থতা না থাকিবে, তবে লোকে কি প্রকারে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ “শরীরে মাদ্যং থলু ধর্ম সাধনং” অর্থাৎ ধর্ম সাধনের পূর্বে সুস্থ শরীরে কারণতা ।

৪র্থ । বর্তমান সময়ে ধর্ম শব্দটির যোগার্থ গ্রহণ হয়, উহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ হয় না । আমার বোধ হয় উক্ত অর্থটি ইংরাজী রিলিজন (Religion) শব্দের অনুবাদ । কারণ ধর্ম শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় গ্রহণ করিলে বাদৃশ অর্থ গ্রহণ হয়, রিলিজন শব্দটিও তজ্জপ, অর্থাৎ ধাতু (ধারণার্থক) + মন্ (এবং রি (re) + লেগো (lego) বন্ধন করা (bind) ) যাহাতে লোককে কোন বিশেষ কার্য্যে বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ করে এবং বাস্তবিক ইহা হইতে দেশধর্ম কুলধর্ম রূপ নানাবিধ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সংজ্ঞা হইয়াছে । কিন্তু ইহা প্রকৃত ধর্ম পদার্থ নহে এবং এই প্রকার এক শব্দের একভাবে তাবান্তরে গৃহীত হওয়ার আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম লইয়া এত গোল, ধর্মের এত হৃদশা, হায় ইহা কি পাশ্চাত্য বিদ্যার কল না কালের সাহায্য ?

“ধর্মাবন্ত ন কিঞ্চিদন্তিভুবনে ধর্মায়তনৈনমঃ ।” (ক্রমশঃ) ।

## বালিবধ ।

সত্যশ্রুত রামচন্দ্র নিরপরাধ বালিকে কিরূপে বধ করিলেন, ইহা, আপাততঃ বাস্তবিকই এক কঠিন সমস্যা । বলিয়া বোধ হইতে পারে ? তাহাতে ও যদি-লক্ষ্য সংগ্রামে বালিবধ হইত, তাহা হইলেও বা কতকটা কথা ছিল ।



কিছু এ কি ? সত্যময় পুণ্যময় বীৰ্য্যময় শৌৰ্য্যময়, ত্রিভুবন বিজয়ী, পরম  
 রামেরও ধৰ্ম্মপন্থারী ভগবান্ রামচন্দ্র, চোরেয় ম্যার বৃদ্ধাভরণে লুঙ্কারিত  
 থাকিয়া একটা বানরকে বিনাশ করিতেছেন । এদৃষ্ট ভক্তের নিকট  
 আপাততঃ নিতান্ত লজ্জাকর ও কলঙ্ক কলুষিত । কবি কুন্তিবাস এ দৃষ্ট  
 বর্ণনা কালে যেন নিজেই লজ্জার অঙ্গগত ও অগ্নিমাণ হইতেছেন । তিনি  
 ৮ রামকে দিয়া বলাইতেছেন ;—

“সুখীভের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম পণ্ডিত ।

তোমাতে অধিক বলা না হয় উচিত ॥

তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি লাঞ্জে ।

কমা কর কশিরাজ কেন পাড় লাঞ্জে ॥

কমা কর বীর তব দৈবের লিখন ।

আমার প্রসাদে বাহ মহেন্দ্র জুবন ॥”

কবির ন্যায়পরতা এখানে কবির ভক্তিকে পরাক্রম করিতেছে । হউন না  
 কেন তিনি ভগবান্ । তিনি বধন অন্যায় করিয়াছেন, তখন তিনি কমা  
 প্রার্থনা করিতে বাধ্য । অরুদেব ভগবান্কে বলাইয়াছিলেন ।

“অরুগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং” ।

অরুদেব ভাবিতেন প্রাণের কাছে আবার ঠাকুর দেবতা কি ? যদি প্রাণের  
 গুণে নারক নারিকার সমান অবস্থা না হইল, তবে আর প্রাণের মহিমা  
 রহিল কোথায় ? কবি কুন্তিবাস বড় ন্যায়পর । ভগবান্কে অন্যায় কার্য্য  
 করিতে দেখিয়া তিনি যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন । তাই তিনি  
 ভগবান্কে দিয়া কমা প্রার্থনা করাইয়াছেন । কুন্তিবাস আরও তারাকে  
 দিয়া বলাইতেছেন ;—

“ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ ।

কর্ম্মমত কলভোগ করে সর্বজন ॥

বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে ।

মারিবে তোমাতে রাম এই অস্বাভারে ॥”

যাহারা মনে করে, বাঙ্গালীর জন্মে ন্যায়ান্যায় বোধ অল্প, তাহারা  
 বাঙ্গালী কবির এই সাহস ময় কবিতা পাঠ করুক । ন্যায় পথে না চলিলে  
 ন্যায়পথেরও নিস্তার নাই । কোন্ দেশের কবি সাহস করিয়া এক কথা  
 লিখিতে বা ভাবিতে পারিয়াছেন ? ইন্দ্র যা করেন, তাহাই ন্যায়, অনেক

জাতিরই একরূপ বিশ্বাস । যে সমস্ত জাতির নৈতিক উন্নতি একরূপ সম্পূর্ণ হইরাছে, তাহারাই ঈশ্বরের অবতারকেও ন্যায়ের বশীভূত বলিয়া কল্পনা করিতে পারে ।

তুলসীদাস রামচন্দ্রকে এ লক্ষ্যের ফেলেন নাই । রামচন্দ্র একটা বানরের নিকটস্থ্য প্রার্থনা করিলেন, তুলসীদাস হয়ত ইহা শ্রবণেও ভাবিতে পারিতেন না । আর একটা বানর, সামান্য প্রাণ হারাইয়া রামচন্দ্রকে ভৎসনা করিবে, ইহাও ভক্ত কবির হৃদয়ে সহ্য হয় নাই । তাই তিনি লিখিয়াছেন ।

মূল ।

পড়া বিকল মহি শরকে লাগি ।  
পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগি ॥  
শ্রামগাত শির জটা বনারে ।  
অরুণ নয়ন শর চাপ চড়ায়ে ॥  
পুনি পুনি চিঠৈ চরণ চিত দীক্ষা ।  
শুকল জন্ম মানা প্রভু চীক্ষা ॥  
হৃদয় প্রীতি বচন মুখ কঠোরা ।  
বোলা চিঠৈ রামকী ওবা ॥  
ধর্মহেতু অবতরেহ গোনাই\* ।  
মারেহ ঘোহি ব্যাধ কি নাই ॥  
শুনি সহবচ কিএ করমা ।  
পরি হরি লোক বেদ কুল ধরমা ।

অনুবাদ ।

শর লাগি ভূমে পড়ে বিকল হইল ।  
সম্মুখে দেখিয়া প্রভু উঠিয়া বসিল ॥  
শ্রামাদ প্রভুর শিরে জটা লম্বমান ।  
অরুণ নয়নে কর ধনুঃশর জ্ঞান ॥  
বারম্বার দেখি, চিত্তে চিত্তে আঁচরণ ।  
প্রভুরে চিনিয়া ভাবে সকল জীবন ॥  
মনে ভক্তি, মুখে বলে কঠোর বচন ।  
রামেরে চাহিয়া কিছু করিল ভৎসন ॥  
ধর্ম হেতু অবতীর্ণ হইলা ধরায় ।  
কি কারণে ব্যাধভাবে মারিলে আমার  
শঠের শুনিয়া বাক্য কিবা এ করিলে ।  
লোক বেদকুলধর্মেরে অলাঞ্জলি দিলে ।

বালির এই ভিত্তিকার শুনিয়া রাম বলিলেন

মূল ।

অহঙ্ক-বধু, ভগিনী, স্ত্রুত নারী ।  
শুন শঠ, কম্যা সমান চারী ॥  
ইহে কুদৃষ্টি বিলোকে জোই ।  
তাহি বধে কছু পাপ ন হোই ॥

অনুবাদ ।

আত্মবধু, পুত্রবধু, তনয়া ভাগিনী ।  
এচারি সমান জ্ঞান করে বড় জানী ।  
ইহাদের করে বেবা কুভাবে দর্শন ।  
তাদের বধিলে পাপ না হয় কখন ॥

বাণী এই কথা শুনিয়াই নিজ ঘোষ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল, এবং

রামচন্দ্রের বহুবিধ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। এখানে তুলসীদাস ঘোর ঈশ্বর ভক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণিবাসের ন্যায়, তার-পরায়ণতার সমাদর নাই। ঈশ্বর কি কখন কিছু অন্যায় করিতে পারেন? তিনি বাহ্য করেন তাহাই ন্যায়, তুলসীদাস যেন এই ভাবেই কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

একণে দেখা বাউক অধ্যাত্ম রামায়ণে বালিবধের কিরূপ চিত্র প্রদত্ত হইরাছে। মুমূর্ষু অবস্থায় বালী রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।

বিলোক্য শনৈকঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়নৃ ॥

কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোহস্মাহমৃ ॥ (১)

রামকে দেখিয়া বালী মুহূর্ত্তেরে তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিল, ‘হে রাম! আমি-তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমাকে বধ করিলে।’ (১)

রাজধর্ম্মমবিস্তার গর্হিতং কস্মতে কৃতং ।

বৃক্ষখণ্ডে তিরোভূত্বা ত্যজতা মগ্নি সায়কং ॥ (২)

তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে। তুমি রাজধর্ম্ম জ্ঞান না। জানিলে কখনই এরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতে না। (২)

বশঃ কিং লপ্যসে রাম ! চোরবৎ কৃতদন্দরঃ ।

\* \* \* (৩)

হে রাম! তুমি চোরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া কি বশব্দী হইবে?

\* \* \* (৩)

ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকে হস্মিন্ কথ্যসে রথুনন্দন ।

বানরঃ ব্যাধবদ্ধস্য ধর্ম্মং কং লপ্যসে বদ ॥ (৪)

পৃথিবীতে সকলেই তোমাকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বলে। কিন্তু আমাকে ব্যাধের ন্যায় হত্যা করিয়া তোমার কি ধর্ম্ম লাভ হইল। (৪)

‘ইত্যেবং বহুভাবন্তঃ বালিনং রাঘবোহব্রবীৎ ।

ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেহস্মিৎ শ্চরামি সশরাসনঃ ॥

অধর্ম্ম কারিণং হত্যা দক্ষর্ম্মং পালয়াম্যহং ।

হৃহিতা, ভগিনী, ভ্রাতৃত্বার্থা, চৈব তথা স্মৃতা ॥

সমা যো রমতে তাস্যামেকামপি বিমুচ্যতীঃ ।

পাতকী সতু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা ॥

ভুত ভ্রাতৃঃ কনিষ্ঠস্য ভাৰ্য্যায়াম্ রমসে বলাৎ ।

অতো ময়া ধৰ্ম্মবিদা কতোহসি বন গোচর ॥

স্বং কপিভারজানীবে মহাস্তো নিচরন্তি যৎ ।

লোকং পুনান্নাঃ সঞ্চারৈ রতস্তান্নতি ভাষয়েৎ ॥'

বালী এইরূপে নানাবিধ তিরস্কার করিলে, রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন।—“আমি ধর্ম্মের রক্ষাব নিমিত্ত শরণন হস্তে পৃথিবীতে জন্ম করিতেছি। আমি অধাৰ্ম্মিককে বিনাশ করিয়া ধাৰ্ম্মিককে পালন করিয়া থাকি। হুহিতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবধু ও পুত্রবধু এই চারি সমান। যে মুখ ইহাদের কাহারও সহিত সহবাস করে সে পাতকী। সে রাজা দিগের কর্তৃক সর্বদাই বধা। তুমি বল পূৰ্ব্বক তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে উপভোগ করিতেছ। এজন্য আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। মহৎ ব্যক্তি কি ভাবে কি কার্য্য করেন তুমি কপি হইয়া তাহার কি বৃষ্টিবে মহাদাক্তির পদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়, অতএব তাঁহাদের নিন্দা করিতে নাই।”

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালী, নিজ দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল। পরে তারা আসিয়া বিলাপ করিলে, রাম তাঁহাকে নানাবিধ দার্শনিক বৃত্তি দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন।

তুলসীদাসের সহিত অধ্যাত্মরামায়ণের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। কলহঃ অনেক স্থলেই তুলসীদাসকে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। তবে, অঃ রামায়ণে রামচন্দ্র আপনাকে যেদ্রুপ ধাৰ্ম্মিক ও লোক পাবন মহাত্মা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তুলসীদাস পেরুপ কবেন নাই।

একণে দেখিতে হইবে, কুন্তিবাস, তুলসীদাস ও অঃ রামায়ণ এই তিনেরই মূল স্বরূপ বাঙ্গালীক রামায়ণে বালিবধের বিরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইরাছে।

বালীর যুদ্ধ বাত্মাকালে তারা পরামর্শ দিতেছেন।

“বিপ্রহঃমাকুথা বীর ভ্রাতা রাজন্ যবীয়স।

লালনীয়ো হিতে ভ্রাতা যবীয়ানেব বানরঃ ।

তত্ত্বাসন্নিস্থোবা সৰ্পথা বন্ধুরেবতে ।

নহি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্চামিকঞ্চন ॥”

“হে বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিও না। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ অতএব তৎ কর্তৃক লালনীয়। সে যেখানেই কেন থাকুক না, সে

যে তোমার বন্ধু তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই । এই পৃথিবীতে তাহার মত বন্ধু  
তোমার কেহই নাই ।”

বালী এই শুনিয়া উত্তর করিল—

“গর্জতোহস্য স্রসংবদ্ধং ভ্রাতুঃ শত্রৌর্বিশেষতঃ ।

মর্ষয়িষ্যামি কেনোপি কারণেন বরাননে ॥

অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেষনিবর্তিনাং ।

ধর্ষণমর্ষণং ভীক মরণাদতিরিচ্যতে ॥”

“আমার ভ্রাতা অথচ শত্রু স্রষ্ট্রীব স্পর্কার সহিত গর্জনে করতঃ আমাকে  
যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে । আমি কেন তাহার স্পর্ক সহ করিব । যাঁহা-  
দিগকে কেহ কখন পরাজিত করে নাই, যাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে কখন  
প্রতিনিবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা মরণের আশঙ্কা থাকিলেও কাহারও অপমান  
সহ করিতে পারেন না ।”

মৃত্যুর পূর্বে নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা রামকে ভিরঙ্কার করিয়া  
ছিলেন ।

“পরাম্ভুখ বধং কৃত্বা কোহজপ্রাপ্ত স্তয়া গুণঃ ।

যদহং যুদ্ধ সংরুদ্ধং কৃতে নিধনং গতঃ ॥

কুলীনঃ সত্বসম্পন্ন স্তেজশী চরিতব্রতঃ ।

রামঃ করুণ বেদীচ প্রজানাং চ হিতৈরতঃ ॥

সাহুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দূতব্রতঃ ।

ইত্যেতৎ সর্কভূতানি কথয়ন্তি যশো ভূবি ॥

দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো দ্রুতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ ।

পার্শ্ববানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশাস্ত্যপকারিবু ॥

তান্ গুণান্ সংপ্রার্থ্যাহং অধ্যাক্ষাভিজনং তব ।

ভারয়া প্রতिसিদ্ধঃ সন্ শ্রুতীবেন সমাগতঃ ॥

নমামনো ন সংরুদ্ধং প্রমত্তং বেদুমহর্ষি ।

ইতি তে বুদ্ধি ক্রুৎপন্ন্য বভূবাদর্শনে তব ॥

সত্বাং বিনিহতাস্ত্বানং ধর্মধ্বজমধামি কং ।

জানে পাপসমাচারং তুণৈঃ কুপমিবাবৃত্তঃ ॥

সত্বাং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্ন মিব পাবকং ।

নাহং স্বামতিজানামি ধর্মহৃদাভিসংবৃত্তং ॥”

শঠো নৈকৃতিকঃ ক্রুদ্ধো মিথা প্রশ্রিতমানসঃ ।

কথং দশরথেনত্বং জাতঃ পাপো মহান্নন ॥”

“হে রাম ! আমি যৎকালে অশ্বের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলাম, তখন আমাকে গুপ্তভাবে বধ করিয়া তোমার কি গুণপনা প্রকাশ হইল । লোকে তোমাকে সৎজাত, বলবান, তেজস্বী সদাচার, দয়াময়, সর্বহিতে রত করণ স্বভাব, উদ্যমশীল, দেশকালপাত্রজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত বলিয়া জানে ও বলে । আমি তোমার এই যশ শ্রবণ করিয়া এবং তোমাকে রাজগুণালঙ্কৃত ( শম, দম প্রভৃতি গুণালঙ্কৃত ) ভাবিয়া তারার নিষেধ বাক্য অবহেলা করতঃ স্ত্রীসেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । তোমাকে দেখিবার পূর্বে আমি ভাবিয়াছিলাম যে তুমি কখনই আমাকে ( অশ্বের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া ) অসাবধান অবস্থায় বধ করিবে না । কিন্তু আমি এক্ষণে দেখিতেছি যে, তুমি নিতান্ত দুর্বল, ভণ্ড, অধাৰ্মিক, পাপিষ্ঠ ও তৃণাচ্ছন্ন কূপের স্তায় লোকপ্রতারক । তুমি সতের বেশ ধারণ করিয়া পাপাচরণ করিতেছ । তুমি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিজের পাপাভিলাষ গোপন করিয়া ধার্মিকের বেশে বিচরণ করিতেছ । আমি তোমার প্রকৃত স্বভাব বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি শঠ পরাপকারী তুমি লোকের নিকট প্রশান্তমানস বলিয়া পরিচিত । তুমি ক্রুদ্ধচিত্ত । মহাত্মা দশরথের গুণসে তোমার ন্যায় পাপী কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল ?”

এই ভিরস্কার শ্রবণে রাম উত্তর দিতেছেন ।

“ঈক্ষাকৃণামিঃ ভূমিঃ সশৈলবন কাননা ।

মুগপক্ষিমুযাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষপি ॥

তাং পালয়তি ধর্ম্মায়া ভরতঃ সত্যবানুজুঃ ।

ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহেরতঃ ॥

তস্য ধর্ম্মকৃতাদেশা বধমনোচ পার্ধিবাঃ ।

চরামো বনুধাং কুৎস্নাঃ ধর্ম্মসন্তান মিহবঃ ।

যশ্চিন্মুপতি শর্দ্দীনে ভরতে ধর্ম্মবৎসলে ।

পালয়তা খিলাং পৃথীং কশ্চরেধর্ম্মবিপ্রিয়ং ॥

দ্রুত সংক্লিষ্ট ধর্ম্মশ্চ কশ্মণা চ বিগর্হিতঃ ।

কামতত্ত্ব প্রধানশ্চ নস্মিতো রাজ বর্মানি ॥

স্বাৰ্ঠভ্রাতা পিতাবাপি যশ বিদ্যাং প্রযুক্তি ।

এরন্তে পিতরোজ্জেষ্মা ধর্মৈচ পথি বর্জিনঃ ॥

যবীরানাম্বনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ ।

পুত্রবৎ তে এরশ্চিহ্ন্যঃ ধর্মশ্চৈবাত্র কারণং ॥

তদেতৎ কারণং পশু যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ ।

ভ্রাতুর্বর্জসিভার্ষ্যারঃ ভ্যক্তা ধর্মো সনাতনঃ ॥

ভ্রাতৃত্বস্য তেধর্মোইং কামবৃত্তস্য বানর ।

ভ্রাতৃভার্ষ্যাভিমর্শেন্নিন্দিতোরং প্রতিপাদিতঃ ।

ভ্রাতৃসীঃ ভগিনীং বাপি ভার্ষ্যাং বাপ্যমুজসারঃ ।

প্রচরেত নরঃ কাম্যং তস্য দণ্ডো বধঃ শ্বতঃ ॥

ভরতস্ত মঞ্জীপালো বরং হাদেশবর্জিনঃ ।

ত্বঞ্চ ধর্মাদিতিক্রান্তঃ কথং শক্যং উপেক্ষিতুং ॥

২। প্রতিজ্ঞাচ মরাদত্তা তদা বানর-সন্নিধৌ ।

প্রতিজ্ঞাচ কথং শক্যং মদ্বিধেমানবেক্ষিতুং ॥

৩। অরতাং মমুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিএবংসলৌ ।

গীতৌ ধর্মকুশলৈ শুখা তচ্চরিতং ময়া ॥

রাজভিগ্নতদশাশ্চ কুহা পাপানি মানবাঃ ।

নির্মলাঃ স্বর্গমারান্তি সন্তঃ স্মৃতিনো যথা ॥

শাসনাবাপি যোক্ষাস্বা স্তেনঃ পাপাং প্রযুচ্যতে ।

রাজাত্মশাসনাত্মন্য তদবাপ্রোক্তি কিম্বিৎ ॥

৪। বাস্তবাত্মশ পাশৈশ্চ কুটৈশ্চ বিবিধৈ নরাঃ ।

প্রতিজ্ঞাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্তি স্রবহুন্ মুগান্ ॥

প্রথাবিতান্ বা চিত্রস্তান্ বিশ্লকান্ ভিবিষ্টিতান্ ।

প্রমত্তান প্রমত্তান্ বা নরা মাংসানিনোভুশং ।

বিধ্যন্তি বিমুখাংস্তাপি নচ দোষোহত্র বিদ্যতে ॥”

রামচন্দ্রের উত্তরটিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাউতে পারে । যথা—

(১) এই পৃথিবীর সমস্ত শৈল, কানন, বন, ইক্ষাকু বংশীর রাজগণের সম্পত্তি । অত্রই পশু পক্ষী সমুদ্রা এ সমস্তকেই নিগ্রহ বা অঙ্গগ্রহ করিবার অধিকার ভাঁহাদের আছে । সত্যবান্, সরল, ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, পাপীর শাস্তা, পুণ্যবানের অঙ্গগ্রাহক, ধর্মীরা ভরত একপে এই পৃথিবী শাসন

করিতেছেন। আমি ও অন্যান্য রাজারা ভরতের আদেশে পৃথিবীতে ধর্মরক্ষা করিবার জন্য বিচরণ করিতেছি। ধর্মবৎসল ভরত রাজা থাকিতে, কাহার সাধ্য যে পাপাচরণ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে? তুমি অধর্ম পথ অবলম্বন করিয়া ধর্মের অমর্যাদা করিয়াছ। তুমি রাজনীতি বিষয়ে হইয়া কেবল কাম ভোগের অবেষণ করিয়াছ। দেখে যেওঁ জ্ঞাতা, শিষ্টা, ও শিক্ষক এই তিনই তুল্য সম্বানার্থ। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশু ও পুত্র এই তিনই তুল্য স্নেহের পাত্র। তুমি সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে অহরন্তর হইয়াছ। এইজন্য আমি তোমার বধ করিয়াছি। যে ব্যক্তি কন্যা, ভগিনী, বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে আশক্তি করে, সে সৃষ্টির আদেশ অনুসারে বধ্য হয়। আমি ভরত রাজার আজ্ঞাকারী হইয়া তোমার পাপাচরণের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

(২) এতদিন আমি সর্ব বানর সমক্ষে তোমার বধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপালনে বিরত হওয়া আমার ন্যায় লোকের পক্ষে অসম্ভব।

(৩) মনুতে ধর্মের উপকারক ও ধার্মিক ব্যক্তি কতৃক অহুমোদিত দুইটি শ্লোক আছে। আমি ঐ শ্লোক অহুসারে কার্য্য করিয়া তোমাকে বধ করিয়াছি। ঐ শ্লোক দুইটি এই।

পাপী, রাজা কতৃক দণ্ডিত হইয়া, পাপ মুক্ত হয়, এবং পাপমুক্ত হইয়া সে সাধু পুণ্যবানের ন্যায় স্বর্গারোহণ করিতে পারে। ডোর, রাশি কতৃক শাসিত বা মোচিত হইলে উহার পাপশাস্তি হয়। কিন্তু যদি রাজা পাপীর পাপ সম্বন্ধে কোন রূপ বিচার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপীর পাপ সমস্ত বহন করিতে হয়।

(৪) মনুয্যেরা পাপ (রজু), জাল প্রভৃতি নানাবিধ নৃপবস্ত্র ধারি কখন বা প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে পশু পক্ষী মৃগয়া করেন। তন্মতে পলায়মান, ভীত, বিব্রক, স্বপালিত মৃগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত সাবলিত বা অসাবধান একে যে কোন অবস্থাতেই পশুপক্ষী সংহার করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন পাপ হয় না।

ইহার পরে রাম তারার নিকট হইতে আরও কিঞ্চিৎ মিষ্ট ভৎসনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁরা কতৃক শাপের কোন কথা বাস্তবিকিতে নাই।



বালি বধের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি ?

(১) বাল্মীকিতে রামচন্দ্র এক জন ধার্মিক বীর পুরুষ মাত্র । তিনি অবতার বলিয়া আপনাকে বর্ণনা করেন নাই । তিনি রাজা, পুণ্যের প্রবর্তক এবং পাপের শাস্তা । তিনি বলিতেছেন, আমি রাজা, রাজার ন্যায় আচরণ করিয়াছি । এবং হিন্দু শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে নিয়মও এই । যিনি যখন যে জন্মে অবতীর্ণ হন, তিনি তখন সেই জন্মোচিত কার্য্য করেন । সে জন্মের যে কর্তব্য কার্য্য তিনি তাহাই সম্পাদয় করেন । ভগবান্ বলিয়া তিনি আপনাকে নিজ জন্ম, নিজ জাতি, নিজ বর্ণ, নিজ আশ্রম, প্রভৃতির বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না । রাজা পাণ্ডীর শাস্তি করেন, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন । রাজা মনুর নিয়ম পালন করেন, রামচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন । রাজা বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে যুগয়া করেন, রামচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন । বাল্মীকি যে রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না তাহা নহে । বাল্মীকি অন্যকে দিয়া বারংবার রামচন্দ্রকে ভগবান্ বলিয়া বলাইয়াছেন । তবে বাল্মীকির বক্তব্য এই যে, যখন নারায়ণ বিষ্ণুরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থিত, তখন তাঁহার কর্তব্য কার্য্য স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার কার্য্য প্রণালীও স্বতন্ত্র । কিন্তু ঐ ভগবানই যখন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র ও কর্তব্য কার্য্য স্বতন্ত্র হইল । সদয় হৃদয় বুদ্ধ ও নির্দয় হৃদয় পরশুরাম এ উভয়ই ভগবানের অবতার । তিনি যখন সদয় সন্ন্যাসী, তখন তাঁহার হৃদয় দয়ার পরিপূর্ণ । এবং যখন তিনি নির্দয় ব্রাহ্মণ, তখন তাঁহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই । একই ভগবানে সদয় ও নির্দয় এই দুই বিশেষণই আরোপিত হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে অবতার বিশেষে ভগবানের চরিত্র, কর্তব্য কার্য্য, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে । রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা । তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে রাজনীতি ও ক্ষত্রিয় নীতিকে আমাদের আদর্শ করিতে হইবে । বাল্মীকি ও তাহাই করিয়াছেন । এইরূপ করাতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্য উভয়ই সুন্দররূপে সংরক্ষিত হইয়াছে ।

২ । অধ্যাত্ম রামায়ণকার ও তুলসীদাস ভক্ত । রামচন্দ্রের মূর্তি তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক কক্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে । রামচন্দ্রের ভগবত্ব

তঁাহারা একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন না । ভগবানের সহিত তদবতারের যে পার্থক্য, তাহা তঁাহারা বিস্মৃত হইয়া যান । যখন ভক্তিতে হৃদয় উদ্বেলিত হয়, তখন অত সূক্ষ্ম তথের প্রতি লক্ষ্য রাখাও যায় না । তখন কেবল এই কথাই মনে থাকে যে রামচন্দ্র পূজ্য ও আরাধ্য এবং আমরা তাঁহার পূজক ও সেবক । বাল্মীকি নিজ ভক্তিকে সংযমিত করিতে পারিতেন । ইহারা তাহা পারিতেন না । এইজন্য বাল্মীকির সহিত ইহাদের প্রভেদ দৃষ্ট হয় । তাহার পরে আমাদের কৃতিবাস । ইনিও রামচন্দ্রের ভগবন্তা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । অবতারকে ভগবানের স্থলে দণ্ডায়মান করা-ইয়া কৃতিবাস, উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিলেন, দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন । তাঁহার কাব্যে ঐ ব্যথার "পরিচয় স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় । রামচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া ভাবিলে, বালি বধে কিছুই লজ্জার বিষয় থাকে না । কিন্তু কৃতিবাস তাহা না করিয়া রামচন্দ্রকে ভগবদুচিত নীতির দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন । এই পরীক্ষায় কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দেখিয়া কৃতিবাস যথা সাধ্য সেই অসামঞ্জস্য পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন ।

(৪) কিন্তু কি নীতি, কি ধর্ম, কি কাব্য, সর্বাত্মশেই বাল্মীকি নিরবদ্য ও নির্দোষ । এক জন ফরাসিস্ লেখক রামায়ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"It is an immense poem, as wide as the Indian Ocean.

It is a book of divine harmony, without a breath of discord."

এই মহাকাব্য ভারত সাগরের ন্যায় অনীম । ইহাতে স্বর্গীয় সামঞ্জস্য বিরাজিত আছে । ইহার কুত্রাপি বিলুপ্ত সামঞ্জস্য নাই ।" যিনি বাল্মীকির অজস্র পথ হইতে বিলুপ্তাও পরিচালিত হইয়াছেন, তাঁহাতেই কোন না কোন প্রকারের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে ।

## সৃষ্টি অনাদি ।

মহুবার কতিপয় অঙ্গ এক বলি খাত । যথা কঠ, উদর, বক্ষঃ প্রভৃতি ।  
এই অঙ্গ নাই অথচ মহুবা জীবিত রহিয়াছে, ইহা, কখন দৃষ্টিগোচর হয় না ।  
অপর কতিপয় অঙ্গ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত, যথা অঙ্গুলি জ প্রভৃতি ।  
উহাদের অভাবেও মহুসের জীবন রাখিতে হয় না ।

মানব দেহে যজ্ঞপ প্রাকৃত্ত্ব দ্বিবিধ অঙ্গ বিরাজমান । ধর্ম' সম্বন্ধে ও  
যজ্ঞপ দ্বিবিধ, সত্য পরিলাক্ষিত হয়; উহার কতিপয় সত্য আছে; বাহাতে  
বক্ষিত হইলে, লোকের ধর্ম' সংস্কার নিতান্ত দুর্বিভ, এবং নাস্তিকতার পরিণত  
হয়; অপর কতিপয় সত্য আছে; বাহাতে জ্ঞাত হইলেও লোকের নাস্তিকতা  
রূপ ভীষণ অবস্থার উপনীত হইতে হয় না । ইহার প্রথমোক্ত সত্য গুলি  
এক সত্য এবং দ্বিতীয় গুলি অঙ্গব সত্য বলিয়া গণনীয় ।

আমাদের সামান্য বিবেচনার "সৃষ্টি অনাদি" ইহা একটি এক সত্য—বাহার  
ইহাতে ভ্রম ও অবিশ্বাস আছে, তাহাকে নিশ্চয় দারুণ মোহে নিপতিত হইয়া  
ভূতবাদ ও নাস্তিকতার উপনীত হইতে হয় । অতএব এতদ্বিময়ে বাহাতে  
লোকের ভ্রম অপনীত হয়, তদ্বিময়ে যত্নকরা সর্বতোভাবে বিধেয় । আত্মন,  
আমরা প্রথম দেখি এই বিষয় আগমোক্ত প্রমাণ কি ?

কঠোপ নিষদের ৬ষ্ঠ বাক্যের প্রথম এই—

‘উর্দ্ধমূলোহবাকৃশাখ এবোহমখঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্বৃকতদেবাস্মৃত মুচ্যাতে ॥’

এই অনাদি অনন্ত সংসার বৃক্ষের মূল উর্দ্ধ ;—অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণ;  
ইহার শাখা অধোগত অর্থাৎ স্বর্গ নরক ভূলোকাদি রূপে অবস্থিত ঐ মূল  
শুক্র অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তন্যময়, মহৎ হইতে মহৎ এবং অমৃত বলিয়া অভিহিত ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার ১৫শ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট এই কথা  
বলিয়াছেন—

উর্দ্ধমূল মধঃশাখ মধঃখং প্রাচীর ব্যয়ং ।

হৃদ্যাহনিস্যস্য পর্ণানি বস্ত্রঃবেদ সবেদবিদ্ ॥ ২।

এই সংসার প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষ; অর্থাৎ অর্থাৎ অনা একরূপে অবস্থিত, এবং  
দিনান্তরে রূপান্তরে পরিণত স্মৃতরূপ বিনশ্বর; অথচ অমৃত, অর্থাৎ প্রবাহরূপে

নিষ্ঠা ; ইহার মূল উৰ্দ্ধ পুরুষোত্তম নারায়ণ ; এবং শাখা হিরণ্য গৰ্ভাদি স্তম্ভপর্যন্ত ক্রমে অধোগত ; বেদ সকল ইহার পত্র, কারণ ছায়া স্থানীয় বেদোক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয় হইয়াছে । যিনি এইরূপ সংসারকে জানেন তিনিই বেদার্থ বুঝিতে পারেন । তিনি স্পষ্টতর রূপে ইহার অনাদিত্ব প্রতিপাদনের জন্য পরে বলিয়াছেন ।

নরূপ মন্যেহ তথোপলভ্যাতে নাস্তে । নচাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অর্থমেনং সুবিরূঢ় মূল মঙ্গল শাস্ত্রেণ দৃঢ়েন হিহা ।

ভভঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যশ্বিন্ গতা ন নিবর্তন্তিভূয়ঃ ।

সংসারবাসী জীবগণ ইহার উৰ্দ্ধ মূলত্বাদি ভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, ইহার অন্ত নাই, আদি নাই এবং সংপ্রতিষ্ঠা, একরূপে অবস্থিতিও নাই ; সুবিরূঢ় মূল সংসার বৃক্ষকে দৃঢ় বিবেক অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া, ইহার মূলভূত পরম বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে । যাহা লাভ করিলে, আর ভব বন্ধণার প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ।

“সৃষ্টির আদি নাই” আন্তিকতার এই ধ্রুব অঙ্গ, সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় । দেখুন স্বারস্তুব মমু কি বলিয়াছেন—

মহত্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ ।

ক্ৰীড়ন্তিবে তৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥

মহত্তর সৃষ্টি ও সংহার ইহার কিছুই সংখ্যা নাই ; অধ্যাপক অধ্যাপন-কালে যে কর সঞ্চালনাদি করেন—উহাতে যেমন বিশেষ আয়াসও নাই উদ্দেশ্যও নাই ; পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাও, তজ্জপে পুনঃ পুনঃ এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন । ইহাতে তাহার কোনও আয়াস বা উদ্দেশ্য কিছু নাই ।

পূৰ্ব্বোক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিলে “সৃষ্টির আদি নাই” ইহা যে আগমগিদ্ধ তাহা অনায়াসে প্রতীত হইবে ।

এইক্ষণ বিবেচনা করা আবশ্যিক—ইহার সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের কতদূর সম্বন্ধ ?

যাহারা “সৃষ্টি অনাদি” ইহা না বুঝিয়াছেন, তাহারা আর একটি বৈদিক ভাষ্য বোধ করিতে অক্ষম । তাহা কি ? প্রোক্ত্যভাব—পুনর্জন্ম ।

যথা কঠোপনিষদ্ পঞ্চম ব্রহ্মী ৭ম সূক্ত ।

ধোনিমগ্নে প্রপদ্যন্তে শরীরস্থায় দেহিনঃ ।

স্থানুম্নোহন্নসংযন্তি যথা কশ্ম যথা ক্ষতম্ ।

যে সকল জীব ব্রহ্মজ্ঞান বিধুর, তাহারা শরীর দ্বীপ কশ্ম ও ক্ষত অনুসারে শরীর ধারণের নিমিত্ত, মাড়ুয়োনিতে প্রবেশ করে ; অন্যেরা স্থাবর-ভাব আশ্রয় করে ।

তাহারা বলিবেন—যদি কৰ্ম্মানুসারে জীব জন্ম ধারণ করে, তবে প্রথম সৃষ্টির কালে জীবের জন্ম হইল কেন ? “সৃষ্টি অনাদি” এই বৈদিক তত্ত্বে যাহার আস্থা নাই, তাহার মনে স্মৃতরাং এই বিতর্ক উপস্থিত হইবে বাধা কি ?

ইহার পর সে মনে করিবে—যদি প্রথম জন্ম, প্রাক্তন পাপ পুণ্য ব্যক্তি-  
রেকে, হইয়াছে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল ; তবে বর্তমান জন্ম  
ভজ্ঞপে হইয়াছে ইহা স্বীকার করাই যুক্তি যুক্ত । এবং তাহা হইলে পূর্বে  
আমাদের নানা জন্ম অতীত হইয়াছে, এই প্রকার অনাবশ্যক জন্ম পরম্পরা  
স্বীকার না করিয়া—ইহা আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম এই প্রকার স্বীকার  
করিতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না । অতএব ইহাই আমাদের প্রথম ও শেষ  
জন্ম, এই সিদ্ধান্তে লোক উপস্থিত হয় । এই এক জন্ম বাদ নাস্তিক খৃষ্টান  
ও ব্রাহ্মণগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত নাস্তিকগণ  
মনে করেন—যদি শূন্য হইতে আত্মা উৎপন্ন হইতে পারে—তবে দেহ  
পাতের পর, উহা পুনরার জন্মদেহার উপস্থিত হইবে ইহাতে বাধা কি ?  
সুতরাং অপ্রামাণিক পারলৌকিক দণ্ডভয়ে, মুখকর অর্থকাম পরিত্যাগ  
করা বিবেচকের অকর্তব্য ।

স্বাৰ্জ্জীব্যং সুখং জীবৎ স্বপ্নং কৃত্বা যতঃ পিবেৎ । ইহা হইতেই  
“যত কাল জীবন থাকে, তাবৎ সুখে থাকিতে হইবে, স্বপ্ন করিয়াও যত  
পান করিতে হইবে” এই সুসভ্য মত প্রচারিত হইয়া উঠে ।

আমরা কোন ধর্মের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করি না; আমাদের অভিপ্রায়  
এই যে, বৈদিক সনাতন সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে, লোক কিরূপ  
বিপন্ন হয় তাহা প্রদর্শন করা—সুতরাং অতঃপর খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম দিগের  
কোন নাম উল্লেখ না করিয়া, প্রাক্তন একজন্ম বাদ হইতে কি কি ভ্রমে  
পতিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিব ।

আমাদের বিশ্বাস বাধা । একজন বাবটাবক্স রহিয়াছেন, সর্বতোভাবে  
পর-প্রত্যয়-নেয় বুদ্ধি হয় নাই—তাহারা স্ব স্ব ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলে  
সংশোধন করিয়া আমাদের শ্রমার্থক করিবেন !

এই এক জন্মবাদ হইতে আর একটি সনাতন সত্য সংশয় উপস্থিত হয়  
তাহা এই ভগবান্ বলিতেছেন—

সনোহং ন মভূতেশু ন মে দেব্যোহস্তি ন পিতরঃ । গীতা ৯।২৯ ।

আমি সকল জীবের পক্ষে সমান, আমার নিকট কেহ দেবোও নহে  
প্রিয়ও নহে । বোধ হয় আস্তিক মাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক ।  
কারণ যিনি স্বীয় চক্ষু ক্রমলীন করিয়া চতুর্দিক দৃষ্টিগত করিয়াছেন, তিনিই  
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীতে জীবের এতাদৃশ অনেক সুখ ও দুঃখ  
দৃষ্টিগোচর হয়; যাহার কারণ রূপে তাহাদের ঐহিক কোনও মুক্ত হুক্ত  
অনুমিত হইতে পারেনা ।

এই বিষয় সময়সার সীমাংসার অপায়গ কতিপয় সম্প্রদায়, আর এক  
অবৈদিক সিদ্ধান্তের শরণাগত হইয়াছেন—তাহা এই যে, একজন ব্যক্তি  
পাপ করিয়াছে তাহার নিমিত্ত ঐ পাপের অনুষ্ঠান কালে, যাহার কোথাও  
অস্তিত্ব ছিল না এবং তাহার পক্ষে সম্ভাব্য করিয়াছে, তাহাকে দণ্ডিত  
হইতে হইবে ।

যেমন পিতা কোন অন্যায় কর্ম করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময় নিতান্ত অজ্ঞাতসারে, তাহার অন্য পুত্রকে দণ্ডিত হইতে হইবে। ইহা আবার এতদূর অগ্রসর করা হইয়াছে, যে বহু শতাব্দী পূর্বে কোন ব্যক্তি, এক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যে আমি অনুমোদন করি নাই, তাহাকে, আমি দেখি নাই, তাহার সন্তান আমার বিশ্বাস নাই অধিকন্তু একজন বাদ অনুসারে তৎকালে জগতের অতি দূরবর্তী প্রদেশেও আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না, যদি তিনি আমাদের পূর্ব পুরুষ হয়েন, তবে কত শত বার হোমিওপ্যাথিক ডাইলিসিসনেরপর, তাহার শোণিতের কণিককণা আমাদের দেহে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতেও ঐ কার্য্যের জন্য আমাদের পাপ হইয়াছে এবং দণ্ডিত হইতে হইবে, এইমত প্রচার করিতে কত দরিদ্রের শোণিত শোষণ পুরঃসর আশ্রিত অর্থেরব্যয় হইতেছে; তাহার সংখ্যা নাই।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে, আমরা কোন পাত্রের মুখে নিয়মিত দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই—

অস্বচ্ছালক মিত্র মাতুল সুতা মিথ্যাভিশঙ্ক্য পঠৈ স্তম্ভস্যম্ বশানয়্য স্বর্গহিণী প্রেরস্যাপি প্রোজ্বলিতা ।

আমার যে শ্যালক তাহার যে মিত্র, তাহার যে মাতুল তাহার কস্তার প্রতিকূলে শত্রুগণ এক অলীক অপবাদ রটনা করিয়াছিল, উহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আমি প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমাদের সামান্য বিবেচনার প্রাপ্ত অবৈদিক সম্প্রদায়, ভগবানের দণ্ড বিধানের যে নীতি, জগতে প্রচার করিতেছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে ভাৰ্য্যার পরিত্যাগরূপ দণ্ড বিধাতা, কোন প্রকারে উপহাসের বোধ্য হইবেন-এইরূপ বোধ হয় না।

এই প্রকার বিশ্বাস হইতে আর একটি অবৈদিক বিশ্বাস বহুলোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, বাহার সমকালে আমাদের কোন প্রকার সন্তা ছিল না, বাহার সহিত আমাদের কোন রক্ত সম্বন্ধও নাই তিনি বহুশতাব্দী হইল, এক প্রারম্ভিত করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রারম্ভিত হইতে পারিকে। শাপও প্রকালিত হইবে। মন্দ নয়, যে দরে ধরিদ সেই দরে বিক্রী !

এই বিষয়ে সনাতন ধর্মের সত্য এই—

একঃ প্রজারতে হৃদয়েক এব প্রণীয়তে ।

একোহমুভুক্তে হৃদয়ে এক এবতু হৃদয়ে ।

মনু ৪। ২৪০ ।

আমি একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় পায়। একাকী স্ব স্ব স্বকৃত ও হৃদয়ের কল ভোগ করে।

এখন পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখুন এই সত্য ধর্ম্মানুমোদিত সিদ্ধান্ত কিরূপ ভ্রান্তরোপেত ও অসঙ্গত।

কতিপয় সম্প্রদায়—অপাংমধ্যেতদ্বিবাংসংতৃকাবিজ্ঞবিত্তরং—ভারতবর্ষে বাস করিয়া সনাতন সত্যে বঞ্চিত। তাহারা অন্ত কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণে “সৃষ্টির অনাদিষ জন্মান্তর, প্রাক্তন পাপ পুণ্য, কিছুই স্বীকার করেন না। কেন বিনাদোষে ও বিনাভগ্নে লোকে নামাবিধ ক্রেশ ও স্রুথ ভোগ করে? সৃষ্টির এ বিচিত্র বৈষম্যের কারণ কি? তাহারা এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা করিতে পারেন না, কেহ কেহ “অখখামা হত ইতি গজ” গোছের এক উত্তর করিয়া, নির্ণয়ের চিত্তকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা জগতের স্রুথ হুংখাদি বৈচিত্র্য আকস্মিক এই দৃষ্টান্তে বিশ্ব সংসার আকস্মিক বিবেচনা করিয়া, ভয়াবহ নাস্তিকতায় নিপতিত হইলেন, অপ-  
রেণ সৃষ্টি অনাদি পুনর্জন্ম প্রাক্তন পাপ পুণ্য—এই সকল সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ভগবানের বিশ্বরাজ্যকে ভবচক্র রাজার রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

প্রাক্তন সম্প্রদায়ের পারলৌকিক সিদ্ধান্তও চমৎকার!

ইহাদের মুতে পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেই স্মৃত্যুর পর উন্নততর আধ্যাত্মিক জগতে’ অর্থাৎ ভগবানের স্বদেশীয় রাজ্যে উপনীত হইয়া থাকেন, কলতঃ বাহারা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না তাহাদিগকে, হয়, নাস্তিক হইতে হইবে? না হয় এই প্রকার একটা কিছু করনা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন গতি নাই। স্মৃত্যুং লিখি না লিখি সকলেরই দারগুগিরি নিশ্চয় আছে। এই সকল মত যে, নিতান্ত পাপাচারের পরিপোষক তাহা অনারাসেই প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান সময়ে যে পাপ প্রবাহ শত মুখে প্রবাহিত হইতেছে এই সকল অবৈদিক মত প্রচারই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। বৈদিকতত্ত্ব সকল উপেক্ষিত হইলে, বিশ্বসংসার ভ্রান্ত শৃঙ্খলজট ও অন্ধকারময় এবং লোক সমাজ নিশ্চয় কুসংস্কারময় হইয়া পড়ে।

হে ভূতভাবন নারায়ণ! তুমি তোমার সনাতন সত্য প্রচার করিয়া পত-  
নোন্মুখ মানব সমাজকে রক্ষা কর।

আগমিক একটি সত্যকে উপেক্ষা করিলে, লোকের কিরূপ বিপদ হয় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইল; বিত্তীয় প্রজ্ঞাবে সৃষ্টি অনাদি এই বিষয়ে সাধক ও বাধক প্রমাণ পর্যালোচিত হইবে।



২য় ভাগ

১২৯৪ সাল

৬ষ্ঠ খণ্ড

## সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব পরীক্ষা ।

যাহারা ভগবানের অচিন্তনীয় কৌশলে ক্রতি প্রতিপাদিত ভাবে বঞ্চিত ; তাহারাও এই পর্যন্ত অবগত আছেন যে,—যে কাল, অতীত ভাগে অনাদি, ভবিষ্যৎশে অনন্ত, মধ্যভাগে সাগরদ্বয়ান্তর্গত যোজক-কল্প বর্ত্তমান রেখা দ্বারা বিভক্ত ; যে দিক্ বামে দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, উর্দ্ধে ও অধোমুখে পরিধিহীন বৃত্তাকারে, অনন্তরূপে বিস্তীর্ণ, সকল ব্যক্তিই মনে করে যেন সে উহার কেন্দ্রস্থানে বিরাজমান ; ইহাদের কোথাও এমন একটু ক্ষণ নাই এবং এমন একটু অবকাশ নাই—যাহাতে ভূতভাবন বিখনাথ অবর্ত্তমান বা অনাগন্ন রহিয়াছেন, ইহা সত্য ইহা বৈদিক ।

সর্বান ন শিরোগ্রীবঃ সর্বভূত গুহাশয়ঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ।

শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রঃ । \*

\*এই অসীম জগতের সমস্ত পদার্থই তাঁহার মুখ, আনন এবং গ্রীবাস্বরূপ । তিনি সকল জীবের বুদ্ধি রূপ গুহায় শয়ান রহিয়াছেন, অতএব সেই শিব সর্বব্যাপী ও সর্বগত ।



পূরুষ জগতে এমন অনেক লোক আছেন, কেবল লোক কেন? অনেক জাতিও আছে—যাহারা মনে করেন যে ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বর ছিলেন না; তাঁহার ঈশ্বরত্বের গৌরব কতিপয় সহস্র বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে ওৎ-ওৎ পূর্বে তিনি কখনও সৃষ্টি করেন নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদ বিরুদ্ধ এবং অসত্য।

সূর্য্যাদি মসৌধাতা যথা পূর্ব মকল্পয়ৎ।

দিবঃ চ পৃথিবীঋতুরিহ যথোদয়ঃ।

অনন্তর বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ভূলোক, অন্তরিক্ষ এবং বর্গ পূর্ব-বৎ সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদোক্ত এই অঘমর্ষণ সূক্তে “যথাপূর্ব্বং” এই পদ দ্বারা স্মৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে অনাদি বিধাতার কার্য্যও অনাদি।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাঃ স্তর্কেণ যোজয়েৎ।”

জগতে কতগুলি বিষয় আছে—যাহাঁ চিন্তার অতীত; উহা তর্করূপ তুলানিতে আরোপণ করিতে নাই। তদ্বিষয়ে আগম প্রমাণই আশ্রয়ণীয়; কিন্তু এতদ্বশে, কতিপয় ব্যক্তি জব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলেই সমুদয় তত্ত্ব নিশ্চয় ও কর্তব্য অবধারণ করিতে উদ্যত। তাহা-নিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন মক্ষিকাগণ পক্ষ পাত দ্বারা, আচক্রবালব্যাঙ্গী মেঘমালাকে অপসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বাহা হউক, বাহাদের কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, তাহাদের সহিত সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব বিষয়ে তর্ক করিতে হইবে; সুতরাং আমাদের এই বিবয়ে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ সম্ভব হয় না; রথে আরোহণ করিয়া নীরথ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা, ভারতবর্ষে, চিরকাল নিল্লেয়।

## বিচার।

হেতু। বৈদিক আর্ধ্যগণ বলেন “বিধাতা চিরকালই বিধাতা এবং তাঁহার সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি এবং রেখ ও তদনুচিকীর্ষ ব্যক্তিগণ, বলেন—ঈশ্বর কতিপয় বর্ষ হইল বিধাতা হইয়াছেন এবং তাহার সৃষ্টি নাদি—এই পরস্পর বিরোধী বাক্য অনিত্য সংশয় বিচারের হেতু।

বিচারের প্রয়োজন ?—আর্য্যগণ পক্ষে সৃষ্টির প্রবাহের অনাদিক স্বীকৃত না হইলে অস্বাভাব্য প্রমাণীকৃত হয় না, উদভাবে শাস্ত্রে ও ঈশ্বরের ন্যায়-পরতায় এবং পরিপূর্ণতার অবিস্থান হয় ; এবং তদ্বিবন্ধন পাশভয় ও পুণ্যা-মুরাগ শিথিলীভূত হয় বলিয়া, লোক বথেষ্টাচরণ দ্বারা অধোগতি লাভ করে, তদ্বিধারণ বিচারের প্রয়োজন ।

শ্রেষ্ঠ ও তদনুচিকীর্ষগণের পক্ষে সৃষ্টিপ্রবাহসাদি হইলে, শাস্ত্রে অবিস্থান হয় ; এবং তাহা হইলে লোক স্বাধীনভাবে অমুরঞ্জন পূর্বক যুযুতি বিবাহ, বথেষ্ট ভাবে আহার, বিধবার সংযম ভঙ্গ ; এবং পরস্পর অসামঞ্জস্য, দাম্পত্য বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সভ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই প্রয়োজন ।

সৃষ্টি প্রবাহের সাদিভবাদিগণের বৃত্তি । যাহার প্রত্যেকের বে ধর্ম থাকে, উহার সমুদায় সেই ধর্মাক্রান্ত হয় ; দৃষ্টান্ত—যদি বস্ত্রের প্রত্যেক সূত্র ধবলবর্ণ হয় তবে সমুদয় বস্ত্রই শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে । অতএব সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ সাদি স্ততরাং সমুদায় সৃষ্টি সাদি ।

এই বৃত্তির প্রতিকূলে আচার্য্যগণ বলেন “সৃষ্টি সাদি” এই মতাবলম্বি-গণের অমুমান দ্বারা উহা প্রমাণ করিবার অধিকার নাই । কারণ অমুমান কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার মূলে একটি “সত্যং সিদ্ধ” স্বীকার করিয়া লইতে হয় । তাহা এই যে “প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তনীয় । এখন দেখুন সৃষ্টিকে সাদি বলিলে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে—যে যিনি, সৃষ্টির অনাদি প্রাকালে ইচ্ছা বিহীন ঈশ্বর ছিলেন ; অকস্মাৎ তিনি ইচ্ছাবান্ ঈশ্বর হইলেন । যখন প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্ এই প্রকার পরিবৃত্তি প্রবল তখন প্রকৃতিও তাহার নিয়ম যে পরিবর্তনীয় তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় । স্ততরাং অমুমান দ্বারা তৎ নিশ্চয় করিতে তাহাদের অধিকার কৈ ?

এইকণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সৃষ্টি ৬ সহস্র বৎসর হইল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া অনার্য্যাদিগকে তৎ পূর্বে “ঈশ্বর ইচ্ছা বিহীন ছিলেন ” ইহা স্বীকার করিতে হইবে কেন ? ইহার উত্তরে আর্য্যগণ বলেন—হা ভগবান্ তোমার বিশ্বরূপের প্রতি রোমকূপে চক্ষু সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাবক্শে বিরাজমান ; আমিরা কীটাপুতুল্য

হইয়া, তোমার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, আমাদিগকে ক্ষমা কর । আমাদিগকে তোমার অনন্ত বিধাতৃভাবের পরিপন্থিগণের সুখ মুক্তগণের অন্য বলিতে হইতেছে যে;—যদি বল্‌ যট্‌ সহস্র বৎসর কিম্বা তদনুরূপ কোন সময় হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে, তবে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে তৎ পূর্বে তিনি ভিন্ন আর কোন পদার্থ ছিল না ;

এখন দেখ—ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টির সূত্রাং তৎকালে তাঁহার কোন ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য তাহার কোন বিষয় ছিল ; সেই বিষয় হয় তিনি স্বয়ং না হয় অন্য কোন বস্তু ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে । আবার দেখ তিনি স্বয়ং ইচ্ছার বিষয় হইতে পারেন না—কারণ তিনি নিত্যসিদ্ধ ; সিদ্ধ বিষয়ে, ইচ্ছার উদয় হয় না ; সূত্রাং তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, তাহার বিষয় হইবে অল্প বস্তু । তাহাতে হানি কি ? হানি আছে—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন—তাহাই উৎপত্তি লাভ করে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সূত্রাং প্রাণজ ও সহস্র বৎসর পূর্বেও বিধাতার ইচ্ছা ছিল—স্বীকার করিলে তোমরা, সৃষ্টির আরম্ভকাল বলিয়া যে সময় নির্দেশ করিতেছ—তৎপূর্বে ও অনেক বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—অতএব উহা আরম্ভকাল নহে স্বীকার করিতে হইবে ।

### ব্যভিচার দোষ ।

বিশেষতঃ—যে অল্পমানের পর সৃষ্টিপ্রবাহকে “সাদি” বলা হইতেছে উহা ব্যভিচার দোষে দূষিত ;—কারণ প্রত্যেক অংশ যে ধর্ম্মাবশিষ্ট, উহার সমষ্টি ও তদ্ব্যবক্রান্ত এই নিয়ম সত্য নহে । দৃষ্টান্ত

১ম । প্রত্যেককণ সাদি ও সান্ত—কিন্তু কণসমষ্টি ঠিকাল—অনাদি ও অনন্ত ।

২য় । প্রত্যেক বিন্দুই পরিমিত—কিন্তু বিন্দুসমষ্টি দিক্‌পরিমিত ।

৩য় । প্রত্যেক সূত্র ববের শতভাগৈকভাগ তত সমষ্টিভূত বস্ত্রও ববের শতভাগৈক ভাগ নহে ।

কলতঃ পরিমিতি বিষয়ে কৃত্রাপি প্রাপ্ত নিয়ম সঞ্চিত হয় না।

বর্ণাদি বিষয়েই—কি সঙ্গত হয়? তাহাই বা কোথায়? রস শ্বেতবর্ণ রক্ততও শ্বেতবর্ণ উভয়ের সমষ্টিভূত বস্তুটি কৃষ্ণবর্ণ। এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

জাতিবিষয়ে ও এই নিয়ম সত্য নহে। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে জ্ঞান-ত্বের ব্যাপ্য যে জাতি তদ্ব্যাপ্য জাতি পরমাণুবর্ধ হয় না—তদনুসারে দেখা মনুষ্যের কোনও পরমাণুই মানুষ নহে অথচ তাহাদের সমষ্টি মানুষ। ধান্যের কোন পরমাণুই ধান্য নহে অথচ তাহার সমষ্টি ধাত্ত।

জ্ঞানবিষয়তার সম্বন্ধে ও এই নিয়ম সত্য নহে। দেখ প্রত্যেক পরমাণুই প্রত্যক্ষের অবিসয় অথচ তাহাদের সমষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যেক কেশ কিরকূরস্থ ব্যক্তির দর্শনের অযোগ্য অথচ কেশ-কলাপ দর্শন যোগ্য হয়।

অতএব কৃপাণ্যুরাবার নির্মিকার সদাশিবকে, বাহারা বিকৃত করিতে উদ্যত সেই স্নেহগণ এবং তৎপদানুগামী সভাগণকে অনুমান করিবার অধিকার প্রদান করিলেও, তাহারা যে অনুমান বলে সৃষ্টিপ্রবাহের সাদৃশ্য প্রমাণ করিতে পারেন না তাহা প্রদর্শিত হইল।

## সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি

ইহা অনুভবের বিষয় কিনা?

বরিশালবাসী কোন বালককে জিজ্ঞাসা কর—জোরার আগে হইয়াছে কি ভাটা আগে হইয়াছে? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে ইহার আগ পর কি? চিরকাল একবার জোরার হয় আবার ভাটা হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর—দিন পূর্বে কি রাত্রি পূর্বে হইয়াছে! কিংবা আমগাছ অথবা কি আমের বীজ অথবা হইয়াছে? সে উত্তর করিবে—চিরকাল দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা হয়; এবং বীজ হইতে গাছ হয় এবং গাছ হইতে বীজ হয়—ইহার পূর্ণাঙ্গ কি? এই সকল ব্যক্তিকে জলের হাসও বুদ্ধি; দিবাও রাত্রি,

এবং বীভক্ত কর পরম্পরা গত প্রবাহকে “অনাদি” বলিয়া অনুভব করিতেছে ।

দ্বিজ্ঞান না করিলেও, অস্মিত হয়—যে উহাদের নিকট প্রাপ্ত প্রবাহ সকল অনাদি বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । কারণ অনাদিত্ত জ্ঞান অভাব বিবরক ; ইয়ত্তা জ্ঞান ভাব বিবরক ; অতএব বাহ্যর ইয়ত্তা জ্ঞানের উপায় নাই ; তাহারই অনাদিত্ত জ্ঞান হইয়া থাকে । প্রাপ্ত প্রবাহ সকলের ইয়ত্তা জ্ঞান কখন উপস্থিত হয় ? যখন “এই সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছে” বলিয়া নিরূপিত হয় ; কিন্তু এই জ্ঞান আগম বা অনুমান দ্বারা সাধনীয় , স্মৃতরাং বাহ্যরা তাদৃশ উপায়ে, সৃষ্টির জ্ঞান উপাধীন করে নাই ; তাহাদের নিকট দিব্যরাজি, বীজাহুর এবং বেলার উদগম ও অপগমের পরম্পরা প্রবাহ অনাদি বলিয়াই প্রতিভাত হয় সন্দেহ নাই । এইরূপ যদি পরাহুচিকীর্ষ উদ্ধত সংস্কারকগণের প্রলাপ বাক্যে ও ভ্রান্তিপূর্ণ প্রেতের অধ্যয়নে লোকের চিত্ত কলুষিত না হইত, তবে কোন্ ব্যক্তি সর্বতোহ্নস্বরূপ, অনন্তবীর্ষ্য, অনন্তবাহ, বিশ্বের পরম নিধান ভগবানের সৃষ্টিক্রিয়াকে কতিপয় বর্ষ সংস্র দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে সাহসী হইত । বস্তুতঃ নহি কারণসঙ্গে কার্য বিলম্বঃ—কারণীভূত সামগ্রী সমাধান হইলে তৎক্ষণাৎ কার্য উৎপন্ন হয় । বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান সনাতন, স্মৃতরাং তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ক্রীড়াও নিরন্তর চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে সন্দেহ কি ?

দেখুন আচার্য্য উদয়ন কি বলেন—

“কারণ কারমলৌকিকাত্মত ময়ঃ সারাবশাৎ সংহরন্

হারং হারমপীজ্জাল মিবরঃ কূর্কন্ অগৎ ক্রীড়তি ।

তৎ দেবঃ নিরবগ্রহং ক্ষুরদভিধানানুভাবং ভবঃ

বিশ্বাসৈকভুবঃ শিবঃ প্রতিনমন্ ভ্রাগমন্তেষপি ॥”

যে বিশ্বনিধান ভগবান, সারাগুণে, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, ইজ্জালের ন্যায় এই লোকাভিক্রান্ত বিশ্বসংসারকে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সংহার এবং সংহার করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন । বাহ্যর শক্তির নিরোধ নাই, ইচ্ছা ও জ্ঞান অপ্রতিহত, এমন যে বিশ্বালের একনিকেতন সঙ্গাধিব ; আমি যেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ কমলে প্রণত হইয়া থাকিতে পারি ।

পরিশেষে বক্তব্য এই—কেহ কেহ বলেন বিশ্বাসের অধিকারে তর্ক সংগ্রাম উপস্থিত করা অবিধেয় । আমরা সর্বাস্তঃকরণে ইহা স্বীকার করি এবং আমাদের প্রবীণ পূর্বপুরুষগণের সাধুদৃষ্টান্তসারে, কোন ধর্মের নিন্দা বা কাহারও বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছা করি না । কিন্তু আমাদের দেশীয় অল্পচিকীর্ষু ধ্বংসংস্কারকগণ এই শিষ্টাচারের যোগ্য পাত্র কি না, তাহা বড় সন্দেহের বিষয় ; তাহার। সততই অনাদীর ধর্মের নিন্দা পরকীর বিশ্বাসের ব্যাঘাত, বালকগণকে বঞ্চনা পূর্বক ধর্মত্যাগ করান, এই সকল সদাশ্রয়জনোচিত কার্য্যে ব্যাপৃত । ইহারা এমনই বিনীত যে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তির কথারও উপহাস করে, এমন কি সার্কডোম ক্রিটি নীরাজিত চরণ-বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের নাম উল্লেখ করিয়াও “বাতুল” প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন । বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও ঋষি ছিলেন ইহারাও ঋষি ব্যবসায় করিয়া থাকেন ; সুতরাং সমকক্ষ বলিয়া করিতেও পারেন । বাহ্যহটুক ইহাদের বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোনও কথা বলিলে বিশেষ প্রত্যাবার আছে বোধ হয় না ।

কি চমৎকার শিক্ষাই এই দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে ; এই অল্পকাল মধ্যেই অনেক লোক, কোন কর্মোপযোগী বা গৌরব কর বিদ্যা না শিক্ষা করিয়াই, শিক্ষিতাভিमानে উন্মত্ত, অধর্মচ্যুত, অহঙ্কৃত, পূর্বপুরুষগণের প্রতি বিরুদ্ধ, অস্বাভী আচার ব্যবহারের প্রতি কূপিত ; এবং বাহ্য কিছু অপবিত্র ও অকল্যাণকর তদভিমুখে ধাবিত ; এবং উন্নতি হইতেছে বলিয়া আশ্বালনে প্রবৃত্ত । অমৃতবাজার অনুসারে ভূগালে মিঃ গ্রীকেন সাহের দ্বারা বাহ্য না হইয়াছে, বঙ্গদেশে শিক্ষাবশে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে । হে অগম্নাতঃ । তুমি তোমার এই অবোধ সন্তানগণের অন্তঃকরণে সধু ছি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের কলঙ্ক কালিয়া অপনোদন কর ।

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য

অদি সংস্থিতে !

পূর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি !

নমোহস্ততে !

## সাধু দর্শন ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

প্রজ্জহাতি যদা কামান্ সৰ্ব্বান পার্থ যনোগতান্ ।\*

অগ্ন্যগ্নেবাগ্ননা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষু দুঃখিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্শু নিরুচ্যতে ॥

যঃ সৰ্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহিকানীব সৰ্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবৰ্জং রসোহিপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবৰ্ত্ততে ॥

এইরূপ ব্যক্তিকেই সাধু বলিয়া জানিবে । এবং যথা সাধ্য ইহাদের  
সহবাসে থাকিয়া উপদেশ লাভ করিবে ।

\* এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমরা যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত  
করিতেছি, স্বামীজী যে টীক এই সমস্তই বলিয়া ছিলেন তাহা নহে, তিনি  
কোন শ্লোকের এক চরণ, কোনটার বা অর্ধ চরণ মাত্র উল্লেখ করিতেন ।  
আমরা পাঠকগণের বোধ গম্যের জন্য শ্লোকগুলি সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ  
করিলাম ।

আমি । আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার কৃপাদৃষ্টিতে পড়ি-  
রাছি । এতদিনে আমার কাশী আগমন সার্থক হইল । এতদিন ধরিয়া  
আপনার উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া একটি ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে ।  
যদি অনুমতি করেন তবে প্রকাশ করি ।

স্বামী । ভীত চটবার কোন কারণই নাই নিঃশঙ্কেতে বলুন ।  
আমাদের নিকট ভয়ের কারণ কি আছে ?

আমি । আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত  
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে । যদি কৃপা করিয়া দীনের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন  
তাঁহা হইলে ঘোর পাপার্ণবে নিমজ্জমান একটি প্রাণির উদ্ধার করা হয় ।

স্বামী । বড়ই হৃৎখের সহিত বলিতে হইল যে আপনার এ প্রার্থনা  
পূর্ণ করিতে আমি প্রকৃত পক্ষে অক্ষম । আমাদের আশ্রমের রীতি অনুসারে  
এরূপ দীক্ষার বিশেষ নিষেধ আছে । আর একটি কথা বলিয়া রাখি, আপনি  
কখন ধর্মের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য মানুষের নিকট উপযাচক হইবেন না ।  
বিশেষরূপে আপন ভাবার আপন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রাণের সমস্ত ভিক্ষা  
জানাইবেন, তিনি সদগুরু আশ্রয় দেখাইয়া দিবেন । তিনিই সকল স্থানে  
থাকিয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন । আপনারও গুরু তিনিই মিলাইয়া  
দিবেন, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।

এটরূপ কথাবার্তার অন্ধকার চইয়া আসিল । তখন আমি ভয়মনে  
স্বামীজীর নিকট ধীরে ধীরে বিদায় লইলাম । আমি যখন আনন্দবাগ  
পরিভ্রমণ করিয়া দুর্গাকুণ্ডর উত্তর প্রান্তে আসিলাম, পশ্চিমধ্যে কবায় বস্ত্রধারী  
একজন দণ্ডীর সতিত সাক্ষাৎ হইল । ইনিও প্রায়ই স্বামীজীর নিকট বাতায়িত  
করিতেন । তাঁহাকে পাঠিয়া আমি বিশেষ আত্মদ্রুত হইলাম । বিশেষ  
প্রয়োজন জানাইয়া তাঁহাকে আমার সহিত সহর মধ্যে আসিতে অনুরোধ  
করিলাম । তিনি অতি বিনীত ও স্নেহ পরায়ণ ; সুতরাং আমার অনুরোধ  
অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার অনুসরণ করিলেন । পরে নানা  
কথার্তার পর স্বামীজীর বিবর উত্থাপিত হইল । আমার প্রশ্নের উত্তরে  
তিনি স্বামীজীর কঠোর সাধনার বিবর বিবৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন ।

“আমি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম । যখন কেবল  
ষাট আমার অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম তখন আমি ৮ কাশীধামে আসিয়া  
বাস করিতে থাকি । সে সময় ইনি সর্বদাই গঙ্গাতীরে থাকিতেন । যেরূপ



ভাবে থাকিলে দ্বীপে কষ্টে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভব সেইরূপই থাকিতে ভাল বাসিতেন । তঁহি পিতৃভর সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপরে ঠিক এক খানি কাঠখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন । প্রচণ্ড ঐশ্বের সময় উত্তম বালুকার উপর নিদ্র দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন । এইরূপ অতি বিষয়কর ও অতীব কষ্টসাধ্য কঠোরতা করিয়া সতিষ্কৃত শিক্ষা করিতেন । কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না । আপন মনে কখন হাসিতেন কখন বা কাঁদিতেন । সে সময় তাঁহাকে কেহ কোনরূপ আশ্বাস করিতে দেখে নাই । যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোন আশ্রমীয় সামগ্রী নিকটে যাওয়া ধরিতেন ; তিনি দ্রব্যাগুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন । ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উৎখানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায় । এই অবস্থায় সর্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন । বহুদিন যাবৎ এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইলে, ক্রমে যেন একটু একটু করিয়া বাহিরের কার্যো মন-নিবেশ করিতে লাগিলেন । সময়ে ২ ইচ্ছাস্তমঃ পরিত্রমণ করেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গাবাড়ীতে মায়ের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন । তৎপর এই আনন্দ বনে আশ্রয় লয়েন এবং সেই অবধি এই থানেই অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকেন । ”

দত্তীর নিকট হইতে স্বামীজীর পূর্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছাইলাম । রাত্রিতে আসিয়া শুনিলাম পরদিনই আমাকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কাশীত্যাগ করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে চলিয়া যাউতে হইবে । স্মৃতরাং অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বরাবর স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলাম । যথাবিধি প্রণামান্তর গত রাত্রির ঘটনা বলিলাম । তিনি উত্তরে একটু হাস্য করিলেন মাত্র । আমার হৃৎগা বশতঃ সেই দিবসই ভয় ভয়ে কাশী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম ।

## “উপবাস ।”

এই মাসাময় জগতে প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়া থাকে । সেই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটা ঘটনা আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া থাকি । তাহার একটা কার্য্য, অপরটা বিরাম । প্রাণিগণ প্রকৃতির গুণবশে নিয়মিত সময় তৈত্ত্বতঃ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে বিরাম সুখ লাভ করিতেছে । সতত বিরাম বা কার্য্য স্বাভাবিক নহে । কোন যন্ত্র নিরন্তর বিচালিত হইলে অবিলম্বে উহা শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এইজন্য সময়ে সময়ে উহার বিরাম অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে উহা অনিয়মিত বিরাম প্রাপ্ত হইলেও অচিরে চির-বিরাম লাভ করিবে । অতএব নিয়মিত রূপে তৈত্ত্বেরই আবশ্যক । শিশু ভূমিষ্ট হইয়া পূর্নজন্মার্জিত সংস্কার বশতঃ উপদেশ ব্যতীতও জ্ঞাপ্যনার্থ মুখব্যাধান করিয়া থাকে । জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই বুদ্ধির উদ্রেক হইয়া ভোজন ব্যাপারে বিনিয়োগ করে । ইহা প্রাণি মাত্রেয়ই সাধারণ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপিত ও অনূভূত । বাহারা সেই সাধারণ বিধি হইতে একটু উপরে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারা হয়ত গভীর আন্দোলন ও গবেষণা দ্বারা মীমাংসা করিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিবেন যে মধ্যে মধ্যে পাকস্থলীর বিরাম দেওয়া কর্তব্য । মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিরাম হইলে পাকযন্ত্র শিথিল হইবেনা, বরং নিশ্চল হইয়া ভবিষ্যতের বিশেষ হিত সাধন করিবে; অতএব মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিরতি ও পরিবর্তন নিতান্ত কর্তব্য । আর্ধ্যগণ দৈনন্দিক ভোজন বিরতি প্রভৃতির শাসন করিয়াই তৃষ্টিস্তাব অবলম্বন করেন নাই । উহা তিথি বিশেষে ভিন্নরূপে নির্বাহিত হইবার জন্য বিশেষ শাসন করিয়াছেন । তিথি বিশেষে ত্রিলোকের অবস্থার ঈশৎ পরিবর্তন হয় তৎসঙ্গে আমাদের অবস্থাও পরিবর্তিত হইয়া থাকে । এইজন্য তিথি বিশেষে ভোজ্য বস্তু জাত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে । আর্ধ্য জাতির প্রতি কার্য্যই সুদৃঢ় ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ । ত্রিকালজ পরম পূজনীয় আর্ধ্য ঋষিগণ একাদশী প্রভৃতি তিথিতে কেবল ভোজন-বিরামেই প্রবৃত্তি জনক বাক্যের অনুশাসন করেন নাই, উহার সহিত উপবাসের সংযোগ করিয়াছেন । যদিও ভোজন কার্য্য

নির্কাহ না হইলে সাধারণতঃ উপবাস বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে উপবাস, ভোজন বিরাগ দিয়া আরও কতক গুলি কর্তব্য কর্ম নিষ্পাদন করিলে সম্পূর্ণ রূপে উপবাস হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে মুখাবিধি সঙ্কচিত হইয়া অবস্থোচিত বিধানেরও অসম্ভাব নাই। সংঘত থাকিয়া যথাসাধ্য কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃত্য গুলি সম্পাদিত হইল ইহা বলা যাইতে পারে। আমরঃ প্রথমতঃ উপবাস কাহাকে বলে তাহাই লিখিতেছি,—

“উপাবৃত্ত্যাপাণেভ্যো যন্তবাসো গুণৈঃ সহ ।

উপবাসঃ সবিক্কেয়ঃ সর্বভোগ বিবর্জিতঃ ॥” ভবিষ্যে ।

পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্বভোগ বর্জন পুরঃসর গুণের সহিত বাসকে উপবাস বলে ।

এস্থলে যে গুণের কথা আছে সেই গুণগুলি কি? তাহাই লিখিত হইল,

“দয়া সর্বভূতেষু কান্তিরনশ্রয়া শৌচমনা-

রাসো মঙ্গল মকার্পণ্য ম্পৃহাচ ।”

সর্বভূতে দয়া, কমা, অনশ্রয়াঃ, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অম্পৃহাকে গুণ বলে ।

দয়া— “পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা ।

আত্মবৎ বর্জিতবাং হি দরৈবৈবা প্রকীর্ষিতা ॥”

সতত, উদাসীন, বন্ধুবর্গ, মিত্র ও শত্রুতে আত্মবৎ বাবহারকে দয়া বলে ।

কমা— “বাছে সাধ্যাত্মকে চৈব হৃৎখেচোৎপাদিতে কচিং ।

ন কুপ্যন্তি ন বাহন্তি স। কমা পরিকীর্ষিতা ॥”

কদাপি বাহ্য বা আধ্যাত্মিক হৃৎ উৎপাদিত হইলে কোপ বা হনন না করাকে কমা বলে ।

অনশ্রয়া— “ন গুণান্ গুণিনোহন্তি স্তোতি মনোগুণানপি ।

নান্যদোষেষু রমতে সানশ্রয়া প্রকীর্ষিতা ॥”

পরের গুণের নাশ না করিয়া বরং পরের মনোগুণেরও প্রশংসা করা এবং পরদোষে রমণ না করাকে অনশ্রয়া কহে ।

শৌচ— “অভক্ষ্য পরিহারস্ত সংসর্গশ্চাপ্য নিব্রুতৈঃ ।

ষধর্ষেচ ব্যবস্থানং শৌচ মে তথ প্রকীর্ষিতম্ ॥”

অখাদ্য পরিহার, অনিন্দিত লোকের সংসর্গ ও স্বপ্নে অবস্থানকে শোচ বলে ।

অনার্যস— শরীরঃ পীড়্যতে যেন স্তু শুভেনাপি কর্মণা ।

অত্যন্তঃ তন্ন কুর্কীত অনার্যসঃ স উচ্যতে ॥”

যে কর্মে শরীরের পীড়া হয় তাহা শুভকর্ম হইলেও অত্যন্ত করিবে না, ইহাকে অনার্যস বলে ।

মঙ্গল— “প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তং বিবর্জনম্

এতচ্চি মঙ্গলং প্রোক্তমুযিতি তদ্বদর্শিতিঃ ।

প্রশস্ত কর্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্মের পরিবর্জনকে তদ্বদর্শী ঋষিগণ মঙ্গল বলেন ।

অকার্পণ্য— “স্ত্রোতাদপিচ দাতব্য মদৌনে নৈব চান্বনা ।

অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতম্ ॥”

অল্প সংগ্রহ থাকিলেও প্রতিদিন অদীনভাবে বাহ্য কিছু দান করা যায় তাহাকে অকার্পণ্য বলে ।

অস্পৃহা—যথোৎপন্নেন সম্ভোষঃ কর্তব্যোহ্যপ্যজ বস্তুনা ।

পরম্যাচিন্তুরিত্যর্থঃ সাস্পৃহা পরিকীর্তিতা ॥”

যথাবিক্রিত রূপে উপার্জিত অর্থ অল্প হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, তথাপি পরের অর্থে কামনা করিবে না । তাহা হইলে অস্পৃহা হইল ।

এই সমস্ত ভিন্ন দেবীপুরাণে অন্যবিধ গুণের কথা ও আছে ।

“তদ্ব্যানঃ তজ্জপঃ জ্ঞানং তৎকথা শ্রবণাদিকম্ ।

উপবাসকৃতো য়েতে গুণাঃপ্রোক্তা মনৌষিতিঃ ॥”

ঈশ্বর ধ্যান, জপ, ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও জ্ঞানকে গুণবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন ।

আমরা প্রথমে উপবাসের যে সংজ্ঞা লিখিয়াছি তাহার প্রায় প্রতিপদের অর্থ সজ্ঞেপে উক্ত হইল । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য “সর্বভোগ-বিবর্জিতঃ” অর্থ শাস্ত্রানুমত নৃত্য গীতাদি সুখরহিত, বলিয়াছেন । শাস্ত্র বহির্ভূত নৃত্য গীতাদি বিলাস কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে ।

এখন বুঝা যাইতেছে ভোজন বিরক্ত হইয়া পূর্বোক্ত গুণ গুলির সহিত বাস করিলে উপবাস হয় । বিলাসিতা সর্বথা পরিভ্যজ্য । সংযত চিত্ত

হইয়া ঈশ্বরানুধ্যান জনিত অতুল আনন্দ ও শরীর রক্ষা জনিত সুখ, এই দুই সুখ উপবাসের প্রত্যক্ষ ফল এতদ্বিধি আত্মবদিক ফল বিস্তার করিয়াছে। এইরূপ করিতে করিতে গুণগুলি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল গুণে যিনি অড়িত হইয়াছেন তাহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও পূজা করিতে কেহ বিরত হইবেন না। তবে বাঁহারা ভোজন না করিয়া থাকাকে মতাপাপ মনে করেন, বরং উহাতে শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয় এবং তাহাই ভারতের দুর্গতির মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতেছেন, বেদকে চাষার গান বলিতেছেন, এবং তজ্জপ উক্তিবিশারদদিগকে প্রবীণ বলিয়া দীর্ঘ সমালোচনা করিতেছেন সেই সমস্ত মূর্ত্তিমতী শিকা দেবীদিগের কথা স্মরণ।

এখনও উপবাসাদি আপাত-ক্লেশ অনেক কার্য্য অনেক বলিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার ক্ষীণ বা দুর্বল নহেন। প্রত্যুত বলিষ্ঠ ও নীরোগ।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে প্রারম্ভিক আত্ম সুখকর কার্য্যে বিব্রত, পরিণামে উহাতে সমূহ অনিষ্টপাত হইলেও তাহারা-পরিহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্যই অনেক সময় বহু ক্রেশের নিদান সঞ্চয় করিয়া অচিরে চির-রোদনের সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উপবাস দিনে কি কণ্ঠব্য তাহা একরূপ বলা হইল এখন নিবিদ্ধ কার্য্যাকগীর কিছু বলা যাইতেছে।

“উপবাসঃ প্রণশ্চেত দিবান্যাপাক মৈথুনৈঃ ।

অভ্যায়ে চাশ্বপানেচ নোপবাসঃ প্রণশ্চতি ॥”

দিবানিত্রা, অক্ষত্ৰীড়া ও মৈথুনে উপবাসের নাশ হইয়া থাকে। অভ্যাস (নাশ) সম্ভব হইলে জলপানে উপবাস নাশ প্রাপ্ত হয়না।

যিনি যে কোন ব্রত অবলম্বন করুন না কেন নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

“গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং তাশ্বলং চাশ্ব লেপনং ।

এতদ্বো বর্জ্যয়েৎ সর্বং যচ্চান্যৎ বলরাগকৃতং ॥”

তৈল মাথাকে অভ্যঙ্গ বলে। ব্রতস্থ ব্যক্তি তৈল ব্যবহার, তাশ্বল, (গন্ধাদি দ্রব্য গাত্রে বিলেপনকে অশ্বলেপন বলে) অশ্বলেপন প্রভৃতি কর্ম পরিভ্যাগ করিবে। পক্ষ পক্ষান্তরেও তৈল নিষেধ। যে স্থলে, তৈল নিষেধ তথায় তিল তৈল বৃকিতে হইবে। তিল তৈল সুবাসিত হইলে নিষেধ নহে।

“স্বতঃ সার্বপং তৈলং যত্নৈলং পুষ্পবাসিতং ।

অদ্বৈতং পক্ৰতৈলং স্নানাদ্যন্তেচ নিত্যশঃ ॥”

“তৈলাভ্যাস নিবেধেতু তিলতৈলং নিবিধ্যতে” ।

বৈদ্যকশাস্ত্রেও তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে ধর্ম শাস্ত্রানুরূপই ব্যবহা আছে ।

\* অভ্যাসঃ \* কারয়েন্নিত্যং সর্কেষকেষু পুষ্টিদম্ ।

শিরঃ শ্রবণ পাদেবু তং বিশেষণ শীলয়েৎ ॥

সার্বপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্নৈলং পুষ্প বাসিতম্ ।

অনাদ্য বায়ুতং তৈলং ন দৃষ্যতি কদাচন ॥” ইত্যাদি

ভাব প্রকাশ ।

“অঞ্জনং রোচনঞ্চাপি গন্ধানু স্তমনসস্তথা ।

পুণ্যকে চোপবাসেচ নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ ॥”

অঞ্জন, রোচনা ( গন্ধ প্রবা বিশেষ ) গন্ধ ও পুষ্প উপবাসদিনে উপভোগ করিবে না ।

“গন্ধালঙ্কার বস্তুনি পুষ্পমাল্যাহ্নলেপনম্ ।

উপবাসেন হৃষোত দন্তধাবন মঞ্জনম্ ॥”

অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অহ্নলেপন, দন্ত ধাবন, অঞ্জন দ্বারা উপবাস, দোষ বৃদ্ধ হয় ।

দন্তকাঠ ব্যবহার না করিয়া বিধি অনুসারে মুখপ্রক্ষালন করিবে ।

“উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন ধাদেন্দন্ত ধাবনম্ ।

দন্তানাং কাঠ সংযোগো দহত্যাগশ্চ মং কুলম্ ॥”

উপবাস ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাঠ ব্যবহার করিলে শগুমকুল পর্যন্ত দহ হয় । এরূপ হলে মুখওজ্জি অন্য ঐদশ গণ্ডুব অল দ্বারা মুখওজ্জি করিবে ।

“অনাতে দন্তকাঠানাং প্রতিবিদ্ধদিনে তথা ।

অশাঃ দ্বাদশ গণ্ডুবৈ মুখওজ্জি বিধীয়তে ॥”

দন্তকাঠ না খটিলে ও নিবিদ্ধদিনে দ্বাদশ গণ্ডুব অল দ্বারা মুখওজ্জি করিতে হইবে । আমরা প্রায় ব্যবহার্য শাস্ত্রীয় কথা এ স্থলে লিখিলাম, এখন আর একটা কথা লিখিলেই বোধ হয় তাহা হইলে একরূপ অন্তঃসম্বন্ধীয়

শ্রীমদ্রাম প্রমাণ শেষ হইল । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে মৈথুন দ্বারা উপবাসে দোষ ঘটে অথবা নাশ হয় । অথচ দক্ষ বলিতেছেন—

“ অরুণঃ কীৰ্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং শুভ্যভাবণম্

সঙ্কল্পোদ্যাবসায়শ্চ জিহ্বানিম্পত্তিরেব চ ।

এতমৈশ্বর্যমষ্টমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ,

অমুরাগাৎ কৃতকৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকম্ । ”

অতএব জীলোকের প্রতি দৃকপাত করিলেও ( প্রেক্ষণ ) মৈথুন অনিত দোষ স্পর্শ ঘটে । উপবাস দিনে জী দর্শনাদি নিষিদ্ধ, তবে একরূপ ঘরে ছুরার বন্ধ করিয়া থাকিতে হয় । আর্য্য শাস্ত্রে এরূপ মূর্থতা অসম্ভব । অমুরাগ পূর্বক দর্শন, আলাপ প্রভৃতি করিলে উপবাসাদি ব্রত দূষিত হয় । সংযতচিত্তে ব্রত নির্বাহ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রমর্থ্য তাৎপর্য্য । অমুরাগ বিরহিত হইয়া পবিত্রভাবে কার্য্যাবণতঃ আলাপ ও দর্শন অন্যায় নহে । বিশেষরূপে না হইলেও প্রায় শাস্ত্রীয় কথাই লিপিবদ্ধ হইল এখন আমরা কয়েকটি কথা বলিয়া উপবাসের উপসংহার করিব । অনশন এক তপস্য । তপঃ কাম মনশনাৎ পরম্ ” অনশনের পর আর তপস্যা নাই । নিরন্তর অনশন করিয়া শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য নহে । বিহিত কর্ণের অমুঠানে সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সঘণ্টার প্রকাশ হইয়া রজোমল ও তমোমল বিনষ্ট হইয়া যায়, নির্মল লঘু শরীর হইলে আগ্নেয়াভাস হয়, ধরে প্রাণ অল্প কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে । এমন কি উপবাসাদি ব্রত ভিন্ন শরীর নির্মল ও লঘু হয় না, সুতরাং প্রণামাদি যোগ সাধন মহৎ কার্য্য অসিদ্ধ হয় না । পরং উহাতে বাহ্য প্রবর্তিত হইয়া অর্থ স্বচ্ছন্দতা ঘটে । উপবাসাদি ব্রত আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও অস্তিমে অর্থ বোধ হয় । অধুনা অনেকেরই পরিণামের প্রতি তত দৃষ্টিপাত নাই । অতিমুখজনক কার্য্যকে অর্থভ্রমে গ্রহণ করিয়া অস্তিমে অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয় । সংযমের প্রতি লোকের দৃষ্টি নাই তবে মৌখিক বাগাড়ম্বর সময়ে সময়ে শুনা যায় । আর্ষ্য ধর্ম্মের অর্থ ও বাহ্য প্রবর্তক ব্রত নিরাসাদি আশ্রম ধর্ম্মানুসারে প্রবর্তিত না হইলে আর নিস্তার নাই । যাহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাদি পবিত্র কার্য্যাবলীকে স্বপার চক্ষে দেখেন সেই বিলাস-ভোগ নিরত বাবুগণ বিধবার বাহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পারেন যে, বাবুগণ হইতে উহার কত বাহ্যমুখে স্বধী । ক্রম-

প্রায় দেশের এই স্বাস্থ্যটুকুও তাঁহার ভেটিতে পানেন না কি ? আবার লোভ ও বিলাসিতার আপাত মধুর মোহন ছবির কুহকে পড়িয়া অনেকেরই পাকে প্রকারে ভোজন ব্যাপার উপযুক্ত রূপে নির্বাহ হইতেছে না অথচ ধর্ম-মুখোপে ধর্ম কার্য সময়ে উপবাস ব্রতাদির সাময়িক আবশ্যকে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে । রোগীকে কোন অহিতজনক দ্রব্য ভোজনে; নিবেদ করিলে পুনঃপুনঃ সেই দ্রব্য ভোজনেই তাঁহার অভিলাষ ভঙ্গিয়া বিলক্ষণ উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলে । কলিরোগগ্রস্ত বাবুগণকেও তজ্জপ কোন সাময়িক নিবেদ করিলে তদ্বিষয়ে পতিকূলে তাগাদের প্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে । ইহা রোগের ধর্ম তাহার সন্দেহ নাই । দান্ত্য রক্ষার উপায় বুদ্ধির সজ্জিত ধর্মের সঞ্চয় জনক উপবাসাদি ব্রত একান্ত কর্তব্য । তবে আশ্রম ভেদে ব্যক্তি ভেদে ও অবস্থা ভেদে ইহার উত্তর বিশেষ হইয়া পাকে, আর্ধ্য-শাস্ত্রে তদুপযোগী বিধানই রহিয়াছে । যাতারা আর্ধ্য শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার মতিমা বিন্দুত হইতে পারিবেন না । যাতারা ইহার বিনাশ সাধন করিয়া স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার পরায়ণ হইতে বাহা করেন, যাতারা দেশের অনিষ্টকারী শত্রু । য়েহু হও, ধবন হও, ব্রাহ্ম হও অনায়াসে হইতে পারিবে কিন্তু পবিত্র পূজ্য আর্ধ্য হইতে, স্বেচ্ছাচারকে নিবৃত্তিতে নির্মূল করিয়া নিকাম হইতে হইবে । ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মনোমল অপসারিত করিয়া, প্রয়োজন হইলে, স্নান হইতে ক্ষদ্র অতল উৎপাটিত করিয়া বিভূতরণে অঞ্জলি দিতে হইবে । মন প্রাণ সমস্ত কিংবদন্তি উৎসর্গ না করিলে কখনই পরম পদ লাভ হয় না ।

## ধর্ম ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

আত্মার প্রবণমননাদিষ্ট প্রকৃত ধর্ম তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইবার পক্ষেই মুক্তি হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের পর মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়, তৎপরে প্রাণের নাশ হয়, তদনন্তর প্রবৃত্তির নাশ, তৎপরে জ্ঞানের নাশ তদনন্তর হঃপের নাশ এবং তাহাই মুক্তি ।

“হঃপ জ্ঞান প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরা প্যে তদনন্তরা পারাদপবর্গঃ ।” ইতি গীতা ২.৭২, একমুখিত্ব প্রতিকারণ তত্ত্বজ্ঞান কি ?



“তত্ত্বং ব্রহ্মণি বাথার্থে” তখন বাথার্থী জ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের বিপর্যায় । কিন্তু আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ অর্থাৎ রূপ রসাদি, বুদ্ধি, মন, বাক্য চেত্না ও ধ্যান দর্শার দর্শনামুকুল রূপ প্রবৃত্তি, রাগ দ্বেষ মোহাত্মক দোষ, প্রেতাভাব অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্য ইত্যাদিতে মিথ্যা জ্ঞান নানা প্রকার, যথা আত্মার অনাত্ম জ্ঞান, অনাত্মাতে আত্ম জ্ঞান, দুঃখে সুখ জ্ঞান, অনিত্যে নিত্য জ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানজ্ঞান, সভয়ে নির্ভয়জ্ঞান, নিদ্রিতে অভিমত জ্ঞান, ত্যাগে অত্যাগজ্ঞান । প্রবৃত্তি হইতে কৰ্ম হয় না, এবং কৰ্ম হইতে ফল জন্মায় না । প্রকৃত পক্ষে দোষ নিমিত্ত, সংসার দোষের নিমিত্ত নন । প্রেতা ভাবে অর্থাৎ মৃত্যুর পর-জন্মে জন্ম, জীব, মৃত্যু বা আত্মা নাই । জন্মের ও জন্ম নিবৃত্তির কারণ নাই, অতএব ইহাই প্রেতাভাবের আদি এবং উহা (প্রেতাভাব) অনন্ত সূতরাং প্রেতাভাবের পর কোন বস্তুই নাই । প্রেতাভাব নৈমিত্তিক হইয়াও কৰ্ম নিমিত্ত নহে । শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি চঃ সমূহের উচ্ছেদে এবং প্রাপ্তির দ্বারা উহা নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার কোন সংস্পর্শ নাই । এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিপর্যায়ের নাম তত্ত্ব জ্ঞান এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি । তবেইত অপবর্গ বড় ভয়ঙ্কর হইল; কারণ ইহাতে সকল প্রকার কার্যের উচ্ছেদ হইবে, এবং যদি সকল প্রকার কার্যের নিবৃত্তিই হইল, তবে অনেক প্রকার মঙ্গলদায়ক কার্যেরও মূলে কুঠারাম্বাত হইবে । সর্ব প্রকার সুখোচ্ছাদক এমন জড় পদার্থের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি হইবে ? কারণ পুরুষ বা স্ত্রী দ্বারা দান পরিত্যাগ ও পরিচর্যা প্রভৃতি সংকৰ্ম করিতে পারে, আবার বাক্যের দ্বারা সত্য প্রিয় ও সাধার আচরণ করিতে পারে ও মনের দ্বারা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা প্রভৃতি উত্তমোত্তম কার্য্যকরিতে পারে। বায় কিন্তু উক্ত প্রকার জড় অপবর্ণের প্রভাবেতে এই সমস্ত সদগুণানুভব ভাসিরা যায় তবে এমন বস্তুতে প্রয়োজন । ইহা বড় ভ্রম পূর্ণ,—অপবর্গ শাস্তিময় । শরীরের দ্বারা যেমন দানাদি, বাক্যের দ্বারা সত্যাদি ও মনের দ্বারা দয়াদিরূপ সংকৰ্মের অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু আবার পূর্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের অনুকূল রাগ ও প্রতিকূল দ্বেষ ও তাহা হইলে অসুখী হইয়া যায়। লোভাদি জন্মাইবে এবং তৎস্বক পুরুষ নারীর দ্বারা হিংসা, ভয়, নিবিদ্ধ মৈথুনাदि করিবে, বাক্যের দ্বারা মিথ্যা পুরুষ ও অসম্বন্ধ প্রমাণ ও মনের দ্বারা পরত্যাগ পর ত্রব্য লোভেচ্ছা এবং নাস্তিকতা প্রভৃতি অসং কৰ্মের অনুষ্ঠান হয় ও তাহাতে নিকৃষ্ট জন্ম হয় । জন্মের অর্থ শরীর ইন্দ্রিয়

প্রভৃতির সমূহ বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব, সেই জন্ম হইলে দুঃখ, সেই দুঃখ প্রতিকূলে বেদনীয় হইলে পীড়া, তাপ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় । এই প্রকার মিথ্যা জ্ঞান দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অন্ত্রের অবিস্তার স্থিতির নাম সংসার । তৎসংজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইরে অর্থাৎ আত্মার আত্মজ্ঞান ও অনাত্মার অনাত্মজ্ঞান প্রভৃতি ও প্রবৃত্তিতে কৰ্ম্ম আছে , কৰ্ম্মে কৰ্ম্মফল আছে । এই সংসার দোষ নিমিত্ত । প্রেতাভাবে জীবাদি আছে, জন্ম ও জন্ম নিবৃত্তি সনিমিত্তক বলিয়া প্রেতাভাবের আদ নাট কিন্তু তাহার অন্ত অপবৰ্গ ইত্যাদি জ্ঞান হইবে, তৎপরে দোষ অর্থাৎ রাগ ঘেবাদি মরিবে, তৎপরে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম যাঠিবে তদনন্তর জন্ম অর্থাৎ শরীরাদি যাঠিবে, তদনন্তর দুঃখ অর্থাৎ বাধা পীড়াদি নশ হইবে এবং ইচ্ছাই অপবৰ্গ । এখন সকলে বল দেখি মধুবিষ মিশ্রিত জন্ম কি কেহ ভোজন করে ? ইচ্ছা যে প্রকার লোকের তাজ হয় সেই প্রকার সুখ দুঃখ যুক্ত বস্তুও তাজ্য হওয়া উচিত । যেমন উক্ত প্রকার অগ্নে প্রাণনাশ করে, সেই প্রকার ইচ্ছাতে বন্ধন হয় । তুমি সংকৰ্ম্ম কর গোলকে বাইরা নানা প্রকার সুখভোগ পূৰ্ব্বক সোণার শিকলে বাঁধ পড়িবে, আবার অসৎ কৰ্ম্ম কব নরকে কীট হইয়া নারিকেলকাতায় বাঁধা পড়িবে । গোলকেই যাও আর নরকেই যাও উভয় স্থানেই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া কথাটী নাই । কিন্তু এই বন্ধনটী দায় অপবৰ্গ হইলে । সকলে বল দেখি অপবৰ্গকে আর ভয়ানক বলিতে ইচ্ছা করে না তাহা পাইতে ইচ্ছা করে ?

## জ্যোতির্বিদ্যা ।

সকল মনুষ্যের পক্ষেই কালজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কি ঐহিক বিষয়, কি পারমার্থিক বিষয়, কালজ্ঞান ভিন্ন কোনও বিষয় অনুসম্পন্ন হইতে পারে না । কালজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা সাপেক্ষ । সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যা যে সমধিক প্রাচীন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই । সভ্য সমাজ প্রতি মুহূর্ত্তে কালকালের আবশ্যকতা অনুভব করেন । আর্ষ্য জাতি আদিম সভ্য । তাঁহাদের কালজ্ঞান বিদ্যাও আদিম একথা অনার্য্যসে বলা যাইতে পারে । আর্ষ্যলোক ও সভ্যলোক এক পর্য্যয়ে গঠিত হইয়াছে, অতএব উহা একার্থ বোধক । যথা,

“মহাকুল কুলীনার্ঘ্য সভ্য সম্মান সাধকঃ ।”

(অমর কোষ)

যুরোপ খণ্ডের প্রসিদ্ধি অল্পসংখ্যক মিশর দেশ প্রথম সভ্য হয়। যুরোপে এ প্রসিদ্ধি কোনও ক্রমে অসম্ভব নহে। কারণ আবিষ্কৃত বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে মিশর দেশে যাইতেন। তথায় আসিয়া যুরোপ ও আফ্রিকা এই দেশ ত্রয়ে লোক সকল সমবেত হইত। আৰ্য্যদিগের সাক্ষ্য বশতঃ ব্রিটিশ ক্রিয়া প্রভৃতি যুরোপবাসীরা সভ্যতা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচারিত করিয়াছেন, আফ্রিকা ও যুরোপের সমস্ত প্রদেশে মিশর হইতে সভ্যতা নীত হইয়াছে। সুতরাং মিশর দেশ প্রথম সভ্য জন। এই কিংবদন্তি যুরোপে প্রচলিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পূর্বে বলিয়াছি, কালজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা সাপেক্ষ। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ কালজ্ঞান ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা যে কত প্রাচীন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। প্রথমতঃ রোম রাজ্যে জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত হয়। রোম রাজ্য ধ্বংসের পর আরব হইতে উহা যুরোপে নীত হয়। রোম ও আরব যে এ বিষয়ে ভারতের শিষ্য, তাহার প্রমাণ দুর্বল নহে। এ প্রস্তাবে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে চাহি না। বেদাদি জ্যোতিষ ও স্বর্বাগিদ্ভাস্তের ন্যায় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই বলিলে অতুষ্টি হইবে না।

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আৰ্য্যদিগের জ্যোতির্বিদ্যায় ভ্রম সঙ্কুল। উহা কেবল অল্প কালীন প্রতগণের সংস্থান বিশেষ,—কলতঃ শুভাশুভ ফল নির্ণয় সাধক, পৃথিবী আদর্শের ন্যায় সমান ও নাগ শূন্য অনন্ত প্রভৃতির আশ্রয়ে রূপিত; ইত্যাদি কুসংস্কার জাল সমাজের। উহাকে কোনও সার পদার্থ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰ্য্যদিগের বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পর্যন্ত সমস্ত স্থলেই অধিতীক কুসংস্কারের আধিপত্য। বাহারা দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহাদের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। বাহারা এরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন যাত্র; বাস্তবিক বহুকাল পূর্বে আৰ্য্য জ্যোতির্বিদ্যায় যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন, অতীত দিন হইতে তাগ যুরোপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমনকি অবসার যুরোপীয় বিদ্যা মদ্য হইয়া বাহারা জ্যোতির্বিদ্যার উচ্চতম

সিঁতাসনে ফুরোপীর পণ্ডিত মণ্ডলীকে আসীন এবং অর্থাৎ জ্যোতির্বিদগণকে তাহার ত্রিসীমা সাধনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তত সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ ।

পুরাণাদি আশ্রয়ে অনাক্রম্য থাকিলেও প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্যোতিষিক সভ্য সকল অতি উজ্জল ও পুরিকার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুরাণাদি শাস্ত্রে অনাক্রম্য বর্ণনা অজ্ঞান বা ভ্রম নিবন্ধন নহে । ঐরূপ বর্ণনার তাৎপর্য্য সূত্ব । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ সকল তাৎপর্য্যের সমীচীন রূপে প্রদর্শন সম্ভবে না । সুতরাং, কতিপয় জ্যোতিষিক সভ্যের প্রদর্শন করাষ্টয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব ।

প্রায় সার্ব্ব সপ্ত শতাব্দী পূর্বে যুগ্মগীত নামক ভাস্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন । তিনি স্বকৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিব । মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর গোলত্ব ও তাহার চতুর্দিকে লোক বাস করে, ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ।

সর্বতঃ পর্ষতরাম গ্রামচৈত্যাচয়ৈশ্চিভঃ ।

কদম্ব কুশুমগ্রহ কেশর প্রসরৈরিব ( প্রসরৈরিব )

কদম্ব পুষ্পের চতুর্দিক যেমন কেশর বাগু থাকে, তদ্রূপ এই ভূগিণ্ডের সর্বদিকে পর্ষত, আরাম, গ্রাম ও চৈত্যা আছে ।

যোযন্য তিষ্ঠত্যাবনীং তলস্থামানমানমস্যা উপরি স্থিতংচ ।

স মন্ততেহতঃ কুচতুর্ধনংস্থামিথশ্চ তে তিষ্ঠ্যগি বামনস্তি ॥

যিনি যেখানে থাকেন তিনি মনে করেন যে আমি পৃথিবীর উপরিভাগে আছি ও পৃথিবী তাহার নিম্নে রহিয়াছে । অতএব তাঁহারা পৃথিবীর চতুর্গাঙ্গে বাস করেন তাঁহারা পরস্পরকে বক্রীভাবে অবস্থান করিতে মনে করেন ।

ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর অ'ধারও স্বীকান করেন না ।

মূর্ধে ধর্তা চেন্দ্ররিজ্যাস্ততোহন্তস্তথাশ্চাপ্যোহনৈব মনানবতা ।

অন্তে কল্যা চেষশক্তি কিমাদ্যেকিং নোভূমেঃসঠিষু তৈশ্চ মূর্তি ॥

আকৃষ্টিশক্ত্যন্ত মহা ভয়ায়ৎ বসন্ত গুরু দ্বাভিমুখং বশত্যা ।

আকৃষ্যতে তৎপতন্তীৰ ভাতি সমে সমস্তাৎক পতিত্বিরং যে ॥

তাঁহাদের মতে পৃথিবী স্বশক্তিতে শূন্য অবস্থিত । পৃথিবীর চতুর্দিকেই

সমভাবে আকাশ রহিয়াছে। অতএব পৃথিবী কোথায় পতিত হইবে? তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে পৃথিবী শুষ্ক ভ্রমকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব তাহার পতন প্রতিভী হয়। কিন্তু পৃথিবীর চতুর্দিকে সমভাবে আকাশ থাকতে পৃথিবী\* কোন দিকেই পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পৌরাণিক আর্ধ্যগণ পৃথিবী স্থিরা,—গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলীর ভ্রমণ দ্বারা অহো-রাত্র্যাদি নিব্বাচ হয়, এইরূপ লিখিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যও ঐ মতই অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবী বা জ্যোতিষ্মমণ্ডলী এতদূতয়ের যে কোনটির গতি স্বীকার করিলেও গণনা এবং গণিতাগত বস্তুর কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। দ্বয়ালু আর্ধ্যগণ সাহসিক অহুভব সিদ্ধ সূর্য্যাদির গতি পক্ষ অবলম্বন করিয়াই লোকদিগকে দুরূহ জ্যোতিষ্মদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের সাহসিক অহুভবের বিরুদ্ধ পক্ষ উপস্থাপন করিয়া দুরভিগম্য জ্যোতিষ্মদ্যার দুরভি-গম্যতরু সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক করেন নাই। জ্যোতিষ্মদ্যার সত্য আবি-ষ্কার করিয়া বাহ্যদূরী দেখান তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, জ্যোতিষ্মদ্যার কল নির্ণয় দ্বারা বখাতৎ ধর্ম্মাচরণের পথ পরিষ্কার করা, পৌরাণিক আচার্য্যদিগের উদ্দেশ্য। লোকের সাহসিক অহুভবের অনুসরণ করাতে সে উদ্দেশ্যের কিছু মাত্র অসামঞ্জস্য হয় নাই। প্রাধান্য পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে, যে পৌরাণিক আচার্য্য দিগের বোড়শ মণ্ডলীর পরিভ্রমণোক্তি বিবিধ নহে। উহা লোক সিদ্ধির অনুবাদ মাত্র।

ঋষি সঙ্ঘ বৎসর পূর্ব্বে যোতিষ্মদ্যাগ্রগণ্য আর্ধ্যগণ পৃথিবীর গতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ;—

“ভপঞ্জরঃ স্থিরোভূরেবাবৃত্য বাবৃত্য উপসান্তময়ৌ প্রতিদিবসিকৌ  
সম্পাদয়তি গ্রহনক্ষত্রানাম্”।

নক্ষত্র চক্রে স্থির। পৃথিবীই স্বকক্ষে আবর্তন করিয়া প্রতিদিবস গ্রহণ নক্ষত্রগণের উদয় ও অস্ত সম্পাদন করিতেছে।

\*যদি পৃথিবীকে কেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও অন্য কেহ ধারণ করিয়া আছে এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়। অতএব যদি অনবস্থা দোষ পরিহারের নিমিস্ত্রশেষের স্বশক্তি কল্পনা করিতে হয় তবে পৃথিবীর সেই শক্তির স্বীকার করার দোষ কি? পৃথিবীও অষ্টমুখি স্বর্গের এক মুখি; অতএব তাহার শক্তি থাকা অসম্ভব নহে।

এই মতের উপপত্তি এবং অনুপপত্তি আলোচনা করিয়া প্রস্তাববাহলা করিবার আবশ্যক নাই।

“নৈবাস্তম্যময় ফেঁদায়ঃ সর্গদাসতঃ।

উদয়ান্তময়্যাং হি দর্শনাদর্শনং রসঃ।

বৈষ্ণবদৃষ্টিতে ভাবান্ স তেযামুদয়ঃ স্ততঃ।

সর্গদা বিদ্যমান সূর্যের অন্ত বা উদয় কিছুই নাই। রবির দর্শন ও অদর্শনের নাম উদয় ও অন্তময়। বাহারা যে সময় ভাস্কর দর্শন করে, তাহাদের পক্ষে সেই সময় উদয় কাল।

বিশুপূরণের এই বাক্য সূর্যের স্থিরতাবৈশিষ্ট্য আছে কিনা, বৈজ্ঞানিক পাঠকগণের উপর উহার মীমাংসার ভার রাখিয়া এখন আমরা লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করিলাম।

## পঞ্জিকা বিভূতি।

আমরা বাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। যখন শুনিলাম বহুতর পণ্ডিত মণ্ডলীর একত্রে সমাবেশ হইয়া এত বড় একটা গুরুতর বিচার মীমাংসা হইবে তখন আর কোন সাহসে বিশ্বাস করিব যে এ উদ্যোগ কেবল বাহুড়ির ও বাক্যাত্তর্য্যেই পর্য্যবেশিত হইবে। সুতরাং আমরা গতবারে যে আশা করিয়া লিখিয়াছিলাম, “শীঘ্রই জ্যোতির্বিদ মণ্ডলীর এক মহতী সভা হইয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে এবং আমরা আগামী বারে মীমাংসিত বিষয় পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিব,” সভার অবস্থা ও বিচার প্রণালী দেখিয়া আমাদের সে আশা ভরসা নিমূল হইয়াছে।

গত ২৭শে ভাদ্র সোমবার শ্রদ্ধের বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয়ের বহু ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ গৃহে বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর একটা বৃহত সভা হয়। সভায় অনেকগুলি খনাঢ্য গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লি প্রভৃতি স্থানের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথমে কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন উপযুক্ত শিষ্য নানাবিধ শাস্ত্রি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে আবর্তমান কাল হইতে প্রতি ৩৬০ দিনশত বাট বৎসর অন্তর এক নক্ষত্রাদির সংস্থিতির পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে এবং সেই সেই পরিবর্তন সময়ে দৃগ্গণিতের দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থিতির নিরূপণ করিয়া খণ্ডা সংস্কৃত হইয়াছে। শাস্ত্রও এইরূপ সংস্কারের অনুমোদন করিয়া বিধি দিয়াছেন। এখন, যখন আমরা দৃগ্গণিত দ্বারা দেখিতেছি যে গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে তখন কেননা শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া আমাদের প্রচলিত খণ্ডা সংস্কার করিব?

ভুলের একজন উৎকলী পণ্ডিত এই মতের শোষণ করা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের দেশে এইরূপ সংস্কার করিয়া পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছে এবং সেই পঞ্জিকার সঠিক বাপুদেব শাস্ত্রীর পঞ্জিকার স্মারক মিল আছে ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী কোন সং প্রতিবাদ না করিয়া একটা গোলযোগ করিয়া উঠেন। গোলযোগ এতটী বুদ্ধি হয় যে অবশেষে কোন সিংহাসন' অসাধ্য হইয়া উঠে। অগত্য এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে "আপাততঃ এরিষরে এই পর্যন্তই থাক। আগামী চন্দ্র গ্রহণোপলক্ষে বিশেষ বিচার করিয়া দেখা যাইবে কাতার পঞ্জিকা ঠিক হয়। সেই সময় বাহার পঞ্জিকা ঠিক হইবে তাহাকেই মানিয়া চলিতে হইবে"। অবশেষে পরম শ্রদ্ধের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র নারায়ণ মহাশয়ের অনুরোধ উঠিয়া বলেন, যে, যখন সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন একটা সিদ্ধান্ত আবশ্যিক; কিন্তু এ অবস্থায় সিদ্ধান্তটী বা কি হইবে? বাটনা পঞ্জিকার পরস্পর অনৈক্য দেখিয়া সকলের যে একটা সন্দেহ হইয়াছে তাহা ঠিক। অতএব কাতার যে মতে অধিক বিশ্বাস হইবে তিনি সেইরূপই কার্য্য করিবেন।

এই ত গেল সে দিন কার ব্যাপার! এখন আমরা করি কি? কাতার মত অনুসরণ করিব? সর্ব সময়ে ১০ মণ্ডলী মত আমাদের চতুর্গত হইয়াছে; এখন দশ মতেই ত আর সন্ধা পূজা হয় না। সুতরাং কোনমত অবলম্বনীয়? বাপুদেব শাস্ত্রী জ্যোতিষ সম্বন্ধে একজন জগৎ প্রসিদ্ধ লোক বলিলেও অতুষ্টি হয় না। তিনি শাস্ত্রানুসারে দৃগ্গণিত দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি নিরূপণ করিয়া যে গণনা করিয়াছেন তাহাই মানিয়া চলিব না। "নানা মনির নানু মত" যুক্ত বঙ্গীয় পঞ্জিকার বিশ্বাস করিব? আবার দেখুন উৎকল দেশে শাস্ত্রানুসারে সংস্কৃত হইয়া যে পঞ্জিকা চলিতেছে কাতার সঠিক বাপুদেব শাস্ত্রীর গণনার মিল হইতেছে। কিন্তু এদিকে স্বদেশে বর্ত্তমান পঞ্জিকা বাতির হইয়াছে কাতার পরস্পরের কোনরূপ মিল নাই। দর্শনার্থ নিম্নে তালিকা দিলাম।

মহাষ্টমীর স্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদগণের গণনা কল নিম্নে দেওয়া গেল,—

শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, ..	৪১।৪২	সিদ্ধান্তদর্শন মতে ...	... ..	৪১।৩৮
শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজ জ্যোতির্বিদ্যাবূষণ ..	৪২।৩০	শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বিদ্যাসাগর		
ভগ্নপ্রায় পঞ্জিকা ...	... ..	ভাস্করীমতে ...	... ..	৪৬।৪১
পঞ্জিকা ডাইরেটরী ...	... ..	২২পে ভাজ বৃষবার সংস্কৃত কলেক্সে		
মৈথিলী পঞ্জিকা ...	... ..	জ্যোতির্বিদসভার সিদ্ধান্তমতে		
বারবারী পঞ্জিকা ...	... ..	গণিতকাল ...	... ..	৪৭।২২
নববীপ পঞ্জিকা ...	... ..			

এখন দেখুন ব্যাপারটা দাঁড়াইল কোথায়? এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমরাও শ্রদ্ধের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইংল্যান্ডের যেদিকে অধিক বিশ্বাস জন্মিবে তাহার সেই রূপই পূজাদি করিবেন।



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

৭ম খণ্ড।

## নবমী পূজা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস।—মা গো! ইন্ডিয়ভোগ্য সকল প্রকার উপহার প্রদানেরই নিয়ম, প্রণালী জানিতে পারিলাম, কিন্তু এখন আর কএকটি কথা শুনিবার নিমিত্ত মন বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে, সেই বিষয়কটির মর্ম না জানিতে পারিলে শান্তিলাভ করিতে পারি না। মাগো! বলিদান করা কোন্ প্রকৃতির লোকের কর্তব্য, এবং উহা সত্ত্বাদি কোন গুণের উপহার, ইত্যাদি অনেকগুলি কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে।

জগদম্বা। (ঈষৎ করুণাপ্রকাশক নেত্রে) বাবা! আমার প্রসঙ্গে তুমি কোন কথাই বিস্মৃত হইবে না তোমার যত ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, আমি প্রসন্না থাকিয়াই বলিব, আমার কিছুতেই ক্রেশ বোধ হয় না, আমি অপ্রতিহত-বীৰ্য্যা। বলিদানের বিষয়ে উত্তর শুন,—বলিদানটা রাজস উপহার; আবার প্রকার ভেদে, তামাসও হইতে পারে, কিন্তু উহা সাত্ত্বিক উপহার কোন মতেই হয় না। অতএব রাজস আর তামস পূজাতেই এবং রাজস তামস প্রকৃতির লোকেরাই বলিদান করিবে। ঐহারা সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক লোক এবং সাত্ত্বিক পূজা করেন, তাঁহারা নিরামিষ দধি দুগ্ধাদি হবিষ্য উপহার দিবেন। ইহা অত্রতও কথিত আছে, “সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ” এবং বিপ্রাণাং



ক্ষীরবলয়ঃ ইত্যাদি।” এবং “রাজসো বলিরাধ্যাতো মাংস শোণিত সংযুতঃ” ইত্যাদি। সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী পূজা আর তামস, রাজস, ও সাত্বিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; ফলকথা ইদানীং আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি ষত প্রকার পূজা হয় তন্মধ্যে প্রতি লক্ষ্যেতে ১১১১ জনের পূজা কিছুই নহে, সাত্বিকও নহে, রাজসও নহে, তামসও নহে, উহা বাণেশ্বরাদিবং ক্রীড়া বিশেষ। তদ্ব্যতীত আর অবশিষ্ট দশজনের পূজার মধ্যেও, আবার ছয় জনের ঘোর তামস পূজা, তিন জনের রাজস পূজা আর এক জনের মাত্র হীনকল্পের সাত্বিকী পূজা হয়, কিন্তু তাহাও কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন জাতির সাত্বিক পূজা কদাচ সম্ভবে না, কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই কদাচিৎ কাহারও সাত্বিক প্রকৃতি ঘটে।

ভোলাদাস।—মা! রাজস পূজায় বলিদানটা না দিলেই কি নয়?

জগদম্বা।—হাঁ, তাহাই সত্য, না দিলেই নয়। আমি অগ্ৰত বলিয়াছি যে “বিনা মংগৈর্কিনান্নাংসৈর্নর্জিয়েৎ পরদেবতাম্।” “মংস্য মাংস ব্যতীত পরম দেবতার পূজা করিবে না”। বাস্তবিক বলিদান কার্যটা রূপান্তরিত সোম ষাগ মাত্র, বলিদান ব্যতীত সোম ষাগ হইতেই পারে না, ইহা স্থানান্তরে জানিতে পারিবে। অতএব বলিদান করা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু ষাহাদের পূজা, সাত্বিকী, রাজসী তামসী ইহার কিছুর মধ্যেই পড়ে না, কেবল একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, তাহারা যেন কখনই বলিদান করে না; একেত তাহারা আমাকে লইয়া ঐরূপ বিড়ম্বনা করার পাপেই কত ষাভনা ভোগ করিবে, তৎপর আবার অতিরিক্ত একটা হিংসা পাপ জড়াইলে আরও ঘোরতর নিরয়ে নিপতিত হইবে।

ভোলাদাস।—মাগো! তামস ও রাজস পূজা কি কেবল তোর এই আকৃতিরই হয়, অগ্ৰ আকৃতির কি তাহা হয় না? তগিনী পদ্মলয়া, তগিনী বাণী এবং বিষ্ণু প্রভৃতি তোর যে সকল আকৃতি, তাহাদের কি সাত্বিকী পূজা ব্যতীত তামস রাজস পূজা নাই?

জগদম্বা।—কেন বাবা? তোমার এ সন্দেহ হইল কেন?

ভোলাদাস।—মা! তুই বলিলি, বলিদান কেবল রাজস এবং

ভাসম পূজাতেই আবশ্যক হয়, উহা সাত্ত্বিক পূজার উপহার নহে ! কিন্তু ভগিনী কমলা, সরস্বতী এবং বিষ্ণুদেবের পূজাতে কখনই বলিদান হইতে দেখিতে পাই না, অতএব ঐ সকল আকৃতির পূজা কেবল সাত্ত্বিকী পূজা বলিয়াই বিবেচনা হয়।

জগদম্বা।—না বাবা, তোমার ভুল হইয়াছে বিষ্ণু, লক্ষ্মী; বাণী প্রভৃতি সমস্তই যখন আমারই রূপান্তরমাত্র, তখন এরূপ বিসদৃশ নিয়ম কদাচ হইতে পারে না; আমার সকল আকৃতিরই সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পূজা বিহিত আছে।

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সকল আকৃতিরই সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক এই তিন প্রকার উপাসনা আছে। এবং রাজসিক ও তামসিক পূজাতে যখন বলিদানের আবশ্যকতা, তখন আমার সকল আকৃতিরই রাজস এবং তামস পূজা করিলে বলিদান দিতে হইবে। বিষ্ণুরও রাজসও তামস পূজা করিলে বলিদান করা চাই, লক্ষ্মীরও চাই, সরস্বতীরও চাই, দেবদেবেরও চাই এবং অন্যান্য সকলেরও চাই। কিন্তু তন্মধ্যে কিছু কিছু ইতর বিশেষ আছে। বিষ্ণুর পূজাতে সাধারণ ছাগল বলি প্রশস্ত নহে, কিন্তু তিন বৎসরের কুতক্লীব মেঘ অথবা ছাগল তাঁহার নিকটে বলিদান করিতে হয়। আর লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজাতে সাধারণ ছাগাদি বলি দিলেই চলিতে পারে ! ইহা স্বয়ং আমি বিষ্ণুরূপেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে এবং সংহিতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছি,—“যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাম্বনঃ । তন্ত্ৰিবেদয়েনহং তদানন্ত্যায় কল্যাতে ॥” “যাহা সকলের প্রিয়বস্ত তাহা আমাকে নিবেদন করিবে, কিন্তু যাহা নিজের প্রিয়তম দ্রব্য তাহা সকলের অপ্রিয় হইলেও আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে। (ভাগবত) অতএব মাংস যাহার প্রিয় সে মাংস দ্বারাই বিষ্ণুরূপের আরাধনা করিতে পারে, ইহা এই শ্লোকের তাৎপর্য্যাপ্ত ফল। তৎপর বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে,—“নাতক্ল্যং দদ্যাত্নৈবেদ্যার্থে \* \*” নিজের যাহা তক্ষণীয় তাহাই বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। অতএব মাংসাদিও দিতে পারিবে। আবার বরাহ পুরাণেও, আমি বিষ্ণুরূপেই বলিয়াছি,—

“মার্গং মাংসং তথাছাগং শাশং সমুগৃহতে ।

এতানিমে প্রিয়ানিস্যঃ প্রযোজ্যানি বহুধরে ॥”

“হে বহুধরে ! মৃগমাংস ছাগমাংস এবং শশক মাংস আমার প্রিয়

প্রিয় বস্ত্র, অতএব আমার পূজাতে উহা নিবেদন করিবে। এবং ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ খেতো যুদ্ধোহজ্ঞাপতিঃ। বান্ধীনসঃ সবিজ্ঞেয়ো মম বিকোরতি প্রিয়ঃ। (নিরুত্তর তন্ত্র)। “খেত বর্ণ, যুদ্ধ এবং তিন বৎসর যাবৎ কৃতক্লীব, এইরূপ মেঘ বা ছাগলের নাম বান্ধীনস। বান্ধীনস আমার নিতান্ত প্রিয় দ্রব্য” ইহাও আমার বিষ্ণুরূপেরই উক্তি। অতএব মাংসাদি ব্যতীত আমার বিষ্ণু প্রভৃতি কোন আকৃতিরই তামস ও রাজস পূজা হয় না। ঐ সকল আকৃতির রাজস ও তামস পূজা বিষয়ে মাংসাদি দেওয়ার নিষেধ কুত্ৰাপি নাই। অতএব তাহা দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য। তবে যে কোনখানে নিষেধ দেখিতে পাও তাহা সাত্ত্বিক পূজা লক্ষ্য করিয়া, সাত্ত্বিক পূজাতে আমার কোন আকৃতির নিকটেই বলিদান করিতে পাইবে না।

ভোলাদাস।—মাগো! তোর আকৃতি ভেদে যদি সাত্ত্বিকাদি ভিন্ন ভিন্ন পূজা বিধি না হয়, তোর সকল আকৃতিরই যদি ত্রিবিধ পূজাই বিহিত থাকে, তবে সকল আকৃতিতে সমান উপহার দেওয়ার বিধি না করিয়া, এক-এক প্রকার পুষ্পোপকরণ বিহিত করিলি কেন? মা, তোর এই আকৃতির পূজা করিতে হইলে জবাফুল, বিশ্বদল, রক্তচন্দন, রুদ্রাক্ষ, ও ভস্মাদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, এবং তুলসী পত্রাদি নিতান্ত নিষিদ্ধ, আবার বাবার পূজাতে শুক্ল পুষ্পই প্রশস্ত, এবং জবা পুষ্প, রক্ত চন্দনাদি নিষিদ্ধ। তৎপর বিষ্ণু পূজাতে তুলসীদল ও তুলসী মালা নিতান্ত আবশ্যক, আবার বিশ্বপত্র ও রুদ্রাক্ষাদি অপ্রশস্ত, ইত্যাদি প্রভেদ হইল কেন?

জগদম্বা।—বৎস! ঐ সকল উপকরণাদির প্রভেদ সাত্ত্বিক পূজাদির কোন চিহ্ন নহে। কারণ আমার যে যে আকৃতির পূজায় বিশেষ বিশেষ রূপে যে যে উপহারের আবশ্যকতা বিষয়ে বিধি আছে, সেই সেই উপকরণ আমার সেই সেই আকৃতির ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক হয়। জবা বিশ্ব-পত্রাদি, আমার তামস, রাজস, সাত্ত্বিক, এই ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক। দেবদেবেরও সাত্ত্বিকাদি সকল প্রকার পূজাতেই ভস্ম, রুদ্রাক্ষাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বিষ্ণুর সকল পূজাতেই তুলসী পত্রাদি প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু যদি উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন হইত; তবে আমার এই আকৃতিরও এক এক প্রকার পূজাতে ইহার পার্থক্য দেখিতে পাইতে। বাস্তবিক আমার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিস্ফুরণের নিমিত্তই তুলসী জবা বিশ্বদলাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কতকগুলি উপহারের বিশেষ বিশেষ নিয়ম

আছে । আমার প্রত্যেক আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে । আমার এই বর্তমান আকৃতির এক প্রকার ভাব আছে, আবার দেবদেব আকৃতির আর একভাব, এবং বিষ্ণু আকৃতির আর এক ভাব ইত্যাদি । এই এক এক ভাবের ক্ষুরণের জন্য এক এক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে । তন্ময় রুদ্রাদি আমার শৈবভাবপরিস্কুরণের সহায়তা করে, জবা রক্ত চন্দনাদি আমার এই মাতৃভাবপরিস্কুরণের সাহায্য করে, এবং তুলসী তিলকাদি আমার বৈষ্ণবভাবোদ্ভেকের সাহায্য করে, এই নিমিত্ত এক এক আকৃতিতে এক এক দ্রব্যের দ্বারা পূজা বিধি আছে । অতএব উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন নহে ।

ভোলাদাস ।—মা ! ইদানীং তোর বিষ্ণু আকৃতির যত উপাসক আছে, তাহারা সকলেরই কি সাত্ত্বিক উপাসনা করে ?

জগদম্বা না বাবা ! তাহা কিরূপে হইবে, আজ কাল দশ সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও জকজন মাত্র লোক সাত্ত্বিক উপাসনায় অধিকারী হয়, কি না, তাহা বিচার্যস্থল । কিন্তু অল্প জাতির মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা এক কালেই বিরল । তাহাতে আবার, ইদানীং আমার বিষ্ণু আকৃতির উপাসকদিগের মধ্যে প্রায় সমস্তই অপর জাতীয় লোক, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতি অতীব অল্প । সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা কোথা হইতে হইবে ? সাত্ত্বিক উপাসনা বেরূপ গুরুতর বিষয় তাহাতে পূর্বেই বলিয়াছি ! তাহা কি এদের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হয় ? কখনই না । ফলপক্ষে কেবল কৃষ্ণাদি আকৃতির উপাসক সন্ধ্যার প্রেণীভেদ করিলে উহার পাঁচ লক্ষের মধ্যে কেবল দশ জন মাত্র বাদে আর সমস্তই “কিছুই না” র মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহারা বাস্তবিক কোন প্রকার উপাসক নহে, কোন প্রকার তত্ত্বও নহে । সুতরাং তাহাদের সহিত, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পূজাদির কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, ধর্ম কর্মের সঙ্গেও কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । অতএব তাহাদিগকে একেবারেই বাদ দেও ; কিন্তু অবশিষ্ট দশ জনের মধ্যেও ছয় জন তামস উপাসক, তিন জন রাজস উপাসক, এবং একজন মাত্র হীনকর্মের সাত্ত্বিক উপাসক হইতে পারে, কিন্তু তাহাও ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাইবে, অতএব বৈষ্ণব নামধারী হইলেই সাত্ত্বিক উপাসক হয় না ।

ভোলাদাস ।—মা তবে উহাদের মধ্যেই বলিদান করিতে দেখিতে পাই না কেন ?

জগদম্বা ।—বাহারা “কিছুই না” বলিয়াছি তাহারা ঈর্ষা ও স্পর্ধাদি নীচ প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া বলিদান করেন। আর বাহারা প্রকৃতপক্ষে তামসাদি উপাসক, তাহারা অজ্ঞতা দি নিবন্ধনই করে না। আর বাহারা জ্ঞানবান তাঁহারাও অধিকতর পরিভ্রম চেষ্টাদি করার আলম্বে বলিদান করেন না। কারণ একটি মেঘ ক্রীত করিয়া তিন বৎসর প্রতিপালন না করিলে বিষ্ণু পূজার বলি হওয়ার উপায় নাই। এই জন্তই বিষ্ণু পূজার বলিদান এত বিরল দেখিতে পাও। কিন্তু কুএপি যে, না হয় তাহা নহে। আর বাহারা সাত্বিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদেরতো বলিদান করার সম্ভাবনাই নাই।

ভোলাদাস ।—মাগো ! নিরামিষাদি সাত্বিক আহার্য্য ব্যবহার দ্বারা পূজা করিলেও কি তাহা সাত্বিক পূজা হইবে না ?

জগদম্বা ।—না বাবা ! তাহা কেমন করিয়া হইবে ?—তুমি কি পূর্ক কথা গুলি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ ?

ভোলাদাস ।—না মা, হইনাই তবে এখনও তোর সকল কথার যোজনা করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রথিত করিতে পারি নাই।

জগদম্বা ।—তবে আমিই যোজনা করিয়া নিষ্কৃষ্টার্থ বলিতেছি, তুমি শুন,—পূর্কোক্ত সত্ত্ব প্রাকৃতিক লোক পূর্কোক্ত সাত্বিক কামনা করিয়া, পূর্কোক্ত সাত্বিক ভক্তির সহিত পূর্কোক্ত সাত্বিক ভাবের ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, যদি গন্ধ পুষ্প পরিচ্ছদ ও শয্যাসনাদি সমস্তগুলি উপকরণই সাত্বিক রূপে সাত্বিক ভাবে এবং সাত্বিক মতে, আহরণ করিয়া, আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই সত্ত্বিকী পূজা। এবং পূর্কোক্ত রাজস অধিকারী বা রাজস প্রাকৃতিক লোক, রাজস ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, রাজস কামনা ও রাজস ভাবের সহিত, রাজস অনুষ্ঠানে সমস্ত গুলি রাজস উপকরণের দ্বারা যদি আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই রাজসী পূজা হইবে। আর পূর্কোক্ত তামসিক কামনায়, তামসিক ভাব ও তামসিক ভক্তির সহিত, তামসিক অনুষ্ঠানে যদি কোন তামস অধিকারী সমস্তগুলি তামসিক উপহারের দ্বারা আমার কোন আকৃতির পূজা করে তাহাই তামসী পূজা। সাত্বিকী, রাজসী, বা তামসী, যে কোন পূজাই হউক তাহাতেই এই সমস্তগুলি উপকরণ সমভাবে থাকা আবশ্যক ; তদ্ব্যতীত, তাহা কোন পূজার লক্ষণ মধ্যেই পণ্য হইতে পারে না। অতএব তামস কামনা, তামস ভাব এবং তামস ভক্তি সম্পন্ন

কোন তামস প্রকৃতক লোক যদি অত্র সমস্ত গুলি উপহারই তামস লক্ষণাবিত করে, আর কেবল নৈবেদ্যের বেলায় নিরামিষ দেয় তাহা সাত্ত্বিকী পূজা নহে, তাহা অজহীন তামস পূজা অথবা বিড়ম্বনা, কিম্বা একটা জীড়া বিশেষ মাত্র । অতএব যথা নির্দিষ্ট পূজা করাই কর্তব্য । তাহা হইতেই জীব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে পারে । তামস পূজাদি করিতে করিতে, যখন তামস প্রকৃতি ক্ষীণ হইয়া রজো গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন তামস ভাব, তামস ভক্তি, তামস কামনা, তামস অনুষ্ঠান, এবং তামস দ্রব্যের প্রতি অনুরাগাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এবং রাজস কামনা রাজস ভাব, রাজস প্রকৃতি, রাজস ভক্তি, রাজস অনুষ্ঠান, এবং রাজস দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ হইবে । তখন হইতে রাজস পূজাই করিবে । তৎপর রাজস পূজা করিতে করিতে আবার ঐ সকল রাজস বিষয় বিনষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক কামনা, সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি হইবে । তখন আমার সাত্ত্বিকী পূজা করিবে । তৎপর, ঐ অবস্থাও অতীত হইয়া যাইবে, তখন জীব নিরৈশ্বর্য্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইতে পারিবে । কিন্তু ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই অধঃপাত হইবে ।

তোলাদাস ।—মাগো ! তোর নিজের কি ভাল মন্দ বোধ কিছুমাত্রই নাই ? ভাল মন্দ সমস্তই কি তোর সমান ?

জগদম্বা ।—( প্রসন্নাস্ত্রে ) কেন বাবা ? একথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে ?

তোলাদাস । কেন জিজ্ঞাসিলাম তাহা তুই বুঝিস নাই কি ? না বুঝিলে তোর মুখখানি হাসি-হাসি হইল কেন ? তথাপি তোর আমার নিকট ভনিবার ইচ্ছা ! তা বলি ; মা ! তুই বলিলি, আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে যে জাতীয় উপহার যাহার প্রিয়, সে সেই জাতীয় ভোগ্য দ্রব্যের দ্বারা তোর পরিচর্যা করিবে, তাহাই তুই সাদরে গ্রহণ করিবি । কিন্তু তোর নিজের ভাল মন্দ বোধ থাকিলে তাহা হইবে কেন ? যাহার ভাল মন্দ বোধ থাকে সে আপনার প্রিয়দ্রব্যের দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ।

জগদম্বা । বৎস ! “বোধ” আমারই রূপান্তর মাত্র, এবং বোধবতীও একমাত্র আমি । ইহা দেবগণও বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতা-নাঞ্চাখিলেষু বা । ভূতেষু সততন্তু স্তৈ ব্যাপ্তি দেবৈর্যনমোনমঃ ॥ চিতি রূপেণ

বাক্যসম্বন্ধে ব্যাপ্তিহিতাজগৎ । \* \* \* ” বাদেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি ” । অতএব এই অনন্ত কোটিভুবনের মধ্যে, বাহার বাহ্য কিছু বোধ হইতেছে, সেই সমস্তবোধ স্বরূপাই আমি, এবং সেই সমস্তবোধ আমারই হইতেছে, অতরাং আমি ভাল-মন্দ সমস্তই বুঝি । কিন্তু সে ভাল মন্দ বোধ, তোমাদের দ্বারা ভাল-মন্দ বোধ নহে, এবং সে ভাল-মন্দ বোধ সকলকে বুঝানও সম্ভবে না । ফল কথা ; আমার ভাল-মন্দ বোধ থাকিলেও ভক্তের ভাল-মন্দই আমার ভাল এবং মন্দ ।

তোলাদাস ।—মা গো ! তুই বাহাকে বুঝাইবি তাহার কিছুতেই ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, মা ! তোর এই অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকতা হইয়াছে, ইহা আমাকে না বলিলে, কোনমতেও ছাড়িব না ।

জগদম্বা ।—বৎস ! তোমার অনুরোধ ক্রমে এই গুরুতর বিষয় বলিতে হইল, কিন্তু সাধারণ লোক ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না তুমিও মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ করিও । প্রথমে, তুমিই একটি কথার উত্তর কর ; তুমি বল দেখি, কি কারণে কোন বিষয় ভাল বা মন্দ বলিয়া অনুভূত হয় ?

তোলাদাস ।—সুখবোধ এবং দুঃখবোধ হওয়াই ভাল-মন্দ অনুভবের কারণ । যে বিষয়ের দ্বারা সুখানুভব হয় তাহাকেই লোকে ভাল বলিয়া থাকে, আর যে বিষয়ের দ্বারা দুঃখানুভব হয় তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে ।

জগদম্বা ।—সুখ আর দুঃখ কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ ?

তোলাদাস ।—তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত কি, না, তুই ই জানিস । মা ! শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, “অনুকূল বেদনীয়ং সুখম্” এবং “বাধনা লক্ষণং দুঃখম্” ইহার অর্থ এই জানি যে, আমার অনুকূলভাবে বাহার অনুভব হয় সেইই সুখ, এবং প্রতিকূল বা বাধার ভাবে বাহার অনুভব হয় সেইই দুঃখ ।

জগদম্বা ।—তাহাই সত্য ; কিন্তু তাহার মর্ম্ম জানা আবশ্যক ; তাহা আমার নিকট শুন, নচেৎ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিবে না । লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে, সুখ, দুঃখ ও মোহ এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণকে স্বভাবতঃই অলৌকিক সুখ, দুঃখ এবং মোহস্বরূপ বলা গিয়া থাকে । এই জন্যই আমার ঐশ্বর্য পুত্রগণ বলিয়াছেন “প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাদ্যেও নানামতেভিরৈখম্” ইত্যাদি ”

(সাধ্যা যঃ ১ অঃ ১২৭ হু) । আত্মার দর্শন ও স্পর্শাদি শক্তিগুলি পরি-  
ক্ষুরিত হইয়া, রূপ, রস, গন্ধস্পর্শাদি বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে বধন অবস্থিত বা  
অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন তাহার সেই অনর্গল বা অপ্রবাহিত  
অবস্থাকেই “লৌকিকস্থ” বলে। এবং আত্মার পরিক্ষুরিত শক্তিগুলি  
বধন ঐ সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতিকূলতার রীতিমতে প্রবাহিত হইতেবাধা  
প্রাপ্ত হয় তখন সেই শক্তি গুলির বাধিত অবস্থাকেই “লৌকিক হুঃখ”  
বলা যায় থাকে। এতদ্ব্যতীত, লৌকিকস্থ হুঃখাদির আর কোনরূপ  
সম্পদ হইতে পারে না। কেমন ইহা বুঝিতে পারিলে ?

ক্রমশঃ

## “পরকাল” ।

বিষয়সংসার প্রাণিপুঞ্জে পরিবৃত । ধর্মাধীনে কেহ দেবতা, কেহ মানুষ,  
কেহ পশু, কেহ বা বৃক্ষ বন্যরী প্রভৃতিতে পরিণত । প্রত্যেকে এক একটা  
দেহ আশ্রয় করিয়া স্থখ হুঃখ ভোগ করিতেছে। শরীরী শরীর আশ্রয় না  
করিয়া ভোগ করিতে পারে না। এজগৎ শরীরকে জোপায়তন, বা তোপা-  
ধিষ্ঠান বলে। আত্মা ভোগ সাধন শরীরে উপস্থিত হইয়া এক একটা জীব  
শব্দে অভিহিত হয়। বধন সেই উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায় তখন আত্মা  
স্বরূপে অবস্থান করে। সেই শরীর ত্রিবিধ, কারণ-শরীর, লিঙ্গ-শরীর ও  
স্থূল-শরীর। পরমেশ্বর, সত্য জ্ঞান ও আনন্দময়, মুক্ত, নিঃশব্দ নিরঞ্জন।  
ইহা স্বরূপ। বধন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির সাক্ষর করেন, তখন তিনি  
মায়াময়, তিনি লোকবৎ লীলা করিবার জন্ত কখন মায়াপট বিস্তৃত করিয়া  
অভ্যাসার্থ্য সৃষ্টি কোশল প্রকাশ করিয়া রক্ষা করেন, কখন তাহার উপসংহার  
করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্বশক্তিমান, নিত্য সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম  
কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। উর্ধ্বনাত যেমন স্বীয় শরীর হইতে তত্ত  
বিনির্গত করিয়া অপূর্ণ জাল রচনা করে। পরমেশ্বরও যেমন মায়াজাল  
বিস্তার করিয়া জগৎ সর্বনাশি ব্যাপারে ব্যাপ্ত হন। ঐ মায়া ত্রিগুণময়ী।  
সব, রস ও তমোময়। উপর্যুপরি সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া প্রকৃতি আখ্যায়



আখ্যাত। গুণের আধিক্যানুসারে ঐ প্রকৃতি দুইভাবে বিভক্ত, মায়াস্ত  
অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈশ্ৰল্য্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া, এবং মালিষ্ঠ  
প্রযুক্ত, দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে কারণ শরীর বলা  
ষায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ  
অবয়ব সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম-শরীরকেই লিঙ্গ-শরীর বলা যায়।  
দৃশ্যমান পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত পঞ্চ ভূতের সমষ্টিতে, পঞ্চীকরণ রীতিতে  
সংগঠিত। পূর্বোক্ত লিঙ্গ-শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতগ্রাম হইতে উৎপাদিত  
উহাদের মূল উপাদান অবিদ্যা, এই জন্ত অবিদ্যাকে কারণ-শরীর বলা যায়।  
আর পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে দৃশ্যমান স্থূল শরীর উৎপন্ন। এই শরীর  
ত্রয়ের মধ্যে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের কথা এ স্থলে সময়ে  
সময়ে বলা হইবে এবং ত্রিবিধ হইলেও আপাততঃ দ্বিবিধ শরীরের কথাই  
উপগ্ৰস্ত হইবে।

জীব কাহাকে বলে ইহা একরূপ বুঝান চলে, আরও বিশদ করিয়া  
বুঝাইবার জন্ত, কঠবল্লীর একটী প্রতি এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।  
উহা রূপক আকারে বিস্তৃত।

“ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতুঃ ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহবিষয়াং স্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহ মনীষিণঃ ॥ ”

জীব ও তাহার দেহ, রথী ও রথাকারে রূপিত হইয়াছে। আত্মাকে  
অর্থাৎ জীবকে \* রথী বলিয়া জানিও। শরীর তাহার রথ। ইন্দ্রিয়গণ  
অবস্থানীয়, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ ( লাগাম ), বিষয় ( রূপ, রস, গন্ধ,  
স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে ) উহার পথ স্বরূপ। অতএব দেহ  
ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত ভোক্তা। ভোক্তা জীব সংসারী। কেবল আত্মার  
ভোক্তৃত্ব নাই, বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে উপহিত হইয়া জীব ভোক্তা, সাংসার ও  
বদ্ধ।

“ নহি কেবল স্যাৎমানো ভোক্তৃত্বমস্তি

বুদ্ধ্যাভ্যুপাধিকৃত মেব তন্ত ভোক্তৃত্বম্ ॥ ” শঙ্কর ভাষ্যম্ ।

\* আত্মা জীবে যতো দেহে ভবাবে পরমাত্মনীতি ; বিবঃ

এখন স্পষ্টই দেখান যাইতে পারে, যে, ঈশ্বর যখন কোনও দেহে উপহিত হন তখন উহা ভোক্তা জীব বলিয়া পরিগণিত হন। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয় স্নিকর্ষ ঘটিলে উহা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই। পৃথিবীতে দেহিগণ ইন্দ্রিয় সাহায্য ভিন্ন কোন কিছু অনুভব করিতে পারে না, ইহা দুর্ভাগ্যবান প্রয়াস পাইতে হয় না, কারণ উহা সকলেই অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং সুখ দুঃখাদিও তজ্জপেই ভোক্তা ভোগ করিয়া থাকে। ভূমি সন্তানের কমনীয় সুকুমার দেহ-যষ্টি সন্দর্শন করিলে, স্নেহ বশতঃ আদরে তাহাকে কোড়ে স্থাপন করিলে, স্পর্শ করিয়া শরীর জুড়াইল। তাহার হৃৎ মূর কোমল বচনাবলীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল, দেহ আভ্রাণ করিলে, সুকোমল গওদেশে চুম্বন করিলে, এই ক্রিয়াগুলির প্রত্যেক কার্যেই সুখানুভব হইতে লাগিল, ইহার প্রত্যেক কার্য এক একটী ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ। যদি কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হইত, তবে অবশ্যই তদিস্রিয়জ সুখানুভব হইত না। চক্ষু না থাকিলে কখনই স্নেহ পুত্তলিকা সন্তানের রূপ মায়ুরী পরিগ্রহ হইত না, সুতরাং সেই সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ইহা প্রতিপাদিত হইল যে, ইন্দ্রিয়, প্রবণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অবয়বগুলি আত্মাধ্যাসে এক একটী জীব বলিয়া গণিত হয়। জীব যখন সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, তখন জীব দেহী। অর্থাৎ আত্মা উপাধি সম্বন্ধে জীব, আর উপাধি সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিলে মুক্ত। যিনি ভোগ করেন তাহাকে ভোক্তা বলে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট রূপে উক্ত আছে দেহ ইন্দ্রিয় ও মন নিয়া ভোক্তা জীব। উহার কোন অবয়বের অভাব থাকিলে সম্পূর্ণ জীবত্ব থাকে না। অবনীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উন্নতি কি অবনতি, সুখ বা দুঃখ, যাগ কিছু ভোগ করিবে, কোন দেহ অবলম্বন না করিয়া ভোগ করিতে পারে না ইহা যেন শ্রুতি বলিয়া দিয়াছে, যুক্তি কি তর্ক যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ কর, ঐ সঙ্কতি কোনও রূপে বিচলিত হইবার নহে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি না থাকিলে সে কখনও কিছু উপভোগ করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণিক, যৌক্তিক, নিশ্চয় স্থির সত্য ও অকাট্য কথা।

এখন দেখা আবশ্যক পরকাল কি? জীব কর্ম বশে যে দেহ অবলম্বন করিল তাহা তাহার একজন্ম, কতকদিন পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া আবার অন্যদেহ অবলম্বন করিল উহা পুনর্জন্ম। উহাই পরকাল। জন্ম মৃত্যু, পরকাল নিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, কতদিন প্রারম্ভ

নাশ না হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিবে, ততদিন মুক্তি হইবেনা, হুতরাং বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে উহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রোত জ্ঞান পূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র নমুহতি ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায়জীর্ণ।

শ্রুত্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিহার করিয়া নূতন বস্ত্র পরিগ্রহ করে, তেমন ভোক্তা জীর্ণ ভুক্তদেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি দেহ গ্রহণ করে। এখন বাহার মৃত্যু হইল তাহার পূর্ক হইতেই তাহার ভাবনাময় একটা দেহের বীজ সৃষ্টি হইল। ভোক্তা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ক দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ গ্রহণ করিল। কর্মবশে, তপস্যার গতিতে, স্মৃতি সঙ্কয়ের তারতম্যে অথবা দুষ্কৃতির উপচয়ে দেহের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে এবং ভোগস্থানের ও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ফল কথা জন্ম হইলে মৃত্যু, এবং মৃত্যু হইলেও জন্ম ইহা নিশ্চয়। যত দিন মুক্তি নাহইবে এই চক্র ভ্রমণের বিরাম নাই।

জাতস্য হি ক্রবো মৃত্যু ক্রবং জন্ম মৃতস্যচ।

তস্মাদপরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতু মহসি ॥

ভগবদ্গীতা।

জন্ম মৃত্যু ভোক্তার অবশ্যজ্ঞাবী। আজ বাহার মৃত্যু হইল, স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম দেহসহ অন্য স্থূল দেহের অঙ্কুরে প্রবেশ করিল, ভোক্তা ইহ জগতের কর্মাকর্ষের ফল ভোগ করিতে, এই যে দেহ গ্রহণ করিল, উহা পুনর্জন্ম, উহাই প্রেত্য ভাব। মৃত্যুর অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের পূর্ক মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যে সকল শুভাশুভ কর্ম করিয়াছে তাহার কালকাল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রয়োজন, হুতরাং দেহী নাহইলে ভোক্তার ভোগ হয় না। মৃত্যু হইলেই তৎক্ষণাৎ জন্ম হইবে ইহা উক্ত গীতা বাক্যে একটি কৃত হইয়াছে

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একজন্ম ইহ কাল । আবার উহার পরবর্তী জন্ম পুনর্জন্ম পরকাল । ইহা নিয়ত ঘূর্ণায়মান ।

এই শ্রৌত তত্ত্ব অতি পুরাকালে ঈশ্বর প্রমুখে বিনির্গত হইয়াছে, ঋষিসঙ্গ তাহাই জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্মাবান লোকগণ ভবিষ্যৎ সুখ আশায় ইহকালে কত ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ প্রারদ্ধা নাশ করিয়া ভূমানন্দ পানে চিরবিভোর হইয়াছেন, কেহ স্মৃতি রাশির সঞ্চয় করিয়াক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়াছেন । কেহবা উর্দ্ধে উঠিয়া দেবতাদি জন্ম ভোগ করিতেছেন, কেহবা তাহাও অকিঞ্চিতকর বোধে নির্দাশ জন্ম সমস্ত জ্ঞানাপ্তিতে ভস্মসাৎ করিতেছেন ।

পরকাল সম্বন্ধীয় এই প্রকৃত তত্ত্ব বাহারা মানিয়া চলেন নাই, তাহারাই নাস্তিক । পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে পুরাকালে নাস্তিক বলিয়া জন সমাজে হতাদর হইত । বাহারা পরকাল বিশ্বাস নাকরিত তাহারাই নাস্তিক ইহা সভাব্য পাণিনি সূত্রে ও জ্ঞানায়ার ।

অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ । ৪ । ৪ । ৬০ পং ।

এই সূত্রের টীকায় ভট্টোজ্জি দীক্ষিত স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, তদস্যোত্যেব । অস্তি পরলোকে ইত্যেবং মতির্ধস্য স আস্তিকঃ নাস্তীতি মতির্ধস্য স নাস্তিকঃ । দিষ্ট মিতি মতি ধস্য স দৈষ্টিকঃ ।

অতএব পর লোক-মতি-শূন্য লোক প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক । বাহারা জগৎ স্রষ্টার সত্তা মানিতনা তাহাদিগকে বৈনাশিক বলিত । ছান্দোগ্য শ্রুতির বস্তু প্রপাঠকে “তদ্বৈক আহঃ” (তদ্ হ একে আহঃ,) এই শ্রুতির ভাষ্যে ভগবান ভাষ্য কার সুস্পষ্ট রূপে লিখিয়াছেন” একে বৈনাশিকা আহঃ সুতরাং জগৎ কর্তার সত্তা নামানিলে বৈনাশিক সংজ্ঞা লাভ করিত । আস্তিক ও সাধকগণ তাহাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন । অধুনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেই নাস্তিক বলে এমন কি অধস্তন আধুনিক কোনও কোষ সংগ্রাহক স্বসঙ্কলিত অভিধানে উহার আভাস দিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে উহা আর্থ্য তাৎপর্য্যনহে । কারণ বর্তমান সময়ে পরকাল সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা শুনাযায়না আত্মাও কম, সুতরাং নাস্তিক সম্মুখা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে । আমরা পরে পরে তাহা বলিতেছি । প্রকৃত নাস্তিক কি তাহাও বলাহইল । আবার দবে ঐ পরকাল তত্ত্বের ও সর্ব বিদ্যার নিদান, উহা অপৌরুষেয় সেই

বেদ না মানিলে ও নাস্তিক হইতে হয় বরং তাহারা পাশও বলিয়া  
অনাদৃত ।

“পাশও—পাতি রক্ষতি হুরিতেভ্যঃ পাধাতোঃকিপ্

পাঃ বেদধর্ম্মং যত্ত্বতি নিষ্কলং করেতি ।

পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পাশকেন নিগদ্যতে ।

যত্ত্বত্তিতুতং যস্যাপাশওন্তেন কীর্তিতাঃ ॥ ইত্যুক্তে বেদাচার  
ত্যাগিনি । নবীন বৈদিকগণ প্রায়ই এতদধর্ম্ম বিবর্জিত অথবা এতদধর্ম্ম  
ভ্রষ্ট এবং বিরোধী হুতরাং তাহারা পাশও এই কথা স্পষ্টরূপে বলাবাইতে-  
পারে । কালবশে পাশওগণের বচন রচনা ও আধ্যাত্মিতে স্থান প্রাপ্ত  
হইতেছে, কিম্বা চর্যামতঃপরম্ ।

পাশওগণ সংপ্রতি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ ব্যগ্র, ইহা বলা  
হইল । এখন নাস্তিক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা প্রদর্শন  
করা বাইতেছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং প্রতিপাদন করিয়াছি  
যে পরলোক-মতি-শূন্য লোকগণ নাস্তিক । হিন্দু ভিন্ন প্রায় সম্প্রদায়ই  
নাস্তিক, যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরকাল তত্ত্বের বিচার করা যায়  
তবে উহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে । এখন তত সময় হইবে কিনা  
সন্দেহ, তবে বাবু ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব; কারণ বাবুগণ  
বলিয়া থাকেন তাহারা সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম  
প্রচার করিতেছেন । কিন্তু তাহারা নাস্তিক কিনা একবার দেখা যাউক

বাবুগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না এবং পুনর্জন্ম মানেন না;  
হুতরাং বলিতে পারা যায় পরকালও মানেন না অতএব নাস্তিক ।  
উনবিংশ শতাব্দীর গর্ভিত বাবুগণ আপাততঃ এই কথার অসত্য  
হইতে পারেন, কিন্তু অতর্কিত রূপে অসন্তোষ হুঃখে কাতর না হইয়া  
একটু বিবেচনা করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন ।  
পুনর্জন্ম ভিন্ন পরকাল হয় না । যদি কেহ পুনর্জন্ম ভিন্ন পরকাল ভোগ  
(মুক্ত ভিন্ন) প্রমাণ করিতে পারেন তবে একান্ত উপকার প্রাপ্তি বোধ করিব ।  
কেবল “পরকাল” এই শব্দটির আবৃত্তি করিলেই পরকালে বিশ্বাস আছে,  
হুতরাং আস্তিক এরূপ বলিতে পারা যায় না । একজন বাবু পরকাল  
স্বীকার করেন কিন্তু উহার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমতঃ “বেদাম”  
“শেনসার” কতকগুলি স্মৃতিস্মরণ করিয়া বলিলেন, কেন ? পুন-

ক'র কেন ? ইহা কি আর উনবিংশ সেন্দূরীতে খাটে ? পরকালে আত্মার অনন্ত উন্নতি হইবে । আত্মা কি “সোল” (soul) ? ইহার পর বাবুর বিশ্বাস যে তাঁহার অধীতবিরয়ের পরম উন্নতি হইবে, বাহা তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্ত হইয়াছেন তাহাও স্মৃতিপথে সন্নিবিষ্ট হইয়া পরলোকে বাবুকে পরম বাবু করিবে । ভালই, বাবু যেন পরম হইলেন । পরলোকে বসিয়া বাবু যে ঐ সময়ে উন্নতি-সুখভোগ করিবেন, তখন কি বাবু কোনরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া এক প্রকার জীবরূপে ভোগ করিবেন ? না অন্যোপায়ে ? যদি কোন জীবদেহে তাহার ভোগ হয়, তবে অবশ্য পুনর্জন্ম হইল ; কারণ পূর্বোক্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ অবলম্বন করিতে হইতেছে । আর যদি তাহা স্বীকার না করিতে ইচ্ছা করেন তবে বড় বিষম সমস্যা । কারণ, কেবল আত্মা, পরমাশ্রয় বলিয়া কথিত হয়, তাঁহার বিষয় সুখ ভোক্তৃত্ব বা উন্নতি অবনতি নাই । যদি জীব ভোক্তা, তবে তাহার দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ চাই, নচেৎ ভোক্তৃত্ব সাধন হয় না । বাবু বাহাকে “সোল” বলেন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি আছে কিনা বাবু তাহা বিশেষ বলিতে পারেন না । অথচ “অনন্ত উন্নতি” বলিয়া ধ্বনি করেন । যদি দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি রহিত আত্মা হয় তবে তাহার ভোগ সাধন অভাবে জড়পদার্থ বিশেষ হইয়া থাকিতে হয় তাহার সুখ দুঃখ ভোগ কি ? আর অনন্ত উন্নতিই বা কি ? সে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ । আবার প্রথম জন্মে যে সমস্ত স্মৃতি করিয়াছিল পরকালে তাহার ভোগ হইবে, আর স্মৃতি ভোগ হইবে না, একরূপ হইলে “পরকাল” একখাটীও স্বীকার না করিলে ভাল হয় । কারণ, দোষের দণ্ড হইবে না, কেবল সুখের ভোগ হইবে, ইহা কোন্ দৈবীয় যুক্তি ? শত দোষে দোষী ব্যক্তিও মরিলেই নিষ্কৃতি, ইহা লোকায়ত চার্কাক মত । আন্তিকের নহে বিশেষতঃ উহার কোন যুক্তিও নাই । অপরঞ্চ বাবুগণের মতে যোগ তপস্যা অকিঞ্চিৎকর সুতরাং তপস্যায় অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে ইহাও অযৌক্তিক । সুতরাং বাবুগণ কেবল যুক্তির ভরসায় পরকাল এই কথাটী স্বীকার করিতে চাহেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, কেবল যুক্তিতে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ হয় না । তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছ, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পদমদ ভরে ধরাধানা শরীরমত্ত দেখ, যুক্তি বাগীস হইয়া, একটা তত্ত্ব যুক্তিতে স্থির কর কিন্তু তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহার খণ্ডন করিয়া নব্য যুক্তির উপভোগ করিবে, সুতরাং কেবল যৌক্তিকের প্রতিষ্ঠা নাই, পরং

কেবল বুদ্ধি বল নিরূপিত নবীন পরকাল, একুত পরকাল নহে। পরকাল ভোগ স্বীকার করিতে হইলেই একটি পুনর্জন্ম স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

এখন দেখা বাইতেছে নূতন পরকালে বাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহা আকাশ কুমুদবৎ। সুতরাং তাহাতে বাহারা আস্থা স্থাপন করিতেছেন, তাহারা নাস্তিকতার বুদ্ধি করিতেছেন। বাবুশর্মে নাস্তিকতার বুদ্ধি, ইহা আর বলিতে হইবে না। পরকাল তত্ত্ব প্রথমে বাহা লিখিত হইয়াছে, যদিও তাহা স্থূল ভাবে লিখিত হইয়াছে তথাপি বোধ হয় এখনে এই মাত্রই পর্যাপ্ত হইবে। সময়ান্তরে এতৎ সম্বন্ধে ভোগ ও গতির বিষয় বলিব।\*

---

\* শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটী অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করার ইহার সৌন্দর্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সংক্ষেপে শেষ করা সম্ভব নহে, বিধেই নহে। বিশেষতঃ আজ কাল যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে লোকে সহজে পরকাল মানিতে চাহে না। সুতরাং, এসম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়টী বেক্রপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে ইহাতে সকলের বোধগম্য হইবে না, সম্ভাব্যও জন্মিবে না। অতএব আমাদের অনুরোধ শাস্ত্রী মহাশয় যখন বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন বাহাতে সুবিচার হয় তদনুযায়ী বিবিধত বহু সহকারে চেষ্টা করেন। তিনি বেক্রপ শাস্ত্রদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার লেখনী প্রসূত প্রবন্ধে গতির গবেষণার পারিচয় পাইব। বে: সং—

---



## পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস ।

ভক্তকুল চূড়ামণি মহাত্মা নারদ ভক্তিব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমেই বলি-  
তেছেন ভক্তি কিরূপ ? “সাক্ষৈ পরম প্রেমরূপা অমৃতস্বরূপা চ । বিন্ধ্য  
পুমান্ সিদ্ধোত্তমতত্ত্বভী ভবতি তৃপ্তো ভবতি । যৎ প্রাপ্য ন কিং চিৎসং  
ন শোচতি ন ঘেটি ন রমতে ন্যেৎসাহী ভবতি । বদন্তানামুত্তোভবতি



জ্ঞানো ভবত্যাশ্চাশ্রমো ভবতি । অর্থ,—ভগবানে পরম প্রেম স্বরূপা ও অমৃত স্বরূপা। যে ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃতও প্রাপ্ত হয় এবং পরম ভৃগু হইয়া যায়। যাহা পাইলে মনুষ্যের চিত্তের আকাঙ্ক্ষা শোক, ঘেব যাবতীয় বস্তুতে রতি ও উৎসাহ বিহীন হইয়া যায়। যে জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য উন্নত হয়, স্তব্ধ হইয়া যায় এবং আশ্চর্য্যাম হয়।

এইরূপে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বয়ং ভক্তাদর্শ নারদ বলিলেন “অনির্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপং ; মুকামাদনবৎ প্রকাশতে কাপি পাত্রে” ।

যখন দেবর্ষি নারদই এই কথা বলিলেন তখন আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির ভক্তি কথা লইয়া আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সাধু মুখে শুনিয়াছি, যে, সকল কথাই শাস্ত্র সম্মত বলিতে পার আর নাইপার, সাধু প্রসঙ্গ উপাধিত হইলেই সাধ্যমত সদ্ভিপ্রায়ে তাহা লইয়া আলোচনা করিবে। তাহাতেও আশ্চর্য্য কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

অনাদি কাল হইতেই সাধু ভক্তগণ জগতের কল্যাণ কামনার ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই মহাতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সকল সাধুভক্তগণ উন্মত্ত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছেন “অনির্বচনীয়ম্। কুমার (সনকাদি) বেদব্যাঙ্গ, শুকদেব, নারদ, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু, কোণ্ডিল্য, শ্বেষ, উদ্ধব, আকর্ণি, বলি, হুম্মান, বিভীষণাদি ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাভা আচার্য্যগণ কত ভাবে কত প্রকারে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিলেন কিন্তু ভক্তি সুখা পানে অগৎ মাতিল কৈ ? বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নূতন কথা নাই, নূতন ভাব নাই কেবল আচার্য্যদিগের উক্তির চর্কিত চর্কণ মাত্র। অরে পাগল ! ভক্ত কি ব্যাখ্যার জিনিস, না মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায়। যদি ভক্তিরহ লাভ করিতে চাও তবে স্বত্র ব্যাখ্যা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভক্তের নিত্য সহচর হইয়া তাঁহার সেবার নিবৃত্ত হও ভক্তের অমৃতময়ী লীলা শ্রবণ কর, ভক্তের দাসদাস হইয়া তাঁহাদেরই কার্য্যে আত্ম সমর্পণ কর। যখন স্বয়ং নারদ ঐবিই ভক্তি ব্যাখ্যায় অক্ষম, তখন তুমি আমি তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করি কোন সাহসে ? দেবর্ষি নারদ ভক্তি স্বত্র লিখিয়া জগতের অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন, না সুর-লয়-তাল সংযুক্ত বীণার মৃদু মধুর বন্ধারের সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া যে ঘরে ঘরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন, তাহার দ্বারা জগতের

অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন ? আমরা বলি নারদ কৃত লক্ষ লক্ষ ভক্তি সূত্রে বাহ্য না করিয়াছে, নারদের সেই সনৃত্যে বীণার বঁকায় সহ একবার হরিনামোচ্চারণে তাহার সহস্রাধিক মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। সেই বীণার বঁকায় সে সনৃত্য হরি নামোচ্চারণ অদ্যাবধি ভক্তের সুবিমল কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

ভগবান শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণ করিতে গিয়া বলিলেন;—

স। পরানুরক্তির্বীধরে ।

আমি মুঢ়, আমার হৃদয় তমসাক্তর; আমি পরানুরক্তি বলিলে কিছুই বুঝিলাম না। আমি যেমন “ভক্তি” বুঝি না সেইরূপ “পরানুরক্তি-বীধরে” ও বুঝি না। স্মরণ্য আমার ন্যায় অজ্ঞানীর পক্ষে ভক্তি সূত্র কোন কার্য্যেই আসিল না। কিন্তু যখন শুনিলাম ভক্তকুলরবি হরিদাস কাজি কর্তৃক নির্মূরুরূপে প্রহারিত হইয়াও কত বিকৃত অঙ্গে অটল অথচ নির্ভীক হৃদয়ে হরিপাদপঙ্কে আশ্রয় সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। কাজির প্রহরীগণ ভীষণরূপে প্রহার করিতে করিতে সমস্ত গ্রাম বেঙেন করাইয়া লইয়া ফিরিতেছে। আপাদ মস্তক কথিরে প্রাণিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে হরিদাস কোন আপত্তিই না করিয়া প্রহরীদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন আর মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন। সে ধ্বনি, গ্রাম, গ্রামের কাঁপাইয়া গ্রামবাসীর কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য। এই অলৌকিক ভীষণ দৃষ্ট দেখিয়া দর্শক বৃন্দের বক্ষঃ ভালাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর সহ করিতে না পারিয়া সকলে হৃদয় খুলিয়া ডাকিতেছে “কোথায় ভক্তের প্রভু তোমার প্রিয় পুত্র হরিদাসকে আজ রক্ষা কর। এতরূপে ঘোর পরীক্ষার হরিদাস উত্তীর্ণ হইলেন। হরিদাসের জয় হইল। ভক্তের নথ্য ভক্তের সমস্ত কষ্ট নিজে বুক পাতিয়া সহ করিলেন। তখন আমার ন্যায় মুঢ়ের জ্ঞান জগ্নিল। আমি ভক্ত হরিদাসের এই অদ্ভুত চরিত্রে বাহ্য বুঝিলাম, সহস্র সূত্র পড়িয়াও তাহা বুঝিতে পারি না। অহো! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু এবং সরল নিম্পাপ হৃদয়, সংসারের কুটিলতা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এবং মাতা সুনীতির বাক্যে এবং বিশ্বাস করিয়া

ছুটিল,—অরণ্য প্রান্তর, পর্বত গহ্বর, নদ নদী, কিছুই এতি লক্ষ্য নাই,—  
 এবের এব বিশ্বাস পদপলাশলোচন হরিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করি-  
 বেন । আহা ! বিশ্বাসী ভক্তের কি মহিমা ! অরণ্যের হিংস্র জন্তুও আজ  
 নিম্ন হিংসারূতি বিশ্বত হইয়া বাৎসল্য ভাবে দৌড়িয়া গিয়া ভগবন্তের  
 পদলেহন করিতেছে । এবের কণ্ঠধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছে  
 ততদূরই কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সমস্তই সেই ভক্তের কণ্ঠ নিঃসৃত হরিশ্বনি  
 শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া বাইতেছে । এইরূপে একমাত্র বিশ্বাসের বলে সমস্ত  
 বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভীক শিশু জয়লাভ করিল । পদপলাশলোচন  
 দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিল । তখন ব্রহ্মাও বিকম্পিত করিয়া শঙ্কিত  
 হইল “অল্প বিশ্বাসীর জয়” । আবার ঐ দেখুন দৈত্য কূলে প্রজ্ঞাদ ! পিতার  
 নির্ভর ভাঙনায় ক্রক্ষেপ করিয়া হরির অন্ত সকল বস্তুরা অক্লেপে সহ  
 করিতেছে । কখন বা উচ্চ পর্বত হইতে নিষ্কিপ্ত হইতেছেন, কখন জলন্ত  
 বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কখন অতলস্পর্শী অসীম সমুদ্রে ভাসিতেছেন ।  
 কিছুতেই ভক্তের চিত্ত বিচলিত মনে । প্রজ্ঞাদ অচল অটল হৃদয়ে হরির  
 স্ত্রীপাদপদ্ম ধ্যান নিমগ্ন । নির্ধম পিতা শস্ত্রের বধের জন্ত নানা উপায়  
 উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই হরিভক্তের অনিষ্ট করিতে পারিলনা ।  
 প্রজ্ঞাদ বীরের স্ত্রায় সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিলেন ।  
 বিপদের কাণ্ডারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণকরিলেন ।  
 হরিদাস, এব, প্রজ্ঞাদ, সকলেই শাস্ত্র সম্বন্ধে “নিরক্ষর” বলিলে অত্যাুক্তি  
 হয় না, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শাস্ত্র চর্চারও  
 বাহা লাভ করিতে পারিল না ভক্ত একবারমাত্র সাক্ষর আহ্বানে তাহা  
 প্রাপ্ত হইলেন । তাই বলি, ভগবান্ ভক্তের নিকট বিদ্যা জ্ঞান চান না,  
 তিনি বলেন, “( ভক্ত ) ভক্তিভরে ডাকলে পরে, আমি তারই হ’য়ে র’ই ;  
 আবাহমানকাল হইতেই সকল স্থানেই ভক্তেরই অঙ্গ হইয়া আসিতেছে,  
 এবং সাংসারিক জীব সেই ভক্ত চরিত্রের অন্তত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ  
 হইতেছে + এমনকি ভক্তেরই অন্ত স্বয়ং ভগবানকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ  
 হইতে হয় ।

যখনই পৃথিবী পাপ ভারে অবসন্ন হন, তখনই ভগবানের আবির্ভাব না  
 হইলে এই অনন্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায় । সুতরাং, সময়ে সময়ে ভগবান্  
 হরি স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে সৃষ্টি রক্ষার অন্ত উপায় নাই । কিন্তু তাঁহাকে

অবতীর্ণ করার কে? পাপীত তাঁহাকে চায় না, সুতরাং পায়ও না। তিনি বলিয়াছেন।

যে বখামঃ অপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

সুতরাং যে যাহাচাহে কর্তব্য হরি তৎক্ষণাৎ তাহাই তাহাকে দিয়া থাকেন। আমি পাপী আমার পাপ প্রযুক্তি চরিতার্থ জন্ত সর্বদা আমি তাঁহার নিকট লালায়িত, তাহাই আমি দিন দিন পাপের ঘোর নরকে নিপতিত হইতেছি। তামস শক্তিতে আমার অন্তর বাহির অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তামসিক শক্তির গুণ সংহারকরণ; তামসের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে ধ্বংসের কার্যও সন্নিকট হইবে। অতএব, একমাত্র সত্ত্বের আশ্রয় ভিন্ন সৃষ্টিরক্ষার উপায় নাই। কারণ, সত্ত্বের বলেই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত ও পালিত হইতেছে। হরিরই পূর্ণ মাত্রার সত্ত্বের আধার। সুতরাং, পৃথিবী যখন পাপীর ক্রিড়া ভূমি হয় তখন স্রঃ ভগবান্ হরি ভিন্ন আর রক্ষাকর্তা কেহই নাই। কিন্তু হরি যে ভক্তের অধীন। সমপ্রকৃতিক শক্তি ভিন্নত পরস্পরে আকর্ষিত হয় না। ভক্ত যেখানে নাই হরি সেখানে থাকিয়াও থাকেন না। তাহাই যখনই পৃথিবীর পাপভারহরণ করিবার জন্ত ভগবান্ অবতীর্ণ করেন, তৎপূর্বে ভগবন্তত্ত্বগণ আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তত্ত্ববৎসল হরি সেই সাধ্বিক ভক্তগণের আকর্ষণ বলে তাঁহাদের রক্ষার্থ মর্ত্যালোকে আসিয়া অবতীর্ণ হন। প্রাচীন ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যতই অগতে সাধু ভক্তের অভাব পরিলক্ষিত হইবে ততই বৃদ্ধিতে হইবে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং বর্তমান ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিন্ত বড়ই অবশ হইয়া পরে, হৃদয়ে শান্তি থাকে না। কিন্তু এই নিরাশার ঘোর অন্ধকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যখন ভাবিতে থাকি তখন স্বদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। দেখিতে-পাই ভাবত অননী এখনও প্রাতঃস্মরণীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাচরণ, রমানন্দ, ত্রৈলোক্য, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতিপুত্র প্রসব করিতেছেন। অহে! আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন চরিত লিখিতে সক্ষম করিয়াছি, এইরূপ ভক্তের সংখ্যা যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে কি এই সোণার ভারতের এ দুর্দশা থাকিত! কখনই না।

রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলার হারা-

ইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাগ করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাভ্যাস সম্বন্ধে তিনি একেবারে “নিব্বাকর” ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু ত্রিচৈতন্তের পর সেরূপ ভগবন্তকৃত অঙ্গগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ ধারণ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মামুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহামু-  
 ভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি যেকোন ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন রামকৃষ্ণের অমামুষী ব্যবহারে সন্তোষ হইয়াছেন। আমরা যথাভ্যাস সম্বন্ধে পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিব।

## পরমহংসের বাল্যাবস্থা ।

হগলী খেলার অধীনে ত্রিপুর কামারপুকুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে ত্রিযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতিশয় অমায়িক, দয়ালু ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বধর্মের তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং অনুরাগের সহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতেন। সাধু পিতা না হইলে সংপুত্র অন্মাইতে পারে না। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃতি দিন দিন এত উন্নত হইতে থাকে, যে, শেষ অবস্থায় তিনি প্রকৃত তপস্বী হইয়া উঠেন এবং ভগবানের কৃপায় নিজ পরিশ্রমের ফলও প্রাপ্ত হন। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী সকল লোকেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিত। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যে পূর্ণর্ষীতে স্নান করিতেন গ্রামবাসী কেহই তাহাতে স্নান করিতে সাহস করিত না। এমনই তাঁহার তপস্তত্ত্বের প্রভাব ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীও স্বামীর অনুরূপই ছিলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি পুত্র অশ্বৈ। মধ্যমের নাম ত্রিযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৭৫৬ খকের ১০ই ফাল্গুন শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে ত্রিপুর কামারপুকুর গ্রামে কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিযুক্ত রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। শুনা যায় রামকৃষ্ণের জন্ম কালীন অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে সে

সমস্ত ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিয়া এহলে সে সমস্ত সন্নিবেশিত করিতে বিরত হইলাম । পূর্বেই বলিয়াছি গ্রামবাণী সকলেই ক্ষুদ্ররাম চট্টোপাধ্যায়কে পরম ভক্তি করিত, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক অতি সুন্দর পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া দলে দলে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া স্নাতকগৃহ বেঠেন করিয়া মহানন্দে হুল্লুধনি দিতে লাগিল । বহির্বাটিতে প্রতিবাণী ভদ্ৰাভদ্ৰ সকল লোকই একজিত হইয়া নব প্রসূত সন্তানের লগ্ন গণনায় ব্যস্ত হইয়া নানারূপ বিচার করিতে লাগিলেন । সন্তান অতি সুলগ্নে জন্মিয়াছে দেখিয়া পরম ধার্মিক পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গণনায় বাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আনন্দ শতাধিক বৃদ্ধি পাইল । কিন্তু সাহস করিয়া কাঠাকেও নিজ গণনার ফল বলিলেন না । নবজাত শিশু শুক্রপক্ষীর শব্দিকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই । মাতা আদর করিয়া সন্তানের নাম রাখিলেন “গদাই” । গদাইয়ের সর্বদা হাস্য বদন । কদাচিত্ কেহ কখন গদাইকে কঁাদিতে দেখিয়াছিল কি না নন্দেহ । ক্রমে অন্নপ্রাশনাদি শুভ কার্য সম্পন্ন হইল ; তখন মাতার আদরের গদাইয়ের নাম করণ হইল রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । রামকৃষ্ণের বচই বয়ঃবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রকৃতির নির্মলতা ও সাধু অনোচিত ব্যবহারে সকলে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন । তিনি মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান, কেহ তাঁহাকে কখন তাড়না করিতে সাহস করিত না, লেখা পড়ার অন্তও বড় বেশী জোর করা হইত না । তিনি আপন মনে আপন ভাবে সর্বদা খেলিয়া বেড়াইতেন । তাঁহার বাল্যক্রীড়া অতি সুন্দর ছিল । তাঁহার সমবয়স্ক বালক বালিকাদের লইয়া অতি নির্জন প্রান্তরে বাইয়া নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং বয়স্যের মধ্যে কাহাকে শ্রীদাম কাহাকে শুবল কোন কোন বালিকাকে গোপীকা প্রভৃতি সাজাইয়া বড়ই সরল উচ্ছ্বাসের সহিত বাল্যলীলা করিতেন । এতই সুন্দররূপে কৃষ্ণলীলা করিতেন, যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার লীলাভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইতেন । বৃন্দাবনের গোবলবিহারী এমনই সুন্দররূপে অভিনয় করিতেন যে বয়ঃবৃদ্ধ জ্ঞানীরও তাহা অসাধ্য বলিয়া বোধ হইত । তাঁহার বাল্য লীলার ভক্তি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে তিনি পূর্ব জন্মে একজন অতি উচ্চ অবস্থার সাধক ছিলেন । এবং সেই সমস্ত

সাধনার সংস্কার রাশি যেন বাল্য জীবনেই উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে ।

মানুষ সংস্কারের দাস । কারণ, কেবল মাত্র অসংখ্য সংস্কার রাশির উপরেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অবস্থিত ।

নসদুৎ পাদোন্মূদ্ধবৎ, নাপঃ কাকা লয়ঃ ॥

সাক্ষ্য দর্শন ।

যাহা নাই তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্য ভাবে বিনষ্ট হইতে পারে না । সুতরাং, আমরা যাহা কিছু করি তাহার কোনটাই একবারে নূতন নহে । আমাতে যে অসংখ্য সংস্কার রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে উহার যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইয়া উঠে মাত্র । আমরা এখন যাহা কিছু করি তাহা, পূর্বে যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছিলাম তাহারই স্ফূর্তি বিশেষ মাত্র । আবার এখন যাহা করিতেছি পরকালে সেই সমস্তেরই স্ফূর্তি পাইবে মাত্র । কেহ নুতন কিছু আনিও নাই এবং নুতন কিছু লইয়াও যাইব না । এইরূপে যদি সর্বদা সংস্কারের ক্রিয়া না হইত তাহা হইলে এই অনন্ত সৃষ্টিই সম্ভাবিত না । প্রত্যেক মনুষ্যই পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কারের বলে নিজ অবস্থা গঠন করিয়া লইয়া জন্ম গ্রহণ করে । সুতরাং যিনি যে অবস্থার পতিত হন তাহা তাঁহার নিজ কর্মানুযায়ী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আবার পূর্ব জন্মে যে সমস্ত সংস্কার অধিক বদ্ধমূল হয় পরজন্মে প্রারম্ভ হইতেই সেই সমস্ত সংস্কারের ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায় । সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে, যে সকল বালক শৈশব কাল হইতেই নানা সদগুণে অলঙ্কৃত হয় তাহা কেবল তাহাদের পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কারের বলে মাত্র । এইরূপ পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কার বলেই ক্রব, প্রহ্লাদ, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মা আজন্ম হরিপরায়ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

রামকৃষ্ণেরও বাল্যজীবনের ঘটনাবলি ও ব্যবহার চরিত্র পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি পূর্ব জন্ম হইতে নানাবিধ সুসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সামান্য আহার ও সামান্যরূপ পরিধের বস্ত্রতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন । আশৈশব তাঁহার কোনরূপ আড়ম্বর ভাল লাগিত না । বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও গীত বিষয়ে

বিশেষ অহুরাগ ছিল। বিনা সহায়তায় কেবল মাত্র নিজের চেষ্টায় তিনি, সুন্দর রূপে নৃত্য গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর এতই সুমধুর ছিল যে তাঁহার গান শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহের সহিত সর্বদা তাঁহাকে জামা বিষয়ে গান করিতে অহুরোধ করিতেন। রামকৃষ্ণের কখন গানে অকুটি ছিল না। কি ভক্ত কি অভক্ত যে অবস্থার লোক হউন না কেন গান শুনিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে গান করিতেন। এবং গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার “শ্রোতার” দিকে বড় দৃষ্টি থাকিত না, তিনি আপন গানে আপনি মোহিত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। রামকৃষ্ণের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে তিনি সকল অবস্থার লোককেই সন্তুষ্ট করিয়া পরম সুখানুভব করিতেন।

এইরূপে সদানন্দে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়া যখন প্রায় ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন তখন তাঁহাকে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতায় বামাপুকুর নামক স্থানে একখানি চতুষ্পাঠী ছিল। রামকৃষ্ণ সেই চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য আনীত হন। কিন্তু শাস্ত্রচর্চায় তাঁহার কিছুতেই মনোনিবেশ হইল না। এখানে আসিয়াও তিনি তাঁহার অতি প্রীতিকরী বাল্যক্রীড়া ছাড়িতে পারিলেন না। তৎপর ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে মাড়বংশের গৌরব-স্বরূপা রানি রাসমনি দাসী কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বহুবায় করিয়া একখানি কালী প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণকেও তাঁহার ভ্রাতার অনুগমন করিতে হয়। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হুই তিন বৎসর যাবৎমাত্র মায়ের পূজার কার্য্য নির্বাহ করিতে পান। এই সময়ে রামকৃষ্ণের কোন কার্য্যই ছিল না। অনন্ত লীলাময়ীর অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে সক্ষম। হঠাৎ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন। যাহার, তাঁহাকেই সাজিল। নির্মল হৃদয় রামকৃষ্ণ মায়ের পূজার ভার লইয়া বড়ই অহুরাগের সহিত মায়ের পূজার্কনাদি করিতে লাগিলেন। এই সময় অর্থাৎ অনুমান যখন তিনি ষোড়শবর্ষে উপনীত হন তখন হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়রাম বাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী



সারদা স্কন্দ্রী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর পুনরায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্যে নিযুক্ত হন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ নিরাকর ছিলেন। সংস্কৃত ত দ্রাস্তা, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষাতেও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার উপর মায়ের পূজার ভার অর্পিত হইলে তিনি যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া যথাজ্ঞান পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ একমাত্র অকপট ভক্তি। তিনি যে দিবস হইতে পূজায় রুতি হন, সেই দিবস হইতেই পরম ভক্তি সহকারে মায়ের পূজার কার্য সমাপন করিতেন। পূজান্তে একদৃষ্টে অনিমেষ লোচনে মায়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন এবং সম্ভল নেত্রে নানাবিধ শক্তি বিষয়ক গান করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক আক্ষেপ করিতেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর দেবীর আরতি সমাপ্ত করিয়া অম্বরাগের সহিত ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের রচিত একখানি সঙ্গীত করিতে করিতে এতই বিহ্বল হইয়া পড়েন যে অশ্রুধারায় গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ভূমে নিপতিত হইতে লাগিল, মায়ের দয়ামাধা ভুবন মুগ্ধকর মুখের উপর দুইটী নয়ন নিঃশব্দ করিয়া নিম্পন্দের শ্রায় বসিয়া পড়িলেন, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ প্রায় যেন অন্তর্জিহ্বা ও বহির্জিহ্বা এক হইয়া গিয়া বাহিরের বিষয়ে একবারে উপলব্ধি বিহীন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া উঠেঃস্বরে এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—“মা রাম-প্রসাদকে দেখা দিলি, তবে আমায় কেন দেখা দিবিনি মা?” এইরূপ বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; সে ক্রন্দন আর শীঘ্র থামিল না। যেন রামকৃষ্ণের পূর্ব জন্মার্জিত প্রবল সাধনার সংস্কার রাশি উদ্দীপক কারণের সহায় পাইয়া শতগুণ বেগে ঝাঁকুড়িত হইয়া উঠিল। পূর্বজন্মের সাধনলব্ধ যে ভক্তি নদীর প্রবাহ জন্মান্তর গ্রহণরূপ প্রবল অন্তরাগ্রে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অদ্য যেন তাহা কি কৌশলে অপসারিত হইয়া গেল; কালি-সমুদ্রে মিলিবার নিমিত্ত ভক্তির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটতে লাগিল। রামকৃষ্ণের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ কখন কাঁদেন কখন হাসেন, কখন নৃত্য করেন, কখন বা মা মা বলিয়া আর্তনাদ করিয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। সাধারণ চক্ষে তিনি প্রকৃত উন্মাদের শ্রায় ফিরিতে লাগিলেন। কখন গঙ্গাতীরে উত্তপ্ত বালুকার উপর মুখ ঘর্ষণ করিয়া উঠেঃস্বরে বারম্বার কেবল বলিতেন মা আমার ভক্তি

দেহ", কখন গভীর নিশিতে শ্মশান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ খানি সাষ্টাঙ্গে ভূমিসাৎ করিয়া কাঁদিতেন আর বলিতেন মা শ্মশানবাসিনী তুই নাকি ভয়ঙ্করী-রূপে শ্মশানে আসিয়া সাধকদিগকে ভয় দেখাস, আজ আমাকেও একবার সেইরূপে এসে দেখা দে মা। এইরূপে দিনের পর দিন অতি-বাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্থ স্থির করিয়া নানারূপ চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাক্তার রাম নারায়ণ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসক নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। ডাক্তারের ঔষধ দেখিয়া তিনি নাকি এক দিন বলিয়াছিলেন, যে আমি যার জন্ত পাগল তোমার এ ঔষধ খাইলে কি তাহাকে পাইব ?" অহো! যিনি ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে চান, তাঁহাকে সামান্য ডাক্তারে কি করিবে, হুতরাং তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ভক্তির ভগবান, বিশ্বাসীর ঠাকুর। আর কি তিনি থাকিতে পারেন। রামকৃষ্ণের অকপট ও অহেতুকী ভক্তি দেখিয়া যেন তিনি তাঁহার ঈশ্বর দর্শন বাসনা চরিতার্থ করিলেন। রামকৃষ্ণের উন্নততার কিঞ্চিৎ উপসম হইল। ক্রমে চিন্তা স্থির হইয়া আসিল। তখন তিনি প্রবল অনুরাগের সহিত সাধন ভজনের দিকে চিন্তা নিয়োজিত করিলেন।

## সাধনাবস্থা ।

কলিকাতার উত্তর ন্যূনাধিক ক্রোশত্রয় ব্যবধানে ভাগিরথীর পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটি অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ কালী মন্দির ভাগিরথীর গর্ভ হইতে উদ্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে দ্বাদশটি শিব মন্দির সারি সারি শোভা পাই-তেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। স্থান জনশূন্য ও অতি নিস্তব্ধ। যে দ্বাদশটি মন্দিরের কথা বলিলাম তাহারা গঙ্গার সহিত সংলগ্নভাবে সংস্থাপিত। এই মন্দির গুলির উত্তরে একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। সেই গৃহেই পরমহংস দেব সর্বদাই থাকিতেন ও নিজ কার্য্য করিতেন। এই গৃহের সম্মিহিত উত্তরে কএকটি সুবৃহৎ ও অতি প্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষতলেই পরমহংসের সাধনার স্থান। এই স্থানে তিনি নানাবিধ সাধনা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি গোকুল হইতে বেদ পুরাণ, তন্ত্র,

কোরাণ এবং অন্যান্য প্রত্যেক শাখা ধর্ম প্রণালীর কোন প্রক্রিয়া করিতে বাকী রাখেন নাই। সকল অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, তিনি যখন যে প্রণালীর সাধনা করিতে সংকল্প ক্রান্ত হইতেন, তখনই সেইরূপ সাধন-প্রণালীর একজন করিয়া সিদ্ধ গুরু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বধাবিহিত দীক্ষা দিয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণও উপদিষ্ট হইয়া ঐকান্তিক সাধন বলে দিবসত্রয় মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিতেন। রত্নপথের পথিক মাত্রেই বিখ্যাত সাধক তোতাপুরীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেই তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া নির্বিকল্প সমাধি বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। শুনিয়াছি ঐ দিবসত্রয় মাত্র সাধনায় তিনি সর্বসম্মতবাস্তবীয় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কথিত আছে, যে, এই সময় তোতাপুরী তাঁহাকে পরমহংস উপাধি দিয়া যান।

এই সময়ে রামকৃষ্ণের কার্য কলাপ কেহ দেখিতেও পাইত না বুঝিতেও পারিত না। পূর্ব হইতেই লোকে তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার নূতন নূতন ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে আরও পাগল, বুজবুজ প্রভৃতি নানা অভিধানে, অভিহিত করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে এক নবীনা তান্ত্রিক সাধিকা যোগিনী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া অতি সাবধানের সহিত রামকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং নামাবধি কঠোর সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। তিনিই সর্ব প্রথমে রামকৃষ্ণের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করেন। এবং রামকৃষ্ণের বাক্য ও মানসিক লক্ষণ দেখিয়া বৈষ্ণবগণের সিদ্ধাবস্থায় মহাভাবের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া দেন, যে, ভক্তি সাধনে ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। যোগিনী, রামকৃষ্ণকে লোকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার উপর অন্যায়াচরণ না করে, তজ্জন্য নানা ভাবে তাহাদের তাঁহার মহাভাবের বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল না,—তামসিক প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক উক্তি স্থান পাইবে কেন? সকলেই তাঁহাকে বাড়ুল বলিয়া উপহাস করিত।

ক্রমশঃ ।



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

৮ম খণ্ড।

## পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধনকালে তিনি অহং ত্যাগ করিবার জন্য দস্তে সম্বর্জনী ধারণ পূর্বক মল মূত্রের স্থান পরিষ্কার করিতে করিতে রোদন করিয়া বলিতেন “মা, আমার অহঙ্কার নাশ করে দে, আমার শুচি অশুচি বোধকে বিনষ্ট করে দে, মা! আমি হীনের হীন, দীন, রেণুর রেণু সকলের দাসানুদাস, এই ভাব ঘেন প্রাপ্ত হই। বৈরাগ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি একাকী জাহ্নবী তটে উপবেশন করিতেন এবং এক হস্তে মুড়া ও অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেন “মন একে বলু টাকা, ইহা জড় পদার্থ। রূপার চাক্তি এবং বিবির মুখ আছে। ইহার দ্বারা চাল হয়, ডাল হয়, ঘর বাড়ী হয়, হাতি ষোড়া হয়। জড়ে জড়ই লাভ হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে টাকাও বা মাটিও তা। মাটিতে ধান হয়, অন্যান্য ফল মূলাদি হয়, তাহাও ত জড়, তাহাতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যদি টাকা ও মাটি একই হইল, তবে টাকার প্রতি মনের আসক্তি থাকিবে কেন? টাকা মাটি, মাটি টাকা একই বস্তু। এই বলিয়া উহাদের

জলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেন। কামিনী আর কাকন সাধন তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেতেই শক্তিরূপিনী মহামায়ার আবির্ভাব দেখিতে পারিতেন এবং স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই তাঁহার বাহু চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাহান্তর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্রকবার মাত্রও অবসর হয় নাই ; কারণ, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, “যে, স্ত্রীধোনি হইতে মনুষ্য প্রসব হইয়া হ্রস্বত মনুষ্যজীবন লাভ করে, সূতরাং উহা মাতৃস্থানীয়া। সাধকের পক্ষে উহার অন্যরূপ ব্যবহার অবিধেয়”।

যাহা তাঁহার সাধনার অন্তরায় বোধ হইত তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিতেন। এক দিবস তাঁহার কোন ভক্ত একখানি মূল্যবান পট বস্ত্র ফেল করিয়া লইয়া তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত পরাইয়া দেন। তিনিও আনন্দের সহিত পরিধান করিয়া তাঁহার সাধনার স্থান-বুদ্ধতলে বাইয়া বুদ্ধটী প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন ভগবানের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন, অমনি তাঁহার বস্ত্রের দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিল,—যে, পাছে উহাতে দূলা লাগে। ভক্তের প্রণামে বাধা পড়িল, আর কি ভক্ত স্থির থাকিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ পরিধেয় পট বস্ত্র সজোরে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর শাস্ত চিত্ত হইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

এই সময় রাণি রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় রামকৃষ্ণের অবস্থা আনুপূর্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া সর্বদা তাঁহার কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মথুর বাবু তাঁহার সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমস্তই যে রামকৃষ্ণের ভগ্নাম্বী ইহাই স্থির করিলেন। এবং সেই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় হইয়া তিনি নানারূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া নবযৌবন সম্পন্ন সুরূপা সুবেশা ব্যাভ্রাব্যবসায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী বারাজনাদিগকে নিজ বাগান বাটীতে লইয়া আসিয়া তাঁহার সুসজ্জিত ও মনোরম বৈটকখানায় মনোমত ভাবে সাজাইয়া বসাইতেন। তৎসঙ্গে উহাদের নিত্য সহচর সুরারও অভাব থাকিত না। যাহাতে রামকৃষ্ণের চিত্ত-চাকল্য উপস্থিত হয় তজ্জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে তাহাদের আদেশ করিতেন। এইরূপে সমস্ত স্থির করিয়া রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইতেন। এই সময় রামকৃষ্ণের

একরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে, জ্ঞীলোক দেখিবামাত্র তাহার সম্পূর্ণ সমাধি হইয়া যাইত। মথুর বাবুকে তিনি প্রথম হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার আস্থানে কোন দ্বিধা না করিয়া ধীরে ধীরে বৈটকখানা মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী জ্ঞীলোকদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার সমাধি হইয়া যায়। এবং বাহুজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ভূমিতে বসিয়া পড়েন। মথুর বাবুর আদেশ ক্রমে সেই অবস্থাই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসান হইত। তৎপর উপস্থিত ব্যাশ্চাগণ নানারূপ ভাব ভঙ্গি ও বিবিধ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিত না। এইরূপে মথুর বাবু তাঁহাকে আরও কলিকাতার নানাস্থানের ব্যাশ্চালয়ে লইয়া ফিরিয়াছিলেন কিন্তু কোথায় তাঁহার মন চাকল্য করাইতে পারেন নাই। পরমহংসদেব বলিতেন কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষী বাহারা জ্ঞীশ্রেণীভুক্ত তাহারাই প্রকৃতির অংশ বিশেষ, অতএব মাতা। সুতরাং যিনি এই ভাবে জ্ঞীলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেন তাঁহার কি আবার জ্ঞীলোক দর্শনে মন চাকলা হইবার সম্ভব ?

মথুর বাবু এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা যখন রামকৃষ্ণকে কিছুতেই ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার মনের ভাব অন্তরূপ ধারণ করিল। তিনি তখন আর রামকৃষ্ণকে সামান্য মনুষ্য ভাবে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস এতদূর দৃঢ় হইয়া পড়িল যে তিনি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি রামকৃষ্ণকে স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া নিজ স্ত্রী কন্যাদিগের দ্বারা তাঁহার সেবা হুজুর্বাদি কার্য্য করাইতেন। জ্ঞীলোকেরাও অতি আনন্দে পরম ভক্তি সহকারে সাধু সেবা করিয়া আপনাদের কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণকে যেন আপনাদের কোলের শিশু মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই সেবা হুজুর্বাদি ও আহাঙ্গাদি করাইতেন। রামকৃষ্ণও মায়ের ছেলের ন্যত হাসিয়া খেলিয়া তাঁহাদের সহিত দিন কাটাইতেন।

তৎপরে মথুর বাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। ক্রমে কাশী বৃন্দাবন গয়া প্রভৃতি মহাতীর্থ সকল ভ্রমণ করেন। তীর্থাদি দর্শন কালীন তিনি তথাকার দেবালয়াদি দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, যে, মা আমার সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপই, তবে সেখানে আর এখানেত কিছুই প্রভেদ দেখিতেছি না। মায়ের সেধানকার তেঁতুল গাছটীরও যেমন পাতা, ডাল, এধানকার তেঁতুল গাছটীরও সেইরূপই পাতা ডাল”।

রামকৃষ্ণের নির্মল চক্ষু দিব্যভাবে ধারণ করিয়াছে! সে চক্ষে কি আর প্রভেদ দৃষ্টি হইতে পারে? তিনি তখন জগৎময় এক জগন্ময়ীরই সত্ত্বা অবলোকন করিতেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধিকা, কাশীতে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা, গয়ায় গদাধর সকলই কেবল এক মায়েরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া তাঁহার চক্ষে দিব্য আভাসিত হইতে লাগিল,—ভক্তের দৃষ্টিই এইরূপ। গয়ায় গদাধরজীউর ত্রীপাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্তের এক অপূর্ব অবস্থা হয়। তখন তিনি সেই অবস্থায় নাচিতে নাচিতে কি যেন কি এক ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তাঁহার সে অবস্থা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি ভিন্ন সেই অপূর্ব ভাবাবেশের ব্যাখ্যা করিতে অশ্রদ্ধ কেহই সক্ষম নহে। এইরূপে তীর্থাদি পর্যটন করিয়া তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আপন সাধন পীঠে আসিয়া বসিলেন। এই সময় হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়েই সর্বদা অবস্থিতি করিতেন। মধ্যে মধ্যে কোন তত্ত্ব কর্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাইতেন মাত্র। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় পরমহংসকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সর্বদাই তাঁহাকে সিন্দুরিয়াপটীর নিজ আবাসে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করিতেন। যখন তিনি শম্ভু বাবুর বাড়ীতে আসিতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্ম বহুলোকের জনতা হইত। নানালোক নানা ভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। পরমহংসের নিকট কেহ উপস্থিত হইলেই, তিনি যে শ্রেণীর যে জাতীয় লোক হউন না কেন, তিনি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পণ্ডিতকে দেখিবার মাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্বকোপরি আরোহণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অভূতপূর্ব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভক্তি ভরে নানা ভাবে পরমহংসের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবের কথা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল রামকৃষ্ণকে জানিতেন না এরূপ সাধু সন্ন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রহ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের বিষয় বেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতাম কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে

পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তৎপর আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ সকল শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিতাম। আমরা এই সময় তাঁহার নিকট নানা ধর্ম্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। ঋষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, হিন্দুত আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তি পদপদ্মেরে তাঁহার চরণ প্রাপ্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রম পাইয়া কেশব বাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে “নব বিধান” প্রসব হয়। কেশব বাবুর শিষ্যেরা যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস, যে, যদি কেশবচন্দ্র জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্ভীক হৃদয় এ সত্য প্রকাশে কদাচ কুণ্ঠিত হইত না, আমাদের সহিত কেশব বাবুর বিশেষ রূপই পরিচয় ছিল; এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশব বাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন। এই সম্বন্ধে আর একজন পরমহংসদেবের ভক্ত কি বলিতেছেন, দেখুন—

“রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তি সাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মোপদেশের পরাক্রমে কেশব বাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অধিক দিন অপ্ৰকাশিত ছিল না।

কেশব বাবু যে সময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্ম শক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই তর্কের দ্বারা কেশব বাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্য্য রস তাঁহার মধ্যে রক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যে নূতন ধর্ম্ম-



ভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রাম-  
 কৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন ফলের আভাষ মাত্র বলিয়া প্রতীতি  
 হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজের সাধন দ্বারা  
 সকল ধর্মের সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিত ভাবে বসিয়াছিলেন। কেশব  
 বাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত  
 ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয়  
 দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিগরি করিয়া অর্থাৎ যে ধর্মে যেটুকু  
 সার বলিয়া তিনি বুঝাইলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের  
 সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ,  
 নামক মহাত্মা হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলি-  
 তেন না তাঁহার মনে প্রত্যেক মতই সত্য। যে মতে প্রেমের কাহিনী  
 কথিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি  
 অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির শরীর, কাহার হস্ত এবং কাহার  
 পদ কর্তন করিয়া একটি কিস্তৃত কিমাকার মূর্তি সংগঠিত হইয়া থাকে।  
 কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই সেই  
 শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে। তাহার  
 শোভা স্বাভাবিক কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্ম যত প্রচলিত  
 আছে, তাহাতে একটি একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ  
 পুষ্ঠিকাল পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ  
 বলিয়া কথিত হয়, তাহারই থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে  
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহা তাহারই প্রথম হইতে গণনা না করিলে  
 সে ভাব কন্মিন্‌কালে প্রস্ফুটিত হইবে না। যেমন সম্ভানের বাৎসল্য  
 প্রেম সম্ভান ব্যতীত স্ত্রী কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পিতা কল্পনা  
 করিয়া প্রকাশ করিলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না, তেমনই ধর্মের  
 ভাব জানিতে হইবে। ঈশার প্রেম ঈশার প্রণালীতে, চৈতন্যের ভক্তি  
 চৈতন্য সম্প্রদায়ে, বুদ্ধের জ্ঞান বৌদ্ধমতে পরিচালিত না হইলে সেই  
 সেই বিশেষ ভাব কদাপি লাভ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? পরমহংস  
 দেব সেই জন্য বধন যে যে মতে সাধন করিয়া ছিলেন তখন সেই  
 সেই মতের কোন প্রক্রিয়া স্বেচ্ছাচারী বশবর্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন  
 নাই। তাঁহারা পরমহংসদেবকে নব বিধানের প্রবর্তনকর্তা বলিয়া সংবাদ

পত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পরমহংসদেব সেরূপ সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বিস্মিষ্ট করিয়া ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপরূপ ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এককালে চূর্ণী কৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে কেহ কোন মত বিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধৰ্ম্মপথ বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা ভুরি ভুরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।”

ক্রমশঃ

## নবমী পূজা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস । মা ; তুই আড়ালে থাকিয়াও, একবার ভালরূপে তাকাইলেই, লোকে “বাহা বুঝিবার” তাহা বুকে, তখন তোর নিজ মুখে শুনিয়াও কিছুই বুঝিবে না কেন ?

জগদম্বা । (স্বিতমুখে) এখন ইহার হুই একটি উদাহরণও বুঝিয়া লও, — আত্মার শক্তি পরিচালনার স্বতন্ত্ররূপ ঐ শরীরের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত, উহাতে কএকটি ভৌতিক পদার্থ কিছু অধিক পরিমাণে থাকি। নিত্যকালে আবশ্যক হয়, যেমন স্ববন্ধার (আজোট) স্নেহ, শুষ্ক, লবণ ইত্যাদি। এই সকল পদার্থগুলি না থাকিলে, মানব শরীরের অস্তিত্ব থাকে না, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আত্মার কোন প্রকার শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেকগুলি পদার্থ আছে, তাহা অতি অল্পমাত্রায় থাকিলেও চলে, যেমন লৌহ, সীসক, চূর্ণ, গন্ধক ও কার ইত্যাদি। এই সকল পদার্থও দেহের অস্তিত্ব রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। এদিকে আবার প্রতিকণাই ঋণ প্রাণাদি নানাবিধ কারণে, শরীরস্থিত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থের ক্ষয় হইয়া বাইতেছে, উহার শরীরের মধ্য হইতে বিখলিত হইয়া চারিদিকে উড়িয়া বাইতেছে, কিন্তু প্রাণীগণ নানারূপ আহা-বাহারের দ্বারা আবার সেই

অভাবের সম্পূর্ণরূপ পূরণ করিয়া থাকে। ইহাই আহার এবং শরীরের পরস্পরের ক্রিয়া। তন্মধ্যে, যে যে দ্রব্যগুলি শরীরের নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়, যে যে বস্তুর অভাবে শরীরাবয়ব গুলি শিথিল ও কীর্ণবীৰ্য্য হইয়া, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ত হয়, উহারা যথোচিত রূপে প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সকল বস্তুগুলি উদরস্থ বা মুখস্থ করা মাত্রেই, শরীরের সেই সকল বস্তুর অভাব বিদূরিত হয়, তখন ঐ সকল দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা বীৰ্য্য-সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তি সমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়; সুতরাং আত্মার শক্তিগুলিও, তখন উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া, অনর্গল ও অবাধভাবে স্নায়ুগুলাদির দ্বারা চলিয়া ফিরিয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব ঐ সকল বস্তু আহার করা কালে, আত্মা সুখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা, শরীরের মধ্যে, ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তদ্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হয়; সুতরাং তখন দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়।

ভাবিয়া দেখ! হৃৎ, য়ত, ও মৎস্য, মাংসপ্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য, প্রায় সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষরূপে সুখবর্ধন করে। তৎপরে, কিছু কম পরিমাণে হইলেও, আলু, পটোল, বেগুন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যও সুখজনক স্বাদযুক্ত হয়। আবার কুইনাইন, অহিফেন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহা সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, হৃৎাদির মধ্যে মনুষ্য শরীরের পোষক ও রক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনেকগুলি পদার্থ আছে। আর কুইনাইনের মধ্যে “কোরাসিয়া” নামে এক প্রকার বিষ পদার্থ আছে। এবং আফিণের মধ্যে “মরফিয়া” নামক বিষ বিশেষ আছে। এজন্যই, স্বভাবাবস্থার কুইনাইন এবং অহিফেনাদি খাইলে শরীর বিযাক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে অশুপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা হইতে থাকে। তাদৃশ ব্যাধিতাবস্থার নামই দুঃখ। সেই জন্যই কুইনাইন খাইলে দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। আর হৃৎাদি দ্রব্যগুলি রসনাসংযোগ করা মাত্রেই উহার শুভাংশ, স্নেহাংশ, লবণাংশ ও অক্লুরকাদির অংশটা রসনার স্নান স্নান শিরাদির দ্বারা শরীরে পরিগৃহীত হয় তৎপরে উদরস্থ হইলে, পাকস্থলী-সংলগ্ন স্নান-স্নান শিরাদির দ্বারা, উহার প্রায় সকলগুলি অংশই পরিগৃহীত হয়, এবং তৎকণাৎ রসনা,

উদরাদি স্থল অবয়বগুলি আর রসনা-সংলগ্ন ও উদরাদির সরিষিত শিরা, ধমনী, নাড়ী, ও স্নায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি, সকলেরই ঐ সকল জ্বরের অভাব পূরণ হয় । তখন উহারা ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য হইতে আপ-  
নাপন প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি পাঠিয়া, আপনাপন অবয়ব পরিপুষ্ট করে,  
তখন উহারা পুনর্বার আত্মার শক্তি পরিচালনায়, পূর্বের মত, সমর্থ হইয়া  
থাকে । অতএব আহারের পূর্বে, উহাদের কীণতা প্রযুক্ত যে, আত্মার  
শক্তি পরিচালনায় বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হয়, আত্মার শক্তিগুলি তখন  
আপনাপন নির্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনর্গল ও অবিরোধ ভাবে গত্যাত  
করিতে থাকে, দেহের সমস্ত অবয়বেই, আত্মার সমস্ত গুলি শক্তি, বধ্যবৎ  
অনর্গল ও অবিরোধ ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে । ঈদৃশ অনর্গল ভাবে  
প্রবাহিত অবস্থার নামই সুখ ; তাই হৃৎকাদি পান করিলে সুখবোধ হইয়া  
থাকে ।

খাদ্য বস্তু সকল উদরসাৎ হইলে, দেহ ক্রমেই আরও অধিক স্নাত্তার  
উহার অংশগুলি গ্রহণ করিতে থাকে, ক্রমে, দেহে ঐ সকল বস্তুর অভাব  
একবারেই বিদূরিত হয়, সমস্ত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আত্মার শক্তি পরিচালন  
করিতে আরও উত্তম রূপে উপযুক্ত হয়, সুতরাং আত্মার সমস্তগুলি শক্তিই  
অবাধে দেহের মধ্যে ইত্যন্তঃ বিসর্পিত হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই  
“আপ্যায়িত ভাব” বা “ভৃগ্নিসুখ” বলিয়া নির্দেশ করা যায় । এই হইল  
আহার জনিত সুখ ও হৃৎখের তত্ত্ব । তৎপরে অন্যান্য বস্তু প্রকার বিষয়-  
জনিত সুখঃখাদি আছে, তৎ সমস্তই একরূপ আত্মার শক্তির অনর্গল-  
প্রবাহাবস্থা এবং বাধিত-প্রবাহাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই না । ইহাই সুখ-  
হৃৎখের সংক্ষিপ্ত রহস্য । বৎস ! তুমি ইহা বেশ বিশদরূপে জ্ঞানরসম  
করিয়াছ ত ?

ভোলাদাস ।—হ্যাঁ মা, সুখ হৃৎখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি, এখন অন্য  
কথা বল ।

অগদম্বা । এখন তুমি বল দেখি, যদি এসংসারে এমন কোন ব্যক্তি  
থাকে,—যাহার দেহ চিরদিন অনাহারেও কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, এবং  
আহারের দ্বারাও কিছুমাত্র পরিপুষ্ট হয় না, সুতরাং আত্মার শক্তি পরি-  
চালনে কখনও অসমর্থ বা অহুপযুক্ত হয় না ; অতএব কোন বস্তু আহারের  
দ্বারা আত্মার শক্তি কখন বাধা প্রাপ্তও হয় না, কিম্বা কখনও নুতন করিয়া

অনর্গলভাবাপন্নও হয় না; কিন্তু চিরদিনই একরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে; তবে সেই অবস্থার লোকটি যদি কুইনাইন বা দুঃখাদি কোন বস্তু খায়, তবে তাহার কোনরূপ দুঃখ বা সুখ হইবে কি না?

ভোলাদাস।—(কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) না মা, তাহার কোনরূপ সুখ বোধও হইবে না, দুঃখ বোধও হইবে না। কেননা, কোন বস্তু আহাৰ করিয়া তাহার আত্মার শক্তি কখনও বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না, কিম্বা কোন বস্তুর সাহায্যেও অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না। সুতরাং তাহার লৌকিক দুঃখাবস্থা কিরূপে হইবে?

অগদম্বা।—তবে সে কিরূপ অনুভব করিবে?

ভোলাদাস।—যাহাকে ভালও বাসিনা মন্দও বাসিনা, এমন একজন লোক নিকটে উপস্থিত হইলে, যেমন তাহার আকৃতিটির জ্ঞান বা দর্শন মাত্র হয়, কিন্তু স্মৃতি বা কৃত্য, কিছুই মনের মধ্যে বিকসিত হয় না; সেইরূপ কুইনাইন বা মধু শর্করাদি খাইলেও, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের কেবল তিক্ত ও মধুরাদি রসটি মাত্রই অনুভূত হইবে, সুতরাং “এইটি ভাল” “এইটি মন্দ” এরূপ বোধ হইবে না। কিন্তু তাহাদের তিক্ত আর মিষ্ট, এতদুভয়ের পার্থক্য বোধটি, বিলক্ষণ রূপে থাকিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

অগদম্বা।—এখন আমার অবস্থা শ্রবণ কর,—বাবা! আমার দেহ কখনও, কোন কারণে, কোন ঘটনার ক্ষীণও হয় না, দুর্বলও হয় না, অশক্তও হয় না, আবার কোন কারণে কখনও নূতন করিয়া পরিপুষ্টও হয় না, এবং আমার শক্তিও কখন বাধিত কিম্বা নূতন করিয়া অনর্গলভাবে প্রবাহিতও হয় না, আমার শক্তি সর্বদা সমস্ত বস্তুতে অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। আমি সর্বদা অব্যাহত বীৰ্য্য, অব্যাহত শক্তি, সুতরাং নূতন কোন ঘটনার দ্বারা আমার শক্তি অনর্গল বা অবাধিত-ভাবাপন্নও হয় না, আবার বাধা প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং কোন বিষয়ের দ্বারা আমার কোনরূপ লৌকিক সুখ বা লৌকিক দুঃখ হইতে পারে না। অতএব আমার নিকট কোন বিষয় বা কোন বস্তু ভাল বা মন্দ হইতে পারে না। বৎস! তোমার কথিত সেই কল্পিত ব্যক্তির দ্বায়, আমিও কেবল প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিটি মাত্র পৃথক পৃথক রূপে অনুভব করিয়া থাকি। আমার সম্বন্ধে

কান বস্তুই ভাল বা মন্দ হইতে পারে না, আমার নিকট সমস্তই সমান । তবে সেই যে, সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ, এই ত্রিগুণস্বরূপ অলৌকিক সূত্র ও অলৌকিক হুঃখাদির কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা আমার কাছে । কারণ আমি ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণবতী । কিন্তু তথাপি আমার সত্ত্ব শক্তি সর্বদাই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আমি রজঃ আর তমোগুণের সংস্পৃষ্ট হইলেও তদ্বারা কিছুমাত্র পরিভূতা হই না, আমার সত্ত্বগুণ কখনই রজস্তমের দ্বারা পরিভূত বা পরাজিত হয় না, সত্ত্বশক্তি সর্বদাই প্রবল ভাবে থাকে, রজঃ আর তমঃ তাহার অন্তরালে অবস্থিতি করে, এবং তদ্বারা অভিভূত থাকে । তাহারই মধ্যে, সময়ে সময়ে যখন রজঃ আর তমঃ ঈষৎ পরি-ক্ষুরিত হইয়া পূর্বাশ্রয় কিছু একটু উত্তেজিত হয়, তখনই আমি সৃষ্টি এবং লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সৃষ্টাদি কালেও আমার সত্ত্ব-শক্তি কিছুমাত্র অভিভূত হয় না । সুতরাং রজঃ শক্তির হুঃখ কিম্বা তমঃ শক্তির মোহ আমার প্রবলতরসত্ত্ব শক্তিস্বরূপ সূত্রের অভ্যন্তরে অন্তর্ভূত হয়, সুতরাং তাহা প্রাণে আসে না । অতএব আমার সর্বদাই সূত্র, আমি সর্বদাই সূত্রময়ী । এজন্যই, প্রিয় তনয় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“ক্লেশকর্ম্ম বিপাকান্তরৈরপরাশ্রয়ঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ ।” ইহার অর্থ এই যে,—ভগবান ত্রিগুণময়, তাঁহাতে যেমন সূত্রস্বরূপ সত্ত্বগুণ আছে, তেমন হুঃখস্বরূপ রজোগুণ এবং মোহ স্বরূপ তমোগুণও আছে । কিন্তু তিনি ক্লেশাদি দ্বারা কখনই পরামৃষ্টে অর্থাৎ আহত বা পরিভূত হয়েন না । তৎপরে বেদব্যাসও ঐ সূত্রের ভাবো, “বোহনৌ প্রকৃষ্টে সর্বোপাদানাত্ ঈশ্বরস্য শাস্বতিক উৎকর্ষ” ইত্যাদি দ্বারা, স্বভাবতঃই আমার সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা বিষয় নির্ধারণ করিয়াছেন । অতএব আমার কোন প্রকার হুঃখাদিও নাই, এবং ভাল বা মন্দ বোধে কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ বিরজিতও নাই । কিন্তু আমার ভক্তের বাহা প্রিয় তাহাই আমার ভাল এবং ভক্তের বাহা অপ্রিয় তাহাই আমার মন্দ, অতএব ভক্তের প্রিয় বস্তুর দ্বারা আমার পূজা করিলেই আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করি ।

ভোলানাস । (অতি দীন ভাবে) মাগো ! ওমা ! তোর নির্দাক্ষ্য কথার যে, আমার আশা ভরসা সমস্তই ফুরো হইয়া গেল । মা, তুই পূর্বে বলিয়াছিলি যে, তোর ভোগের নিমিত্তই তুই এই সমস্ত দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলি, তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে প্রাণপণে তোর নিমিত্তই এই সকল

দ্রব্য আহরণ করিয়া, তোকে আনিয়া দিয়া কৃতার্থ হইব ; কিন্তু মা, তুই এখন আবার বলিলি যে, কোন বস্তুর দ্বারা তোর মূখরূপ স্মৃৎ বা হুঃখ বোধ হয় না, স্মৃতরাং তোর নিকট কোন দ্রব্যই ভাল বা মন্দ নাই, তবে তো তোর ক্ষুধাও নাই পিপাসাও নাই, এবং ভোগও নাই, বিলাসও নাই, তবে আর তোর নিকট এ সকল দ্রব্য আনিয়া প্রয়োজন কি ? আর পূর্বেই বা তুই ওকথা বলিলি কেন ? মা গো ! আমি সত্যই বলিতেছি, তোর এই কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, ইহা তুইও জানিতেছিল ; অতএব শীঘ্র শীঘ্র এবিষয়ের বৈধ ভাদিয়া দে ?

অগদম্বা । (সাস্তুনার ভাবে) বাবা ! তুমি ধীর হও, তোমার নিরাশ্রুত হওয়ার কোন কারণ নাই, তুমি স্থির হইয়া আমার কথা শুন, তবেই ভাবনা চিন্তা বিদূরিত হইবে । বাবা ! আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও সত্য, এবং এইকণে যাহা বলিলাম, তাহাও সত্য ; কিন্তু এবিষয়ে আরও কিছু বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা শুন ।—বৎস ! আমি কিছুই ভোগ করি না তাহা একবারও বলি নাই, কিন্তু কোন বিষয়ভোগের দ্বারা লৌকিকভাবে আমার কোনরূপ স্মৃৎবোধ বা হুঃখবোধ হয় না, স্মৃতরাং লৌকিকভাবে ক্ষুধা পিপাসাও হয় না, ভাল মন্দ প্রতীতিও নাই, ইহাই ঐ কথার মর্ম্ম । পরন্তু অন্য প্রকারে আবার আমার সমস্তই আছে, আমার ক্ষুধাও আছে, পিপাসাও আছে, ভোগ্য বস্তুর ভোগের দ্বারা স্মৃৎ হুঃখও আছে । কিন্তু ভোলাদাস ! একথাটি কিছু বিস্তীর্ণ হইবে, এখন আরতির সময়ও হইয়া আসিল, অনেক লোক জন আসিবে, অতএব এখন বলা হইতে পারে না, তুমি আজই রাত্রিতে আর একবার আসিও তখন ইহা বলিব ।

মায়ের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভোলাদাস মন্তকের দ্বারা মায়ের চরণ কমলের রেণু গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এমন সময়ে জ্ঞানানন্দও বাহির হইতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভোলাদাসকে বলিলেন,—

জ্ঞানানন্দ ।—দাদা মহাশয় ! আবার কখন আপনার দর্শন পাইব ? আমি অন্তান্ত বাড়ীতে মায়ের দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, আপনি একাকী ছিলেন ।

ভোলাদাস ।—ভ্রাতঃ ! সর্বদাই তোমার দর্শন ভালবাসি ; আমি একাকী ছিলাম না, মায়ের নিকটে ছিলাম, এখন চলিলাম । ভ্রাতঃ ! আমি তো সত্যই মায়ের নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে মায়ের ইচ্ছা

না হইলে অগত্যা ই একএকবার গিয়া একএকবার আসিতে হয়; সুতরাং আরও কতবার গত্যাত করিতে হয়, কতবার নুতন নুতন দেখা সাক্ষাৎ করিতে হয়, নিশ্চয় কি ? তুমি কি শিবানন্দের ওখানে গিয়াছিলে ? \*

জ্ঞানানন্দ ।—দাদা মহাশয় ! বুঝিতে পারিলে, আপনার কথাই বেদ-বাক্য ! আমি প্রতিদিন পাঁচ, সাতবার আপনার বাড়ী গিয়া থাকি ; এই মাত্র আপনার বাড়ী হইতেই আসিলাম ।

ভোলাদাস ।—শিব সাধ্যমতে মায়ের পরিচর্যা করিতেছে কি ?

জ্ঞানানন্দ ।—শিবানন্দ এবং তারানন্দ † মায়ের যেরূপ অহুরাগী যেরূপ মাতৃ-পরায়ণ, তাহাতে মায়ের শুশ্রূষার পক্ষে কোনও ক্রটির সম্ভব নাই । তৎপর, গৃহত্যাগকালে আপনি যে যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহারা হৃদয়-সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন ; সুতরাং মায়ের শুশ্রূষার সম্ভাবনা কি ? আপনার সহধর্মিণী এবং শিবানন্দ, তারানন্দ, যেরূপ প্রাণপণে মায়ের আরাধনা করিতেছেন, তাহা অস্বদাদির শিক্ষণীয় । আপনার বাড়ীতে গেলে অতি পাপ-হৃদয় নাস্তিকগণও পুত্তল না দেখিয়া, মাকেই দেখিতে পায় । দাদা মহাশয় ! তাঁহারা যেরূপ বেশ ভূষাদির দ্বারা মাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যেরূপ ভক্ষণীয় দ্রব্যাদির দ্বারা মায়ের পরিচর্যা করিতেছেন, তাহা অবিকল আপনার অভিপ্রায়, এবং শাস্ত্রের অহুমোদিত, আর মায়েরও অভিমত । শিবানন্দের পূজা প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রকৃত অহুরাগের পরিচয়প্রদ, আর দর্শকগণের পাব্য হৃদয় হইতেও তাহাতে মায়ের অহুরাগ আকর্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ । কারণ, আপনার বাড়ীতে, রাঙতা, চুম্বকী, অস্ত্রাদির নাম গন্ধও নাই, রাস্কের গুণে-জড়িত শোলাকাঠের দ্বারা এবং রাঙ জড়িত ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা, মায়ের অঙ্গ অপবিত্র করিয়া, মাকে একটা খেলার দ্রব্যের ন্যায় সাজানও হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের যথাসাধ্য সংগৃহীত স্বর্ণ-রজতের আভরণ এবং বস্ত্রাদির দ্বারা ই মায়ের সুবর্ণময় তনু বস্তির লাভণ্য বুদ্ধি করা হইয়াছে । আবার তাহাও বড় অল্প নয়, অব্যবহার্য্যও নয়, কিঞ্চিৎ রমণীমাসের স্তায় লোক দেখান মত সাজানও নয় । শিবানন্দ বাহা কিছু মাকে পরাইয়াছেন, মা অন্তর্হতা হইলে, তৎ সমস্তই ব্রাহ্মণসং হইবে ।

\* শিবানন্দ—ভোলাদাসের কনিষ্ঠের নাম ।

† ভোলাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারানন্দ ।



এতদ্ব্যতীত, অন্য যে যে উপহার মাঝে দিরাছেন তাহারও কোনটিই অল্পকর কিবা খেলনার ভায় অকর্মণ্য নহে ; সমস্তই ব্যবহারের যোগ্য। বরং যে ত্র্যব্টি তাঁহাদের সামর্থ্যের আরম্ভ হয় নাই, তাহা একবারেই দেন নাই ; কিন্তু তথাপি, অথোহা কোন জব্য মারের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। দা দামহাশয় ! আর অধিক কি বলিব, অবলাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতির পূজা দেখিয়া মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়, আপনার বাঙীর পূজা দেখিলে তাহা কি ছুই থাকে না, এবং পরম ভূক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

## ক্রমে হলো কি ?

আমরা সর্বজ্ঞ মহর্ষিগণের প্রীত যে কোন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তৎসমস্তেরই এক উদ্দেশ্য দেখা যায়—উদ্দেশ্য “জ্ঞান” প্রদান করা। ক্রটিতে আছে “ত্বমেব বিদিস্বাতি যত্বমেতি নান্ত পহুঃ বিদ্যাতেহন্নরঃ”—একমাত্র পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব যত্বকে অতিক্রম করিতে অর্থাৎ সমস্ত হুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তত্ত্বিন্ন আর অন্ত পহু নাই। কি বেদ, কি বেদান্ত, কি দর্শন, কি পুরাণ শাস্ত্র এই মহত্বদেস্ত সংসিদ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিরাছেন। শুরুমুখে গুনিয়াছি এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের গ্রন্থ পাঠেও ইহা দেখা যায়, যে, অধিকারী ভেদে বেদ মধ্যে বিবিধ ধর্ম নির্দিষ্ট আছে ; যথা—প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। অন্য কথায়, শাস্ত্রোক্ত যাগ বজ্রাদি কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপদেশ, আর ঐ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ ; এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে, যাগ বজ্রাদি কর্ম করিবার সময়ও বেরূপ বিধি বিধান অনুসারে করিতে হইবে, ত্যাগ করিবার সময়েও সেইরূপ শাস্ত্রাদিষ্ট বিধি বিহিত মতে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষেচ্ছা-চাণী হইয়া ত্যাগ করিলে তদ্বারা জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক বৈধ-কর্ম ত্যাগ অন্য ভয়ানক অন্ধকারময় স্থানে অর্থাৎ স্বাবর বা তীর্থগ্ যানি প্রভৃতি নীচ বোনিতে গমন করিতে হইবে। যদি এরূপ ভিজাসা

করেন যে এইরূপ বিকৃত উপদেশ প্রদান করার উদ্দেশ্য কি ? তদন্তরে আমরা ইহা বলিতে চাহি যে জীবগণের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই এইরূপ উপদেশ প্রদানের হেতু। বেদরচয়িতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার স্রোতা, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ প্রধান অনুষ্ঠাতা, বর্গভোগ বা যোজ্যলাভ তাহার কল।

মনুষ্য বভে বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ হউক না কেন তাহাদের কৃত “আতন” কোন না কোন অংশ অমম্বুক্ত হইবেই হইবে, কিন্তু সেই বিশ্বপতির এইটাই ঈশিষ ও অনৌকিক ঐশ্বর্য্য যে তদীয় বেদরূপ “আতনে” কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদাদি দোষ দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ স্ত্রীর বাক্যরূপ-বেদ শাস্ত্রানুসারেই স্বজন পালন ও ব্রহ্মাণ্ডের লয় করিয়া থাকেন। জীব-গণ বেদের মর্মানুসারেই স্ব স্ব কর্মকল ভোগ করিয়া থাকে। বেদের অবজ্ঞাকারীগণ অম্বর বলিয়া গণ্য হয়, তাহারা কখনই শান্তি স্থখ লাভে অধিকারী হইতে পারে না।

উপরে যে “জ্ঞান” শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং বাহ্য লাভ করিবার অন্য ঋতি সকল জীবগণকে বিবিধ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রজ্ঞান বা শিল্পজ্ঞান নহে ঐ শব্দটি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, বেদ ইহাকে বিদ্যা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিদ্যা ব্যতীত শাস্ত্রাদি জ্ঞানকে বেদে অবিদ্যা, শিল্পজ্ঞান, অজ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান প্রভৃতি নানা শব্দে বাচ্য করিয়াছেন। যে শিল্পজ্ঞান বা সাংসারিক জ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমরা ইউরোপীয় মনুষ্যগণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি, যে শাস্ত্রজ্ঞান কথঞ্চিৎ লাভ করিয়া আমরা অহঙ্কারে মাতীতে পা কেলিতে চাহিনা, জ্ঞানীগণ ঐ শিল্প ও শাস্ত্র জ্ঞানকে অবিদ্যা অর্থাৎ মোহকারিনী বলিয়া নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। অহো! সংসারের কি বিচিত্র গতি! যে মূত্র পূরিষকে কোন জীব ঘৃণায় স্পর্শ করেনা অন্য জীব তাহাই মস্তকে বহন বা ভক্ষণ করিতেছে! ঋতি ও বেদান্তাদি বর্ণন শাস্ত্র সকল এই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জন্য মুক্তিকারী জীবগণকে সংক্ষেপে তিনটি পথ দেখাইয়াছেন—(১) ক্রিয়া যোগ অর্থাৎ সন্ধ্যা, তর্পণ, বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণ, বাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে সম্পাদন করিয়া কর্মকল তাঁহাতেই সমর্পণ করা। স্ব স্ব বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি) স্ব

স্ব আশ্রম (গৃহস্থ ব্রহ্মচর্যা, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু) নির্দিষ্ট বৈদিক কর্ম সকল বধা বিধি সম্পাদন করিয়া কর্মকল ভগবানে অর্পণ করিলে সেই নিকামী মহাত্মা অনায়াসে এই ক্রিয়া যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। (২) জ্ঞান যোগ—যড় বর্ষন রচয়িতাগণ এই জ্ঞান যোগ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা তিন অঙ্গে বিভক্ত, প্রবণ অর্থাৎ গুরুমুখে আত্ম তত্ত্ব শুনিবে, (৫) মনন দর্শন—শাস্ত্রীয় সূত্র সকলের সাধ্যাযো আত্মার বিষয় মীমাংসা করিবে ঐ মীমাংসা এতদূর দৃঢ় হওয়া উচিত যে, কোন নাস্তিক তর্কে যেন সেই মীমাংসা সোস্তব বিশ্বাসকে আন্দোলিত করিতে না পারে। নিদিধ্যাসন যোগ শাস্ত্রোক্ত নিয়মালুসারে পরমাচার ধ্যান করিবে এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীব মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে।

পূর্বোক্ত ক্রিয়া যোগ ও শেষোক্ত জ্ঞান যোগের যে ফল একই— অর্থাৎ মুক্তিলাভ, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতাতে বলিয়াছেন  
সান্ব্যায়োগৌ পৃথজ্জালা প্রবনন্তি ন পণ্ডিতাঃ,

এক ব্যাপাতিতঃ সম্যগ্ভভয়ে বিবর্ততে কলম্ ॥ ৪ ॥ (গীতা ৫ম অধ্যায়)  
সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মযোগ এ উভয়েরই ফল এক,—অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি। তথাচ যাহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র বলে তাহারা অজ্ঞান, পণ্ডিতেরা কদাচও পৃথক বলেন না; যেহেতু ইহার এক পক্ষ সম্যক রূপ অবলম্বন করিলেই উভয়েরই ফল যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্মালুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ক্রমে ২ চিত্ত শুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েরই উদ্দেশ্য ও ফল এক হইল।

আজ কাল, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, যোগ সম্বন্ধে অনেকানেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু হৃৎখের বিষয় এই যে প্রচারক মহাশয়গণ মুক্ত কর্তে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন—তাহারা যোগী নহেন এবং তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও দিতে পারেন না, অতএব হজুক প্রিয় বন্ধ মুবক অগত্য! পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াই যোগ বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন আর বলিতে লাগিলেন “ওক কে ? ওকত শিব ! অজ্ঞা-

নীর জনাই মাহু-গুরু আবশ্যক আমাদের জন্য নহে। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া ৩।৪ মাস হইল সারদা বাবু নামক হাইকোর্টের জনৈক কর্ম-চারী অকালে প্রাণায়াম শিক্ষা দ্বারা কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। অন্য একমাস হইল আমার পরিচিত কলিকাতা বাগবাজার নিবাসি “হরিমোহন” নামক একজন কায়স্থের সন্তান “প্রণব” সাধিতে গিয়া উন্মাদ হইয়াছেন। এইরূপ রোগগ্রস্ত আরও ৩।৪ জন ব্যক্তি মদীর গুরু নিকট -আরোগ্য লাভ করিতে আসিয়াছেন। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই লিখিলাম, পাঠকগণ সাবধান হইবেন। দ্বিতীয় এক সম্প্রদায় বঙ্গ যুবক যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ সন্ধ্যা তর্পণাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়ার আবশ্যক নাই। কলির কি মাহাত্ম্য! ইংরেজি শিক্ষার কি অপার শক্তি! যে “ব্রহ্মজ্ঞান” সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধিকালে ভিন্ন অন্য প্রকারে উৎপন্ন হইবার নহে যে “জ্ঞান” লাভ করিবার জন্য মহর্ষিগণ কত উৎকট তপস্য। অবলম্বন করিয়াছেন বহুজন্ম ও আয়াসভর “জ্ঞান” পুস্তক দর্শন মাত্রই লাভ করিতেছি। আমাদের নায় “কলির চেলা” গণের পক্ষে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অধঃপতনের প্রশস্ত সোপান স্বরূপ সন্দেহ নাই। আমার পরিচিত অপর ২।৩ জন কায়স্থের সন্তান কোন “অকাল কুন্ধ্যাও গুরু” নিকট হইতে “ঋণবশু” মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে; ইহারা বর্ণাশ্রম ধর্মের এইরূপ অবমাননা করিয়া উন্মাদাদি রোগগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া বোধ হয় যে জ্ঞানোপদেশগুক্ত ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল হুর্ভাগ্যক্রমে কি নরকের দ্বার হইয়া দাঁড়াইল? এ দৃশ্য অতি শোচনীয় ও ভয়ানক! পাঠক মহোদয়গণ—যেন এরূপ মনে না করেন যে এত-দ্বারা আমি জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ এই সকল ঋষি প্রণীত গ্রন্থের অধ্যয়ন করাতে দোষারোপ করিতেছি। দোষ দেওয়া দূরে থাকুক আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি আপনাদের মধ্যে যাহার যতটুকু অবকাশ থাকে তিনি গীতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাহা অতি-বাহিত করুন।—পুস্তক পড়িয়াই জ্ঞানী হইলাম এইরূপ মনে করিয়া যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপ ত্যাগ করে তাহাদিগকেই “কলির চেলা” ও ঘোর দুর্খ বলিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারি না।

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত না হইয়া যোগ শিক্ষা করা সুত্ব্যর কারণ মাত্র । এতদ্বারা ঐহিক পারত্রিক কোন ও মঙ্গল সাধিত হয় না বধা পুস্তক দেখিয়া কোন মন্ত্র অঙ্গ করিলে তদ্বারা সিদ্ধি না হইয়া বিপরিত ঘটয়া থাকে । অজ্ঞানীর অর্থাৎ যিনি জীবমুক্ত নহেন এতরূপ ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা আর এক অন্ধের নিকট অন্য এক অন্ধের পথ জিজ্ঞাসা করা একই কথা । তাই ঋতি বলিতেছেন “ অন্ধেন নীরমানাঃ বধাচ্ছাঃ, শাস্ত্র্যাকার বলিতেছেন ” ইত্যর্থঃ অন্ধ পরম্পরা ” ।— আজ কাল অধিক স্থলেই এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, ফল যে কি হইবে পাঠকগণই বিচার করুন ।

৩ ভক্তিব্যোগ—শাণ্ডিল্য মুনি বলিতেছেন “ ভক্তি, পরামুরক্তি রীত্বরে ”, অগদীশ্বরে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক অমুরক্তিকে ভক্তি বলা যায় । অগদীশ্বর স্বয়ংই গীতা শাস্ত্রের বর্ষ, ষাটশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে উহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন । বিস্তার ভয়ে ঐ সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না । বাচ্য হউক ভক্তি যোগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে এক সাধন লক্ষণ বা সত্ত্বা; ২য় প্রেম লক্ষণ বা নিষ্ঠুরা । সাধন লক্ষণ ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করিতে কঠিতে প্রেম লক্ষণ ভক্তি স্বয়ংই উদ্ভূত হয় । প্রেম লক্ষণ ভক্তি হইতেই বিবেক বৈরাগ্য, তত্ত্ব-জ্ঞান প্রভৃতি অন্নিয়া থাকে । উহাদের জন্য পৃথক্ বহু করিতে হয় না । সাধন বা সত্ত্বা ভক্তি ৩৪ অঙ্গে বিভক্ত (১) শ্রবণ অর্থাৎ ভগবদ্বিবর যে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা শ্রবণ অধ্যয়ন বা শুদ্ধির নিকট শ্রবণ করিবে । (২) কীর্তন অর্থাৎ ঈশ্বরের স্তুতিাদি ঐশ্বর্যের বিবরণ পরম্পর কথোপকথন ; ভগবানের অবতার সহস্রীয় গুণা-মুখাদ এবং সঙ্গীত দ্বারা তদীয় নাম কীর্তনাদি ও কীর্তন বলিয়া গণ্য হয় । (৩) বন্দনা অর্থাৎ ঈশ্বরের স্তব পাঠ । (৪) পদসেবন অর্থাৎ ফল পুষ্পাদির দ্বারা ভগবানের অর্চনা ও ধ্যান করা ।

দ্বিতীয় প্রকার প্রেম লক্ষণ ভক্তি পাঁচ অঙ্গে বিভক্ত হয় ? (১) মনন, অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং অবলম্ব প্রভৃতির গূঢ় মর্ম্ম করণাদির সহিত বুদ্ধি দ্বারা মনে মনে যৌনাঃসা করা । (২) পূজন, অর্থাৎ মানসোপচারে ভগবানকে অর্চনা করা । (৩) দাস্য ভাব, অর্থাৎ সর্বদা স্বীয় জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া জ্ঞান করা স্বীয়

ওভাওত কার্য সকল তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে; আমি সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন আমার কিছুই স্বাধীনতা নাই এইরূপ ভাবে অত্যাচার ত্যাগকে শাস্ত্রকারগণ দাস্য পদে বাচ্য করিয়াছেন। (৪) সখ্য, অর্থাৎ সৰ্ব্বদা গুণবানকে সখ্যার ন্যায় বোধ করা। মহাত্মা অর্জুন, পুত্র্যা গোপিনীগণ অগনীশ্বরকে এই ভাবে ভক্তি করিয়াছিলেন; ইহা পুরোক্ত দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৫) আত্ম নিবেদন, অর্থাৎ সোহৃৎভাবে—এ অবস্থায় উপাসক স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মার সতিত অভিন্নরূপে দর্শন করেন। জ্ঞান যোগের ইহাই নির্বিকল্প সমাধি। অতএব নিগূর্ণ ভক্তি আর জ্ঞান যোগ উভয়ের যে এক কল তাল বলা বাহুল্য। ক্রিয়া যোগের চরমাবস্থায় উপাসক যেকোন ভাবাপন্ন হন ভক্তি যোগে ও জ্ঞান যোগের চরমাবস্থায়ও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ সমাধিবানু হন অতএব তিনি পক্ষেরই গম্য স্থান এক।

কি জ্ঞানযোগ অভ্যাসকারী, কি ভক্তিযোগ অভ্যাসকারী কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, জ্ঞানসাধনের পূর্বে কাহার ও য য বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক কর্ম হইতে অব্যাহতি আছে। যিনি যোহ বশতঃ এই সকল কর্ম পরিত্যাগ করিবেন তাহার জ্ঞান লাভ হওয়া দূরে থাকুক অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা। ভগবানু স্বয়ংই গীতাতে এই বিষয় বিশেষ রূপে বলিয়াছেন;

নিরতস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে

মোহান্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ৷ ৭ ৷ অধ্যায়তে কাম্য কর্ম সংসার বন্ধনের কারণ অতএব কাম্যকর্ম ত্যাগ করা বুদ্ধি বুদ্ধ। কিন্তু নিত্য কর্ম সঙ্ঘাতপূর্ণনাদি কদাচও পরিত্যাগ করিবে না। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিত্যকর্ম ত্যাগ করিলে ঐ ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা যায়, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ঐরূপ ত্যাগ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এমন্য ইহা অধঃপতনের হেতু বলিয়া জানিবে।

স্বতি বলিতেছেন—

“জানিনা জানিনা বা পি যাবদেহস্য ধারণং

তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্তব্যং কর্ম বুদ্ধয়ে ॥”

জানীই হউন অজানীই হউক তিনি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পক্ষে সেই সেই আশ্রম বিহিত

শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম তাহার বাবৎ দেহ থাকে তাবৎ করা কর্তব্য : কারণ উহা দ্বারা প্রারম্ভ কৰ্ম হয় হইয়া থাকে। বেদান্ত দৰ্শনে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞান হইলেও প্রারম্ভ কৰ্ম হয় না হইলে তাহারও মুক্তি হয় না। বামদেব ঋষির জ্ঞান উৎপত্তির পরে অন্য এক জন্মে প্রারম্ভ কৰ্ম হয় ? ভারত ঋষির উহা তিন জন্মে হয় হইয়াছিল।

যে দিন হইতে আমরা ঈশ্বর আজ্ঞা বেদ বাক্য ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য এবং মণ্ডবিগণের মবাদি শাস্ত্র সকলের বিধি নিষেধ বাক্য অবমাননা করিয়াছি, যে দিন হইতে হিন্দুগণ ধর্ম কার্যের প্রকৃত মর্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নকলে এবং বাহিরের চাকচিক্যে রত হইয়াছেন, যে দিন হইতে যোগ ভুলিয়া গিয়া ভোগকে জীবনের সার মনে করিয়াছেন সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে অধঃপতন বলিতে কেবল রাজ নৈতিক অবনতি বুঝিবেন না; রাজনৈতিক অবনতি মনুষ্য জাতির প্রকৃত অবনতি নহে; বস্তুত পক্ষে আধ্যাত্মিক ভেদ হারাইলেই মনুষ্য জাতি অধঃপতিত, এমন কি পশুদে পরিণত হয়। ধর্মবল শূন্য স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নহে। বন্ধুগণ! একবার উদ্বিগ্ন হও তোমাদের গৃহের রত্ন চিনিতে শিখ। তোমরা কোন্ বংশে জন্মিয়া কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় আসিয়াছ, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি কর। গৃহ লক্ষ্যকে অবমাননা করিয়া কি অন্য বিদেশীয় অলক্ষ্যের লাভ আশায় অমূল্য জীবন বৃথা কাটাইতেছ? দেখ আজ বহু দূরস্থ আশ্রম জাতি ঋষিগণের গ্রন্থ সমূহকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেছে। আর তোমরাই সেই ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকলের কিরূপ মৰ্যাদা করিয়া থাক। হায়! অগদীন! এ দুঃখরজনী কি প্রভাত হইবেনা, ভারতের এ দুর্দিন কি সুদিন হইবেনা?



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

৯ম খণ্ড।

## ব্রহ্মযজ্ঞ।

বিশ্বসংসারের অনেক স্থল প্রাণি-সঙ্গে পরিবেষ্টিত। প্রাণি-সকল বহুভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে একভাগ মনুষ্য। মনুষ্যগণ কৰ্ম্মবশে দেশ-ভেদে জন্মগ্রহণ করিয়া আকৃতি প্রকৃতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন। কেহ আৰ্য্য, কেহ অনাৰ্য্য, যবন, শ্বেচ্ছ, বৰ্কর ইত্যাদি। এতন্মধ্যে আৰ্য্যগণ সৰ্ব্ব বিষয়ে প্রধান। আৰ্য্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ ও পরম পূজনীয়। ক্রমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম্ম, সত্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আন্তিক্য প্রভৃতি যদি সুগুণ ও মানব ধর্ম্মের সার হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণগণে পরিলক্ষিত হইবে। উদারতা ও নির্লোভতা যদি পুরুষকারের ভূষণ হয়, স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মোৎকর্ষে যদি প্রাধান্য হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণের নিকটে বিরাজিত। পরমেশ্বরকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার ভৃত্যভাবে বাব-তীয় কার্য সাধন যদি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণজীবনেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহারা গম্ভীরভাবে সত্যকাম হইয়া ব্রাহ্মণাচার সন্দর্শন করিয়াছেন, চিন্তা করিয়া প্রতিকার্য পধ্য-বেক্ষণ করিয়াছেন, জঘন্যকাম-দাস না হইয়া পবিত্রতা পূর্ণলোচনে



পূর্বাঙ্গর ভাবিয়াছেন, তাঁহার। অবশ্যই ইহার বাধার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। অন্যথারিহেবকষায়িত নেত্রে ও অসংযত চিন্তে কখনই প্রকৃত কার্য বিভাসিত হইবার নহে। ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত গুণ রাশিতেই জগৎ মুক্ত হইয়া প্রণত ছিল। কল কৌশলে তাঁহাদের ক্ষমতা পরিচালিত হইতনা। বলের মধ্যে তপোবল, কৌশলের মধ্যে, সারগর্ভ উপদেশ-পরিপূর্ণ-মহু-মধুর-বচন। সেই সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে আজ আমরা ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা এখানে উপন্যাস করিলাম।

ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম।

“ পঞ্চানামমসত্ৰাণাং মহতামুচ্যতে-বিধিঃ ।

যৈরিষ্টা। সততং বিপ্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ সন্ন শাস্ততম্ ॥১॥

দেবভূত পিতৃ ব্রহ্ম মনুষ্যাণামনুক্রমাৎ ।

মহাসত্ৰাণি জানীয়াৎ তু এবৈহ মহামথাঃ ॥২॥

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞস্ত, তর্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলিভেঁতো নৃযজ্ঞোহ তিথিপূজনম্ ॥৩॥

ইত্যাদি ছন্দোগ পরিশিষ্টে মহামতি কাত্যায়ন।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূততজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। আমরা অতি সংক্ষেপে চারিটি মহাযজ্ঞের কথা লিখিয়া পরে ব্রহ্মযজ্ঞের কথা লিখিব। পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। পিতৃ প্রসাদে অবনীতে অবতীর্ণ, রক্ষিত, জীবিত ও শিক্ষিত। জননী-জঠরে প্রবেশ অবধি ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত জননী অশেষ ক্রেশ সহ করিয়া থাকেন। প্রসব সময়ে কত যাতনা ও ভাবনা। পরে সন্তানের যত্ন পুরীষে ক্লিন্ন থাকিয়া ও অবিরক্তভাবে তাহাদিগকে লালন পালন করেন। কিছুকালের জন্য নয়নের অন্তরাল হইলেই কত উদ্বেগ বোধ করেন। কার্যবশে বিদেশে গেলে আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিক্ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। এবং বিধ পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই হইবে। কেবল মুখের কথায় হুই একটি ধন্যবাদ দিলে উহা হয় না। সেই বরনীর মাতা পিতা পরলোকে প্রস্থান করিলে উর্ব্ব দৈহিক ক্রিয়াশীল হারা কথঞ্চিৎ নিষ্কর হয় মাত্র। প্রতিদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া কোন সংকার্য করা অবশ্য কর্তব্য।

আবার সেই জন্ত পিতৃকুল ও মাতৃকুল অবশ্যই পূজাহঁ। সেই জন্য উহাদেরও প্রাক্ত ও তর্পণ বিধেয়। কেবল পিতৃ মাতৃকুলের তৃপ্তি সাধন করিলেই পর্যাপ্ত হয় না এজন্য দেব তর্পণ ঋষি তর্পণ, ব্রহ্ম তর্পণ, প্রভৃতি বহুবিধ তর্পণ করিতে হইবে। যাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রভাবে সংসার যাত্রা নির্দাহ পূর্ণক অন্তিমে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহারও তর্পণ করিতে হয়। উহাতে কেহই বাকি থাকেনা। শত্রু, মিত্র, পশু পক্ষি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের তর্পণ করিতে হয়, এমন কি অন্য জন্মের বহু বান্ধবদিগের পর্যাপ্ত তর্পণ করিতে হয়। কাহারও বৈমুখ্য নাই। তর্পণের মন্তাদিহঁ তাহার প্রমাণ।

ব্রাহ্মণের অতি প্রত্যুষে গাত্তোখান করিয়াই ভারিতে হইবে

“অহং দেবো ন চান্যোন্মি ব্রহ্মবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্ ॥”

পরে যথারীতি অন্যান্য কার্য শেষ করিয়া অনাতুর ব্যক্তি প্রাতঃস্নানী হইবে। স্নান করিয়া আমিহঁ কেবল তৃপ্ত ও বিমুক্ত হইব তাহা নহে, এজন্য স্নানাত্ম্য তর্পণ করিতে হয়। পরে স্ব স্ব শাখোক্ত বিধানানুসারে সন্ধ্যাদি উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে বা অন্তে সম্পূর্ণ রূপে তর্পণ করিতে হয়। উপাসনা দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা উপস্থিত হয়, তখন তর্পণ দ্বারা আবার “সোহম্” ভাবটী চেতিত করিয়া দেয়। আমি কে? কোথা হইতে হইলাম, আবার অন্তিমে কোথায় যাইব? আমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল কোথায়? সংসার-মোহ-চক্রে অতি অল্প দিনই অতিবাহিত করিতে হইবে, তর্পণ এই সমস্ত কার্যের স্মারক। উহা নিত্য কর্তব্য, অকরণে প্রত্যব্যয় হইয়া থাকে। প্রতিদিন শুচি হইয়া সংযত চিত্তে তর্পণ কার্য করিতে হইবে। তর্পণান্তে—

“পিতা ধর্মঃ পিতা কর্তব্য পিতাহি পরমন্তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥”

বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

ক্রটিতেও “পিতৃদেবোত্তম, মাতৃদেবোত্তম” ইত্যাদি বিস্তার আছে।

এরূপ ভক্তি কৃতজ্ঞতা, ও পরলোক প্রেয়ঃসাধন কার্য সভ্য মাত্রের কর্তব্য। ব্রাহ্মণ বা আর্ঘ্য জাতি ভিন্ন যবন, শূদ্র, ব্রাহ্ম প্রভৃতিগণ প্রতিদিন পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে কিছু করিয়া থাকেন কি?

আর্য্যগণ কেবল স্বার্থোদয় পরিপূর্ণ জন্ত কোন কার্য্য করেন না। বধা সাধ্য পরের ভরণ পোষনান্তে যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল স্বার্থোদয় পরিপূর্ণ তির্ধ্যগ্ জাতিই করিয়া থাকে, আর তত্তুল্য মানবাখ্যাদারী মোহ-মদমত্ত প্রাণিগণ করিয়া থাকে। তর্পণে যেমন উদার ভাব লক্ষিত হয় এরূপ অন্যান্য যজ্ঞেও হইয়া থাকে। এমন বিধোদার সর্বজনীন ভাব আর কোন জাতির নাই। তাহাদের মনেও স্থান পায় না। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই উহার প্রতীতি হইবে। তর্পণ একটি যজ্ঞ। উহা করিতেই হইবে, না করিলে পাপ হয়, এইজন্ত কাত্যায়ন ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—

“তস্মাদ্ সদৈব কর্তব্যমকুর্কল্পহতেনসা।

যুজ্যতে ব্রাহ্মণঃ কুর্কন্ বিশ্বমেতদ্বিভক্তির্হি” ॥

নিত্যই তর্পণ করা কর্তব্য, না করিলে মহৎ পাপ ঘটে। তর্পণ দ্বারা বিশ্ব সংসারের ভরণ হইয়া থাকে।

সূর্য্য তেজোময় পদার্থ। সূর্য্য ভিন্ন জগৎসৃষ্টি রক্ষিত হয় না। প্রাণিগণ জীবিত থাকিতে পারে না, ভক্ত সাধক পরমেশ্বরের তেজোময় বরণীয় ভাব সূর্য্য দৃষ্টেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। সূর্য্য ভিন্ন সৃষ্টি প্রবাহের কীদৃশী দশা স্মৃতিতে একটু চিন্তা করিলে অনেকেই অনুভব করিতে পারেন। আর্য্যগণ ব্রহ্মবলে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। বেদে সূর্য্য সম্বন্ধে বহুবিধ উপস্থাপন আছে উহাতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন “সূর্য্য আস্মা জগতস্তস্মুশ্চ। হোম করিতে সূর্য্যাদি দেবতার উপলক্ষ করিয়া অগ্নি পরিচর্যা করিতে হয়। উহা দৈব যজ্ঞ। স্ব স্ব গৃহ সূত্রে তাহার বিধান আছে। দেব পরিচর্যা দ্বারা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পরিষ্করণ হইয়া ক্রমশঃ দেব ভাব অন্তরে আবির্ভূত হয়, চিত্ত ও দেহ পবিত্র থাকে, সহজে চিন্তের তদগত ভাব হইয়া পরমেশ্বরে ভক্তি হয়।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আর্য্য জাতির মত শিষ্ট, সভ্য, বদাশ্র, ও দয়ালু আর নাই। আর্য্যগণ স্বার্থোদয় পরায়ণকে চিরকাল হীন বলিয়া জানিতেন। স্বার্থোদয় পরায়ণ অহম্মুখগণ নিজের জন্তই ব্যস্ত। আর্য্যগণ নিজের জন্ত ততদূর ব্যাকুল হইতেন না। ভূত যজ্ঞ তাহার একতর প্রমাণ। আমরা উপাদেয় আহারে রসনার ও উদরের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া সুখী হইব আর পশু পক্ষিগণ তাহার অংশ পাইবেনা ইহা উদার ও প্রেমস্বাম্য ব্যক্তির অন্তরে সহ হইবে না। সে সমদর্শী হইয়া প্রাণিমাত্রকে সদয়

নয়নে নিরীক্ণ করিয়া থাকে । ইতর প্রাণীর হৃৎ হৃৎও হৃৎ হৃৎ বোধ করিয়া থাকে, এই জন্ত তাহাদিগকেও স্বপ্রস্তুত দ্রব্যের কিয়দংশ প্রদান করে । ইহা এসিদ্ধই আছে যে আৰ্য্যজাতি গোসেবার জন্ত অতি বিখ্যাত । গাভীর কোনরূপ অসুবিধা না হয় এই জন্ত অনেকেই যত্ন করেন । এবং গো গ্রাস দান করেন । অনেকে মনে করিতে পারেন গো গ্রাস দান স্বীয় গোগণে দিলেই হইতে পারে, কিন্তু উহা হইলে স্বার্থপরতার উদাহরণ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে—

“স্বাসমুষ্টিং পরগবে সান্নংদদ্যাতু যঃসদা ।

অকৃত্বাস্বয়মাহারং স্বর্গলোকংসগচ্ছতি ॥” মহাভারত ।

পরের গোধনকে অন্নের সহিত স্বাস মুষ্টি প্রদান করিতে হইবে বরং উহা স্বীয় ভোজনের পূর্বে সম্পাদিত হইবে । এইরূপ যাবতীয় প্রাণি দেহ বিরাজিত আত্মা, ভৌত বলিতে পরিতোষ লাভ করেন । যথাসাধ্য প্রাণি জাতির সুম্মিষুত্তি করিয়া যথারীতি স্বীয় বুভুক্ষার নিরুত্তি করিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে । আমরা এ পর্য্যন্ত ইতর প্রাণিমণ্ডলের তৃপ্তি সাধনান্তর স্বতৃপ্তি লাভ করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছি । এখন আর একটা কথা বলিতেছি তাহা অতিথি সেবা ।

নৃষজ্জোহতিথি পূজনম্ । অতিথি সংস্কারকে নৃষজ্ঞ বলে । বিদেশীয় দূরদেশে উপনীত হইলে তাহাকে সমাদরে পরিগ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য স্থান ও আহার প্রদান করিয়া বিশ্রান্ত করা মতিমান ব্যক্তি মাত্রেই কর্তব্য । আজ কাল সভ্যতার বোষণ সময়ে অতিথি সেবা ক্রমশঃ উঠিয়া, বাইতেছে । কারণ উহাদের গুরু স্থানে উহার প্রচল নাই । আবার শিবু বাবু অতিথি হইলে হয়ত এণ্টিমনি বাবু কিছুকাল আতিথেয় হইতে পারেন । এখনও বিল (Bill) করিয়া ভোজন ব্যয় চাহিতে সাহস পান না । ক্রমশঃ তাহাও হইবে । কিন্তু হরেকৃষ্ণ সাধু অতিথি হইলে প্রায়ই অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিতে হয় । আৰ্য্যশাস্ত্রে বা আৰ্য্যরীতি তদ্রূপ নহে, তাঁহার অতিথির পূজা করিয়া পরে ভোজন করেন—

“সকেবলমবৎভুঙ্ক্তে যোভুঙ্ক্তে তৃতিথিংবিনা ।

অবৎ স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃ পচন্ত্যাস্বকারণাং ॥

ইন্দ্রিয় প্রীতিজননংব্যথাপাকং বিবর্জয়েৎ ॥”

বিষ্ণুপুরাণ ।

যে অতিথি বিনা ভোজন করে সে পাপ ভোজন করে। যে কেবল নিজেরই ভোজন করে সেও পাপ ভোজন করে। ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক বৃথাপাক পরিবর্জন করিবে। অনেকে বলিতে পারেন কদাচিৎ অতিথি কর্তৃক প্রভাবিত হইতে দেখা গিয়াছে। কুচরিত্র লোক প্রচ্ছন্ন বেশে আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক পরস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে পারে। সাবধানে থাকিলে ও এরূপ অনাৰ্য্য ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। তথাপি যদি কোন সময়ে কোন সাধু মহাজন উপস্থিত হন, তবে সে ক্ষতি পরিপূর্ণ হইয়া বথেষ্ট লাভ হইতে পারে। সেই আশয়েও আতিথ্যের কর্তব্য। “সর্বদেবময়েতিথি” ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সংস্করের সঙ্গতি হইবে এবং প্রকৃতি অতিথির পরিতোষে আশ্রয় তুষ্টি লাভ হইবে, এই জন্যই আতিথ্যের হওয়া নিত্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ইহাতে যেমন ইহকালে যশোলাভ হয়, তেমন পরকালেও সুকৃতি জন্ত স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবজ্র— “অধ্যয়নং ব্রহ্মবজ্র, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদিকে ব্রহ্মবজ্র বলে। জ্ঞান সন্ধ্যাদি উপাসনায় চিত্ত পবিত্র ও কোমল হয় সেই সময়ে সংগ্রহাদি পাঠ করিলে-ভক্তিভাবে চিত্ত বিষয় ছাড়িয়া ব্রহ্মভাবে তদগত হইয়া থাকে। কেহ বেদ কেহ গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ আবৃত্তি করিতে করিতে একান্ত পুলকিত হইয়া উঠেন। সম্প্রদায়িক মাত্রেরই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও করিয়াছেন। বাহারা বেদাদি শাস্ত্র উদাত্তাদি স্বর সংযোগে অর্থ জ্ঞান পূর্বক পাঠ করিবেন তাহাদের পাঠ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে উত্তম পাঠক হইতে সকলেই যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন—

“ব্যাক্তী যথাহরেৎ পুত্রান্‌ জ্ঞেয়াভ্যাং নচপীড়য়েৎ ।

ভীতা তপন ভেদাভ্যাং তদ্বর্ণান্‌ প্রযোজয়েৎ ॥”

পাণিনীয়া শিক্ষা ।

ব্যাক্তী যেমন স্বীয় সম্ভান দিগকে মুখে করিয়া স্থানান্তরে লইয় যায়, দস্ত বেধন ও মুখ হইতে পতিত হইবে বলিয়া শঙ্কা থাকে। উভয় আশঙ্কা হইতে ব্রহ্মা করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করে। বেদ পাঠক ও তেমন সতর্কভাবে বেদপাঠ করিবেন, কোন বর্ণ না পড়িয়া যায় ও স্বরব্যতিক্রম হইয়া বিদ্ধ না হয়, এইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

“এবং বর্ণাঃ প্রয়োক্ৰব্য নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ

সম্যগ্ৰ্ণ প্রয়োগেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥” পাণিনীয়া শিক্ষা

আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া \* বর্ণ প্রয়োগ করিবে। কোন বর্ণ অব্যক্ত থাকিবে না। অথবা উচ্চারণ করিয়া বর্ণ তাড়না করিতে হইবে না, সম্পূর্ণ রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। কোন বর্ণ অংশতঃ অনুচ্চারিত হইলে বর্ণের পীড়া করা হয়, সম্যগ্ৰূপে উচ্চারিত হইলে, ক্রিয়ার সর্বাদ্বীন পূর্ণতা ঘটে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং আধ্যাত্মিক সদ্ভাবের পরিস্করণ হয়, এইজন্য “ব্রহ্মলোকে মহীয়তে” এরূপ ফলশ্রুতি আছে।

গীতী, নীত্রী, শিবঃ কন্দী তথা লিখিত পাঠকঃ।

অনর্থজ্ঞোহন্ন কঠঞ্চ ষড়্ভেতে পাঠকাধমাঃ ॥ পাণিনীয়া শিক্ষাবাক্য গানভাবে পাঠ, শীঘ্র পাঠ, শিব প্রভৃতি অঙ্গের কল্পনাদি মুদ্রাদোষ দৃষ্ট না হইয়া পাঠ, লিখিত পাঠ, অর্থ না জানিয়া পাঠ, ও অল্পকঠন্বরে পাঠ, অধম পাঠকের কার্য।

এস্থলে আমাদের মত এইরূপ পাঠ করা কর্তব্য। বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ একশাখা মুখে আবৃত্তি করিতে অনেকেই সমর্থ হইবেন না, সুতরাং লিখিত পাঠ অধম কল্পের হইলেও পাঠ-বিরত কর্তব্য নহে গ্রন্থ দেখিয়া সংযত মনে পাঠ করা কর্তব্য। যিনি ষড়্ দূর আবৃত্তি করিতে সমর্থ তাহাও পাঠ করিলে পাঠ হইবে। অর্থজ্ঞান না জন্মিয়া থাকিলে পদচ্ছেদাদি বোধ হুঙ্কর হয়, তথাপি ষাধাসাধ্য অধ্যয়ন করিতে হইবে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব থাকেনা। বেদের এক-নাম ব্রহ্ম, এইজন্ত ইহাকে ব্রহ্মবজ্র বলে। বেদাদি অভ্যাস ও জপাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় এই জন্তও ব্রহ্ম বজ্রবলে।

“মার্ধ্য্য মক্ষর ব্যক্তি পদচ্ছেদস্ত হুঙ্করঃ।

ধৈর্য্যংলয় সমর্থঞ্চ ষড়্ভেতে পাঠকাণ্ডগা ॥”

মার্ধ্য্য, অক্ষর ব্যক্তি, পদচ্ছেদ, হুঙ্কর, ধৈর্য্য ও লয় সমর্থ হওয়া পাঠ কালে এই গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যাকরণ, শিক্ষা গ্রন্থ ও প্রাতিশাখ্য ও গুরুপদেশের প্রতি স্মরণ রাখা কর্তব্য।

\* শিক্ষা বাক্যে আছে বাহ্য ভয়ে উদ্ভূত হইল না।

বেদ প্রথমাধি যথা শক্তি অধ্যয়ন করিবে । অথবা জপ করিবে ।

“বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোহহরহজ পৈং ॥

কাত্যায়ন

স্বাধ্যায়ন্ত যথাশক্তি ব্রহ্মযজ্ঞার্থ মাচরেৎ ।

“ঋচাঞ্চ যজুৰ্যং সাম্যং গাথাগুহ্মথাগিবা ॥

আদাবারভ্য বেদন্ত স্নাত্বোপৰ্য্যুপরিক্রমাৎ ।

যদধীতে হবহং তক্ত্যা স স্বাধ্যায় ইতিস্মৃতঃ ॥”

ব্রহ্ম যজ্ঞার্থ যথাশক্তি স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে । ঋক যজু সাম রহস্য ( উপনিষদ্ ) ও গাথা প্রভৃতি প্রতিদিন তক্তি পূর্বক অধ্যয়ন করাকে স্বাধ্যায় বলে । হলায়ুধ বলেন ষত দিনে পাঁচ ঘায় প্রথম বিধি-ক্রমে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিবে । যাহারা সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন করে নাই তাহারা অধীত বেদাংশ যথাশক্তি পূরণ স্তবাদি পাঠ করিবে ।

যাবন্তির্দ্বিসৈঃ শক্নোতি তাবন্তির্দ্বিনৈঃ কৃৎস্নং বেদং পঠেৎ । অনধীত কৃৎস্ন বেদন্ত বেদ পুরাণ স্তবাদিকং যথা শক্তি পঠেৎ । হলায়ুধ ।

ফল কথা অধ্যয়ন করিতেই হইবে ।

অথস্তন কোথুম্ শাখীর পদ্ধতি কার অনিরুদ্ধভট্ট “একামৃচমেকস্বাষজু-  
রেকস্বা সামাভিব্যহবেদিতি মুনি বচনানুসারে প্রণব ব্যাহতি ও গায়ত্রী  
পাঠানন্তর চতুর্বেদের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় ( কোথুম, কাণ্, ও আখানায়ন  
শাখাদির ) লিখিয়াছেন, বর্তমান সময়ে উহাই সমধিক প্রচলিত । সামগ  
গণের ব্রহ্মযজ্ঞ গোভিল ও কাত্যায়নের প্রথা অনুসারে হইয়া থাকে ।  
কোথুম শাখীগণের গৃহ কৰ্ম মহামুনি গোভিল মতানুসারে হইবে ।  
কাত্যায়ন গোভিলেরই পরিশিষ্ট । সামগণের বৈশ্ব দেবাবসানে বাম  
দেব্য গানরূপী ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে । অর্থাৎ বাম দেব্য সামগান  
করিলে ও ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে, বাম দেব্যগান ছন্দ আর্চিকে ও মহাবাম  
দেব্য সাম উত্তরার্চিকে আছে ।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি কেবল নিজের পবিত্রতার জন্য আর্ধ্য-  
গণ বদ্ধপরিকর ছিলেন না । যেহেতু বেদাভ্যাস করিতে হইবে ইহা মাত্রই  
কর্তব্য নহে, শিষ্যদিগকে অভ্যাস ও করাইতে হইবে । এইজন্য বেদা-  
ভ্যাস পাঁচভাগে বিভক্ত—

“বেদস্বীকরণং পূৰ্বে বিচারোহভ্যাসনং জপঃ ।

তদানন্তৈব শিষ্যোভ্যো বেদাভ্যাসোসাহিপকথায় ॥

প্রথমতঃ বেদস্বীকার, বেদার্থ-বিচার, অভ্যাস, জপ এবং শিষ্যদিগকে তাহা দান করিতে হইবে ।

ব্রহ্মগ্রন্থ বিচার, আলোচনা ও পাঠ্যভ্যাস দ্বারা চিত্তে ভক্তি ভাব হয়, আচার্যের উপদেশে ঐ ভক্তি পথে বিচরণ করিয়া জ্ঞানরহস্য বিভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ বেদান্ত হইতে আর সাধুগ্রন্থ এই পৃথিবীতেই নাই। সাধু ও সংগ্রন্থ পাঠে অশেষ প্রেরণসাধন হইবে তাহাতে কাহার ও আপত্তি নাই। এইজন্য মহা মুনি কাত্যায়ন ব্রহ্মযজ্ঞের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন—

“নব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোত্তি যজ্ঞে ।

নতৎপ্রদানাত্ পরমন্তিদানম্

সৰ্কে তদন্তাত্ ক্রতবঃ সদান ।

নাস্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্যদ্বিকস্য ॥”

## মনুসংহিতা ।

“ ( পূৰ্বে প্রকাশিতের পর )

তৎপর, এখন আমরা দেখিব যে, মহাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে, যে পাপের জন্ত যে দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন, শূত্রাদি জাতিদিগেরও সেই পাপের জন্য সেই একই রূপ দণ্ডবিধান না করিয়া অনারূপ অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন ? বাহ্য পাপ তাহা সকলের পক্ষে অনিষ্ট-দায়ক হইবে না কি সে ?

এই প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইলে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধে কিরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহা বিচার করা আবশ্যিক। যদিও এসম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আরও বিষয়টি বিশদ ও প্রামাণ্য করিবার জন্ত এখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলেন,—



চাতুৰ্ণ্যং যয়া স্বৰ্গং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

এখন ভগবান মহাদেব গুণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

“সত্বঃরজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যা দাত্মনো গুণান্ ।”

মহাসংহিতা ।

গীতাতেও যয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন,—

“সত্বঃরজস্তমস্ইতিগুণান্ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবন্ধান্তি মহাবাহো দেহি দেহিনমব্যয়ম্ ।

গীতা ।

সুতরাং, ইহাতে বুঝা যাউতেছে, যে সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বিভাগ ক্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্বষ্ট হইয়াছে । সত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, রজগুণ হইতে ক্ষত্রিয়, রজ ও তমের বিমিশ্রণে বৈশ্য এবং তমগুণ হইতে শূদ্রের উদ্ভব ইহাই শাস্ত্রের মত । এখন শাস্ত্র এই তিন গুণের কিরূপ লক্ষণ করিলেন দেখুন,—

সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসৌ লোভএব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ গীতা ।

তৎপর কথিত গুণত্রয় যুক্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

“প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যোভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

মুক্তসঙ্কোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমন্বিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যা নির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

অভিসম্প্রায় তু কলং দত্তার্থমপিটৈব যৎ ।

ইন্দ্ৰিয়তে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥

পৃথক্তে নতু যজ্ঞজ্ঞানং নানাতাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃৎতিকোহলমঃ ।  
বিবাদী দীর্ঘস্থত্রীচ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

গীতা ।

অতএব, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি শূদ্রের  
বৈরাগ্য লক্ষণ করিলেন, তাহাতে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত যে শূদ্রাদি জাতি,  
তাহাদের স্বভাব কোন পাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহারাই  
পাপের মূর্তি । এখন এই চারি জাতির কার্য বিচার করিয়া ভাগবতে এই-  
রূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজ্জবং ।

জ্ঞানং দয়্যাত্যাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং ॥

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্তু্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্রমা ।

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং ।

দেবশুর্কচ্যুতে ভক্তির্মিত্রবর্গপরিপোষণং ।

আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্বলক্ষণং ॥

শূদ্রশ্চ সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিত্বমায়রা ।

অমন্ত্রযজ্ঞোহুস্তেয়ং সত্যংগো বিপ্র লক্ষণং ॥

ঐমভাগবৎ ।

গীতাতেও ভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেবচ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতি দাঁক্ষং যুদ্ধে চ অপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্ষত্রকর্ম স্বভাবজম্ ॥

কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্বকর্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাশ্বকং কর্ম শূদ্রশ্চাদি স্বভাবজম্ ॥

নমুও এই কথাই বলেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং বাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকম্পয়ৎ ॥

প্রজানাম্ রক্ষণং দানমিজ্য্যাধ্যয়নমেবচ ।

বিষয়েষু প্রসক্তিস্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্য্যাধ্যয়নমেবচ ।

বর্ণিকপথং কুশীদং চ বৈশ্বস্য কৃষিমেবচ ।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুকৰ্ম সমাদিশন্ ।

এতেষামেবচ বর্ণানাং শুশ্রূষাননুস্ময়সা ।

সুতরাং শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির বাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহা আমরা পরিষ্কার রূপেই বুঝিলাম । এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে সমস্ত বিধি নিষেধ ও শাসনাদি করিয়াছেন তাহা কথিত “চারি লক্ষণাক্রান্ত” জাতির উপরই করিয়াছেন, অর্থাৎ বাঁহারা ঐরূপ গুণযুক্ত তাঁহাদের উপরই মাত্র শাস্ত্রকর্তাদের আদিষ্ট বিধি নিষেধাদি বর্তিবে । বাঁহারা এই চারি লক্ষণের বহির্ভূত ও সমাজ বহির্ভূত তাঁহাদের উপর কোন আদেশ বিধি নাই ।

এখন, মনে করুন শূত্রদিগকে শাস্ত্রে যেরূপ লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির অনন্তর্যের ভীষণ পাপও অতি লঘু পাপ বলিয়া গণ্য হইত । প্রকৃত পক্ষেই পুরাকালে শূত্রদের মধ্যে সুরাদি নিত্য পানীয় মধ্যে ছিল । ব্যভিচার, সুরাপান, কদাচার, কুৎসিত আহার, প্রভৃতি অন্ত্যস্ত জাতির অকর্তব্য বাহা, তাহা উহাদের নিত্য কর্তব্য মধ্যেই ছিল । বর্তমান সময়েও ঐরূপ এক জেলীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । এখন মনে করুন বাঁহারা নিত্য সুরাপানী, তাহাদের উপর হঠাৎ একবারেই যদি আইন করা যায়, যে, তাহারা ঐরূপ দোষ করিলেই একবারে প্রাণবধ করা হইবে, আর সেই আইন যদি কঠিনভাবে পরিচালন করা যায়, তাহা হইলে, এই অসংখ্য শূত্রবংশের করজন জীবিত থাকিত ? প্রায় সমস্ত শূত্র জাতিকেই আইনের ভীত শাসনে মানব গীলা লঙ্ঘন করিতে হইত । কিন্তু ব্রাহ্মণের বাহা লক্ষণ করিলেন তাহাতে তাহাদের পক্ষে ওরূপ দোষ হওয়াই

একরূপ অসম্ভব; সুতরাং নিরমণ কিছু কঠোর করিলেন। কারণ, যে সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চসোপানে দণ্ডারমান হইয়াছে, সে যদি হঠাৎ ঐক্লপ কোন দোষাগ্রিত হয়, তাহা হইলে একবারেই তাহার অধঃপতন হইবারই সম্ভব। কিন্তু শূদ্রের ও সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। কেননা পাপই উহাদের কার্য। সুতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের শাস্ত্র বাহা কিছু বিধি নিবেদন করিয়াছেন সে সমস্তই অধ্যাত্মের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া, বর্তমান সময়ের ন্যায় সাংসারিক ভাবে তাঁহারা কোন শাসনাদি করিয়া যান নাই। সুতরাং বাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম কেবল তাঁহারাই ঋষিদের দোষারোপ করিবেন। কিন্তু অন্তসারবান অধ্যাত্মদর্শীগণ তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋষিদের চরণে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যে শূদ্র মাত্রেই যে ঘোর ভাসিনিক ছিলেন তাহা নহে। শূদ্র মধ্যেও সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। কি ব্রাহ্মণ, কি কত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণের মধ্যেই ঐ তিন শ্রেণীরই লোক আছে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে আবার দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলেন যে ঐ তিন গুণের ক্রিয়া অনুসারে মনুষ্য প্রতিক্রমে কখন ব্রাহ্মণ, কখন কত্রিয়, কখন বৈশ্য ও কখন শূদ্র হইয়া পড়েন। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের মহিমা বাঁহারা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যও অতি সহজ বোদ্ধ ও সুগম হয়। আমাদের ক্রমাগত সত্ব, রজ ও তমের কার্য ও গুণাগুণ অতি বিস্তার মতে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

## দিনকৃত্য ।

( প্রাতঃস্থান )

আমাদিগের চিন্তাশীল শাস্ত্রকারগণের যেরূপ চতুরত্ব দৃষ্টি ছিল, সেরূপ পৃথিবীতে অদ্যাগি অতঃ কোন আতির হয় নাই। তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় শাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদিগের দৃষ্টি কখন এক পক্ষপাতিনী ছিল না। তাঁহারা এই সংসারকে নর্থর ও পরলোককে সার জানিয়াও কখন ইহ জীবনকে ভুলিয়া ছিলেন না। মহর্ষিগণ সুজিয়ার্ণবের অনুসন্ধিৎসু হইয়াও কৰ্মকাণ্ডকে পদদলিত করিয়াছিলেন না। আর্য আচার্য্যগণের ধর্মলিপ্সা বলবতী থাকিলেও অর্থ ও কাম একবারে বিসর্জিত হইয়া ছিল না। মনসি মুনিগণ পরকালের প্রতি লক্ষ্য ত্রুট হইয়া পণ্ডিত কেবল ঐহিক সুখে আগন্ত এবং “আত্মানাম্ সত্যং গোপা-  
রীত” ইত্যাদি শ্রুতির প্রতি শ্রুতিপাত না করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া মাত্র কেবল বৈরাগ্য লইয়া ব্যস্ত ছিলেন না। খাপদ ও শাস্ত্র মুগ্ধকুলের ন্যায় অবিরোধে তদীয় চিন্তাক্ষেত্রে ভোগ বাসনা ও যোগ পিপাসা বাস করিত। পূর্বপুরুষগণ দূরদর্শী ও সামঞ্জস্য পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা কমতাশালী হইয়াও কমাবানু, নিম্প্রহ হইয়াও কাম্যকর্ম-পরায়ণ এবং ধর্মপ্রাণ হইয়াও সংসারী ছিলেন। মহর্ষিগণ অবস্থা বা অধিকারী ভেদে যে উভয় লোকের অবিরোধী অক্ষুণ্ণ সুখোপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের দিনকৃত্য বিধি পর্য্য-  
লোচনা করিলে অনায়াসে অবগত হইবে। আমরা সেই সব বিধি ও নির্বোধের অর্থগ্রহে ও অল্পটানে অপারগ হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের দুখ দর্শনে ক্রমে যে বঞ্চিত হইতেছি, ইহা একবার যত্নেও ভাবি না।

মহর্ষিগণ একান্ত নিয়ম ও সময় পরতন্ত্র ছিলেন, জয়কমেও বদৃচ্ছাচারে সময় বাপন করিতেন না। যত্নপ সময়ের বিভাগ করিয়া আশ্রম সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তত্নপ ক্ষুদ্র দৈনিক জীবিত কালের বিভাগ ক্রমে কার্য্য বিধি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই দিনকৃত্য আমাদিগের আলোচ্য। তন্মধ্যে অদ্য প্রাতঃস্থান সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। দিন শেষের অর্থ, সাবন বাসর বা সূর্য্যের উদয়াবধি অপর উত্তর পর্য্যন্ত সপ্তপ্রহরাস্থক কাল।

মহর্ষি দক্ষ চতুঃ প্রহরাস্তক দিনকে আট ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্যবিধান করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম যুহর্ত ও প্রদোষ কালকে রাজির বহির্ভাব করিয়া শ্রাদ্ধকার্য পৃথক্ প্রকারে তাহারও রাজির কৃত্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন । যথা দক্ষ—

“প্রাতরুখ্যায় কৰ্তব্যং যদ্বিজেন দিনে দিনে ।

তৎ সৰ্বং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানাং হিত কারকম্ ॥

দিবস্তাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্তোপদিশ্যতে ॥

দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থ্যে পঞ্চমে তথা ।

ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥

আর্য্যগণ আনিতেন,

“রাত্রিঃ স্থপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ প্রাণিনামহঃ ।”

মহুসংহিতা । )

নিজা বা বিরাষের অন্যই রজনী এবং কর্ণভূমিতে অবতীর্ণ মানবকুলের কর্ণকালই দিবা । সুতরাং রাত্রির প্রথম প্রহরার্ধ ও শেষ প্রহরার্ধকে দিনের মধ্যে নিবেশ করিয়া প্রহর ত্রয়াস্তক রাত্রির ‘ত্রিযামা’ নাম সম্বয় করিয়াছেন ।

“ত্রিযামাং রজনীং প্রাহ স্ত্যক্তাদ্যন্ত চতুর্কয়ম্ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।

প্রহর চতুঃপ্রহরাস্তক রজনীর শেষ প্রহরে চিন্তাশক্তির বেরুপ বিকাশ হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের অগোচর নাই । মনস্বী মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন ।—

“পশ্চিমাঙ্গ যামিনী যামাং প্রসাদ মিব চেতনা ।”

ইহার অব—নিশার শেষ প্রহর হইতে বুদ্ধি প্রসাদকে পায় ।

কর্ণনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল আর্য্য আচার্য্যগণ সেই সুসময়কে হাড়িবেন কেন ? তাহার সেই শেষ প্রহরের শেষার্ধকে ব্রাহ্ম ও রোত্র যুহর্ত নামে অভিহিত করিয়া তাহাতে ঋগ্বেদ, হইয়ঃ নিত্য বিভাবিকায়র ভাবি দিনের কল্যাণ কামনার সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রসারকারী ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এবং

বিবিধ শক্তির অধিষ্ঠিত, ভগবতীর ও মানব জীবনের অধিনেতৃ গ্রহগণের  
মাধ্যম্য চিন্তা ও তদীর নিকটে প্রার্থনা করিবার এবং শুকদেবের অরণ ও  
প্রণামের ও অলৌকিক চরিত মহাজনগণের নামোচ্চারণের ব্যবস্থা বন্ধন  
করিয়া গিয়াছেন \* । ক্রমে সেই সব বিষয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে ।

“রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্ম্য উচ্যতে ।”

পিতামহ ।

“ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যত অরেন্দেববরান্বীন্ ।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুৱান্তকারী,

ভানুঃ শশী ভূমি সূতো বুধশ্চ ।

শুক্লশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু,

কুর্কন্ত সর্বৈ মম সুপ্রভাতম্ ॥”

বামন পুরাণ ।

উক্ত বামন পুরাণীর বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে  
জাগ্রত চট্টরা দেবাদিদেব ব্রহ্মাদি ও ঋষিপ্রবরবর্গকে অরণ ও দেবতাগণের  
নিকট মঙ্গল কামনা করিতে হইবেক । এই অরণ শব্দের অর্থ—চিন্তা বা  
ভাঁতাতে মনের একাগ্রীকরণ,—নাম কীৰ্ত্তন নহে ।

“চিন্তা, ধ্যানম্, মনসঃ তদেকাগ্রীকরণম্ ।”

বিষ্ণুনাথ ।

\* প্রগাঢ় নিদ্রার সময় মানবীর প্রকৃতি সমূহ বাহ্য বিষয় হইতে আকৃষ্ট ও  
সংকৃত হইয়া অল্পপাবন্য অবস্থিত করে । তৎপরে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঐ সমস্ত প্রকৃতি  
সমূহ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য পথে সম্মতসারিত হইয়া ছুটিতে থাকে । তখন  
বুদ্ধিও মনের অবস্থা যেসকল থাকিবে সেইরূপ ভাবেই প্রকৃতি সকল কার্য করিতে  
আরম্ভ করিবে । মনে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে হৃদয়বর্গ সাত্ত্বিক ভাবেই কার্য  
করিবে, কিংবা রজ বা তম ভাবের আধিক্য থাকিলে তদ্রূপই ক্রিয়া করিবে । সুতরাং  
সর্বথা বাহনীর যে সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভিগনের জন্ত সাত্ত্বিকভাব পরিমুরক ক্রিয়া সকল  
করাই বিধেয় ; সেইজন্তই সর্বদর্শী শাস্ত্র কারগণ উল্লিখীতরূপ নানাবিধ উপায় উপদেশ  
করিয়া গিয়াছেন । বেসং

আবার অমেকেই উক্ত দেবগণের নাম কীর্তন মাত্র করিয়া শাস্ত্রীয় শাসনের সার্বকা বোধ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অরণ বলুন, বা গান বলুন, সর্বত্র মানসিক ব্যাপারের আবশ্যিকতা। স্ব ও ধৈ ধাতু হইতে অরণ ও ধান পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের অর্থ—চিন্তা। তবে স্থান বিশেষে নাম কীর্তনের প্রয়োজনও আছে।

আর্য্যগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সংসার পাপ ও হুঃখে পরিপূর্ণ। যাহাতে উক্ত উভয়বিধ শক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহিরয়ে সর্বদা যত্ববান থাকি উচিত। এই জন্য কর্মক্ষেত্রে পদ প্রক্ষেপ করিবার পূর্বে উক্ত দেবতাগণের ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ সংসার যম কালের কুশল কামনার প্রার্থনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবানের মাগন্থা একাধিচ্ছিত্তে চিন্তা করিয়া শুভ প্রার্থনা করিলে উপস্থিত দিন অবশ্যই সুখে অতিবাহিত হইবার সম্ভব ; বিশেষতঃ যনৌমধ্যে সেই আধ্যাত্মিক ভাব আবির্ভাব হইলে কখনও পাপ-পথে প্রবৃত্তি বাটবে না। এক সময়ে রাবণ বলিয়াছিলেন—

“ কৰ্ত্তু শ্চেতসি পুণ্ডরীক নয়নং

দূৰ্ব্বাদল শ্রামলং, ভুচ্ছং

ব্রহ্মপদং ভবেৎ পরবধু সঙ্গং

প্রসঙ্গঃ কুতঃ ॥ ”

যখন বিখ্যাত বানু মহুবা ভগবানের ভাবনা করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল ; তখন তাহার উৎসাহ ও ধর্ম্মসহকারে কর্ম সম্পাদন করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক উপকার লাভে সুবিধা না হইয়া পারে না।

এইকণ এই ভিজ্ঞান্য হইতে পারে যে, শয্যোধ্যান কালে লোকে বিশেষ করিয়া হুর্গা অরণ কেন করে? তাহার উত্তরে আমরা বলি, হুঃখ দূর করিবার অস্ত্রই আদ্যাশক্তির মর্ন্তো আবির্ভাব। তদন্ত তাহার নাম হুর্গা (হুঃ—হুঃখাৎ গা—গম্যতি—উদ্ধরতি বা, গমেতঃ)। কেবল হুর্গা ছর বা দৈত্যকুল ধ্বংসের দ্বারা ঐহিক হুঃখ দূর করিয়াছিলেন, এই উক্তই তিনি হুর্গা ; অস্ত্র কিছু করিতে পারেন না, এমন নহে, তবে আদ্যাশক্তির হুর্গা বৃষ্টি ধ্যানের ঐ টুকুই বিশেষত্ব। যেরূপ হুঃখ হউক, তাহা দূর করিবার অস্ত্র আপৎ সমুল সংসারে কর্মারম্ভের প্রথমে লোকের পক্ষে হুঃখ হারিনি



জগদ্বাতার স্মরণ করা কর্তব্য। এই নিমিত্তই মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

“ তুর্গে স্মৃতাহরসি ভীতি অশেষ জন্তোঃ । ”

তৎপর সমুদয় জীবনের মঙ্গলা মঙ্গল, সময়ে গ্রহগণের উপর নির্ভর করে, এই জন্তই অগ্রে শুভ কামনায় তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। যে কারণে সূর্য্যাদি গ্রহদেবতাগণের মানব জগতে আধিপত্য আছে ; তাহা আমরা অবসরে বলিব। এই প্রস্তাবে বলিতে গেলে বৈসাদৃশ্য হইয়া পড়ে।

মানব জীবনে সমুদায় শুভের বীজ বপন যিনি করিয়াছেন, ও বাহার উপদেশ সর্বদা মনে রাখিয়া সংসারে চলিতে হইবেক, প্রভাতে সেই গুরু ও উপদেশ দান কালীন তদীয় প্রসন্ন বদনকে ( স্মৃতরাং উপদেশ ) নাম কীর্তন পূর্বক স্মরণ ও প্রণাম করিবে।

“ প্রাতঃ শিরসি শুক্লাঞ্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ।

প্রসন্ন বদনং শাস্ত্রং স্মরেত্তনাম পূর্বকম্ ॥ ”

তৎপর পাঠ করিয়া প্রণাম করিবেক।

“ নমোস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকম্ ॥ ”

তাহার পর আত্মাকে ব্রহ্মরূপী ভাবিবেক।

“ অহং দেবোনচাত্মোহস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্ত রূপোহস্মি নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্ ॥ ”

সুখম্ ।

মমুদয় কেবল আপনাকে নিত্য মুক্ত স্বভাব ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভাবিয়া চরিতার্থ হইবে, তাহা নহে। কিন্তু সে জ্ঞানময় বিষ্ণুরূপী ( বিশ্বব্যাপক ) জগদীশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তদীয় প্রীতি সম্পাদনার্থ ধর্ম্মভাবে সমুদায় সংসারের কার্য্য নির্বাহ করিবে এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া কর্তব্য কর্তব্যামুঠাসে পরাধীন হইয়া হৃদয় স্থিঃ কুবীকেশ ( ইন্দ্রিয়াধিদেব ) কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদায় করিতেছে, এইরূপ আত্মদোষ কালন পূর্বক আধ্যাত্মিক ভাবে সংসার বাত্মার পাদস্তম্ভ করিবে।

বধা স্মরণ—

“লোকেশ চৈতন্ত্য ময়াধি দেব,

শ্রীকান্ত বিবেক ভবদাজ্ঞয়েব ।

প্রাতঃ স্মরামি তব প্রিয়ার্থং,

সংসার যাত্রা মনুবর্তয়িষ্যে ॥”

“জ্ঞানান্নি ধর্ম্যং নচমে প্রবৃত্তিজ্ঞানায়

ধর্ম্যং নচমে নিবৃত্তিঃ ।

ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন,

যথানিয়ুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥”

পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় শাসন পুঞ্জের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, আৰ্য্য সম্ভানগণের সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী শেষ প্রহরার্ক জাগিয়া দেবভাগণ ও নর চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ নলাদি মহাজনগণের মহিমা হৃদয় মধ্যে অবধারণ করিতে হইবে, এবং গুরুদেব ও তদীয় উপদেশ মনে কবিত্ব ভগবানের প্রতি আত্ম সমর্পণ পূর্বক আধ্যাত্মিক ভাবে ও অনাসক্ত হৃদয়ে সাংসারিক কার্য্য আরম্ভের জন্য পদ প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এতদ্বারা ইহাই লাভ হইল যে মনুষ্য প্রত্যহ এইরূপে ধর্ম ও ধর্মাবিরুদ্ধ অর্থ ও উভয়বিরোধী কাম উপার্জন করিয়া ইহলোকে বিমল সুখ ও পরলোকে অনুলগতি লাভ করিতে পারিবে। আৰ্য্যগণের এই অভিপ্রায় পরে পরিস্কৃতি ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ—

“প্রযুক্ত শ্চিন্ত্যৈকধর্ম মর্থঞ্চাস্তা বিরোধিনম্ ।

অপীড়য়া তয়োঃকাম মুভয়োৱপি চিন্তয়েৎ ॥”

জাগিয়া ধর্মার্জনের উপায় ও ধর্ম সম্বন্ধিত অর্থোপার্জনের পথ চিন্তা করিবে এবং ধর্মনষ্ট ও অর্থ অপব্যয় বাহাতে না হয়, এইরূপ কাম বা বিবরণ স্মরণ ও অনুসরণ করিবে।

মহর্ষিগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক ভাবে ও অনাসক্ত হৃদয়ে যে অর্থ ও কাম উপার্জন করে, সেই সুখ বসনাদির প্রকৃত অধিকারী। বিবরণ কীট ও দ্বারের ভৃত্য আমরা তাহা বুঝিতে পারি

মাঃ সেই জন্যই এত কষ্ট। একবার আর্ষা শাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—

“ন জাতু কামঃ কামানা সুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষাক্ষমঃ যজ্ঞে ব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে ॥”

মহাসংহিতা।

ভারতবর্ষরাজ দিলীপ প্রভৃতি ও অনাসক্ত হৃদয়ে সুপভোগ করিতেন।

“অসন্তোঃ সুখমমুভূৎ।”

রঘুবংশ।

এইরূপে মনুষ্য জাতি হইয়া দৈনিক কর্তব্যাবধারণ করিয়া সর্ব সহায়্য ধরিয়া মাতার কোড়দেশে “প্রিয়দত্তারৈ হুবে নমঃ” ইহা বলিয়া দক্ষিণ চরণ ন্যাস পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইবে। কার্যারম্ভের প্রথমেই এই আধ্যাত্মিক ভাষের পরিচয়!

নল প্রভৃতি রাজর্ষিগণের নাম কীর্তনেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহা পরে বল্য বাইবে!

ক্রমশঃ



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

১০ম খণ্ড।

## পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

### প্রচার কার্য।

আমাদের স্মরণ হয় যেন ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরমহংস-দেব তাঁহার প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কেশব বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার প্রকৃতির এই একটি আশ্চর্য্য ভাব ছিল, যে, তিনি কোন ব্যক্তির সাধুতার পরিচয় পাইলে বিনা আহ্বানে উপলব্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া আসিতেন। লোক মুখে কেশব বাবুর নানারূপ গুণ শ্রবণের কথা শুনিয়া তিনি একদিন অকস্মাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি কেশব বাবুর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেশব বাবুর মত একজন "নবধর্মপ্রবর্তক" ও তাঁহার সরল অথচ গভীরভাবপূর্ণ উপদেশে মুগ্ধ হইয়া যান। এবং পরে কেশব বাবুই তাঁহার প্রচার কার্যের প্রধান সহায়ক হন এবং তাঁহার কার্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত করিয়া দেন।

তিনি নানাস্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক আহত হইয়া গমন করিতে  
 লাগিলেন এবং অপারম সাধারণ লোকদিগকে ভক্তিপূর্ণ উপদেশাদি  
 দিয়া মোহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত সম-  
 ভাবেই মিশিতেন। ব্রাহ্ম তাঁহাকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবিয়া সাদরে  
 মন্তক অবনত করিত, বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি জ্ঞানে, প্রগাঢ়  
 শ্রদ্ধা করিত, শাক্ত তাঁহাকে একমাত্র শক্তিরই উপাসক বোধ করিয়া  
 বিশেষ সম্মান করিত, বৈদান্তিক তাঁহাকে একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাধক  
 জ্ঞান করিয়া তাঁহার অশেষ গুণানুকীৰ্ত্তন করিতেন। এইরূপ তাঁহাকে  
 প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক নিম্ন দলভুক্ত ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।  
 স্মৃতরাং প্রকৃত সিদ্ধভাক্তর যাহা কিছু লক্ষণ তাহা তাঁহাতেই দেখা  
 যাইত। তিনি কখন কোন সম্প্রদায় অথবা মতকে স্থগা বোধ করিতেন  
 না। তিনি সর্বদাই বলিতেন, যেমন একোয়া, ওয়াটার, পানি, জল,  
 প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বলিলেও, যেমন এক জলকেই বুঝায়, তেমনি,  
 গড়, ঈশ্বর, আল্লা প্রভৃতি নামে ডাকিলেও সেই একই ঈশ্বাকেই  
 ডাকা হয়। কিন্তু যেমন, জল পান না করিয়া কেবল মুখে ওয়াটার  
 প্রভৃতি নানা নামে ডাকিলেও তৃষ্ণা দূর হয় না, সেইরূপ অন্তর বাহিরে  
 ঈশ্বর দর্শন পূর্বক অনুবাগের সহিত না ডাকিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর  
 করিলে কোন ফলই দর্শে না। পরমহংসদেবের উপদেশে অতি গুপ্তর  
 সাধুর্ঘ্য ছিল। তিনি অতি গভীর বিশ্বাস সকল, যাহা নানা দর্শন বিজ্ঞান  
 দ্বারা বুঝান স্মকঠিন হইয়া উঠে, তাহা সামান্যতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সরল  
 করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। শত শত লোকের মধ্যে বসিয়া তিনি ছই  
 একটি এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যাহাতে সমবেত সমস্ত লোক-  
 রই জিজ্ঞাস্য সন্দেহ সকল মিটিয়া যাইত। অতি কঠোর নাস্তিকেরাও  
 তাঁহার সহবাসে আত্মজ্ঞানলাভ করিত। দলে দলে লোক আসিয়া  
 তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল।  
 অতি পাবণ কদাচারী কদাহারী নাস্তিকদল আসিয়া ক্রমেই তাঁহার  
 শরণাগত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দেখিলে বড়ই যত্ন করি-  
 তেন এবং আশ্বাস বাক্যে পরিভূষ্ট করিতেন। তন্মধ্যে এমন কএক-  
 জনকে আমরা জানি, যে, তাঁহাদের সংসারে অকার্য্য কিছুই ছিল না,  
 পণ্ডরও বাণী অকর্তব্য মনে হয় তাহাও তাঁহাদের দ্বারা অবলীলা ক্রমে

নাশিত হইত; এরূপ ভরসার পাবওদল ও তাঁহার আশ্রয় পাওয়া সম্ভূত পরিবর্তন লাভ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের চিন্তা ঠাঠা ভাষা। ওদ্বন্দ্ব্যে কেহ কেহ আবার ইহা জীবনের মত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একবারে কঠোর গম্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বোধ হয় বাঙ্গালী মায়েই জানেন এবং তাঁহার পূর্ব চরিত্রের বিষয় ও অনেকে অবগত আছেন। তিনি সংসারে পাপ বলিয়া একটা কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এখন সেই গিরিশ বাবুকে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেবল মাত্র পরমহংস-ধেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই সুখে তাঁহার অতীতপূর্ব পরিবর্তনের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিম্বত হইয়াছি। তিনি বলেন, যে, পরমহংসের সহিত আমার এক একদিনের মিলন আমার জন্মে এক একটি করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। গিরিশ বাবুকে সাধারণে জানেন বলিয়াই তাহার নাম উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এরূপ যে কত পাপী উদ্ধার পাউয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সেই জন্যই আমরা বলি কেবল মানুষের ক্ষমতায় কি এত সম্ভবে ?

১২৯১ সালের আষাঢ় মাস মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তর বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। শতাব্দির পর শতাব্দি হইতে ভারতবর্ষ বিঘর্ষী স্নেহ ও যবনের ঘোর অভ্যাসে ধ্বংসী মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতবাসী সেচ্ছাচাষের দাস হইয়া নাস্তিকতার শ্রোতে ভাসিয়া যাইতে ছিল। এমনই দিন দিন কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল, যে, তাহা দেখিয়া আবার ভারতে পুনরায় সুখভাত হইবে তাহা কেহ প্রব্রো ও আশা করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে যেন ভারতের উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়িল,— বিধি এক সময়ে নানাপ্রকার প্রাসংগিকভবটন্য লইয়া ভারতের অন্নকূলে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব হইতেই কএকজন বিদেশী বিঘর্ষী আর্ধ্যধর্মের গুণগানে উত্তম হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশে দেশে আর্ধ্যধর্মের অন্ন ঘোষণা করিয়া ভারতবাসীদের প্রোৎসাহিত করিতে ছিলেন। এদিকে ভক্তপ্রবর পরমহংসদেব সম্পূর্ণ গুণভাবে থাকিয়াও ভক্তাদিত্য বল্লির স্তায় ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া স্থান বিশেষে ধর্মের বীজ বপন করিতেছিলেন। নতুন সম্রাট্য ও শাস্ত্রের প্রকৃত প্রাণ-

পর্বা জ্ঞানিয়ার জন্য উদ্ভূত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় আচার্য্যবর ত্রিভুজ শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যেন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময়, যে ভাবে ও যে অবস্থায় আচার্য্যাদেব ধর্মপ্রচার জন্য বহির্গত হন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার আগমন দৈবঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি তাঁহার কঠোর সাধনালঙ্কার প্রভিত্তা বলে শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। চারিদিকে হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। ধর্ম নাস্তিকেরও চিন্তের অপূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। আবার যেন ভারতে সত্তরই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে হিন্দুধর্মেরই স্বদরে এইরূপ আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সমস্ত হিন্দু এক হইয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সমূহ তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে বসিয়াই এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। আচার্য্যাদেবের আগমনাবধি তিনি সাবধানের সহিত তাঁহার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন।

একদিবস আচার্য্যদেব তাঁহার কলিকাতার আবাস ভবনে বহুতর ধর্মপিপাস্ত্রোচ্ছ্রাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অল্প কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসজ্জমে গাত্রোখান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্ত,—একবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যাদেবের হৃদে চক্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষ লোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। গৃহ নিস্তক, কাহারও বাঙ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানীও ভক্তের অন্তত্ব মিলনে অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের জয় জয়

বাহুজ্ঞান সঞ্চার হঠাৎ লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অল্প সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অক্ষুট স্বরে বলিতে লাগিলেন “মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমার এমন করে দিলে কেন, মা! আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা! আমার ভাল করে দে, মা!” এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহুজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সন্বেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই শশধর! দেখ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমার বলিলেন, যে হাঁরে রামকৃষ্ণ! আখার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করিলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাঁহার কাছে যা, গিয়ে দেখা করে আয়গে। মা বলেন, আর থাকিতে পারিলাম না। অমনি চলে এলাম। অনেকদিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল। এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুকণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর হইজনে নানা ভাব ভজিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাহি আট ঘণ্টিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।

পরমহংসদেব সাধনার স্বাক্ষর অহংভাব নষ্ট করিয়া কত উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এ ঘটনাটি এ স্থানে উল্লেখ করিলাম। তিনি কোন ভক্ত কি প্রেমিকের সন্ধান পাইলেই মহানন্দে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া বাইরা তাঁহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তাহাতে তাঁহার কোনরূপ মন বিকার উপস্থিত হইত না। তিনি বতদিন সুস্থব্রহ্মার ছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া উভয়ে প্রেমানন্দে মাতিয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন। আচার্য্যদেবও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট বাইরা তাঁহার সাক্ষাৎলাভ পূর্বক আপনাকে কৃতজ্ঞ জান করিতেন। তিনি বলিতেন “বর্তমান সময়ে এরূপ উচ্চ অবস্থার ভক্তির সাধক অতি বিরল। সময়ে সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন “লোকটাকে সাধারণে চিনিতে পারিল না, পারিবারও কথা নহে। চিনিতে না পারিয়া লোকে অন্তরূপ ব্যবহারে তাঁহার অনেক কতি করিতেছে।



একদিন পরমহংসের নিকট হইতে কিরিয়া আদিয়া গুড়ীর দীর্ঘ নিম্নায় পরিচয় করিয়া বলিলেন, "পরমহংসের অপূর্ণ অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া বড়ই হৃদয়ে আনন্দ হয়, ভারতে এখনও এরূপ লোক অল্প গ্রহণ করিতেছেন !

## কৈবল্য প্রাপ্তি।

এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে করিতে তিনি ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচারের প্রধান অঙ্গ ভক্তিমার্গ। সঙ্গীত; সুতরাং তাঁহাকে সর্বদা কঠোর বাবহার করিতে হইত। অকস্মাৎ একদিবস তিনি গলদেশে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু তদন্য কোনরূপ কষ্ট প্রকাশ করিলেন না। এরং তাহার অন্য কোনরূপ যত্নও লইলেন না। পূর্বের ন্যায় সমভাবেই মা মা বলিয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতেন ও গান করিতেন। সুতরাং ক্রমেই বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ বেদনার উপশম লাভের জন্য কিঞ্চিৎ সাবধান হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "আমিত সাবধান চ'তে চাই, কিন্তু যখন মা বাহুজ্ঞান নষ্ট ক'রে দেন তখন আর কিছুতেই নিজ কর্তৃত্ব আনিতে পারি না। তবে আমি কি করিব ?" অবশেষে বেদনার স্থানে একটি ফোটক জন্মিল। ফোটকটা কখন শান্ত অবস্থায় থাকিত কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিত। ক্রমেই ফোটকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তৎসঙ্গে আহারও বন্ধ হইয়া গেল। তবল পদার্থ ভিন্ন কিছু গলধঃকরণ হইত না। বাহা কিছু আহার করিতেন তাহা অতি কঠোর সহিতই ভোজন করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত ভয়ঙ্কর পীড়াতেও তিনি একদিনের অন্তও কোন যন্ত্রণা বোধ করেন নাই এবং কণকালের অন্তও মরমাণ হন নাই। পূর্বে যেমন হাসিতেন, আনন্দ করিতেন, এ অবস্থাতেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। সাধকগণের কেমন আশ্চর্য্যরূপ ভিত্তিকা শক্তি

বুড়ি পাইয়া থাকে তাহা সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; ভক্ত আসন্ন  
মৃত্যু দেখিয়া কিরণ অসৌক্যিক ভাবে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন তাহা সকলে  
দেখিয়া অবাক হইলেন এবং যারের যে ছেলে হয় তাহাকে কেহ  
কিছুতেই বিব্রত বা মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না তাহা সকলে দেখিয়া  
দ্বিধা জ্ঞানলাভ করিলেন।

এক্স রোগের বুদ্ধি দেখিয়া শিষ্যেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন  
না। তাঁহাকে কলিকাতার আনিয়া অতি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা-  
ইতে লাগিলেন। বহু যত্নেও তাঁহার বেদনা উপশমের কোন উপায়  
করিতে পারিলেন না। পুনরায় ডাক্তারদিগের পরামর্শে তাঁহাকে কলী  
পুরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বড় বড় ডাক্তার যাইয়া চিকিৎসা করিতে  
থাকেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি এই সময় হাসিয়া বলি-  
তেন, দেখ, আমার দেহটা যেন একটা কাগজের গৃহ, আর এই স্থান-  
টার যেন একটা ভিত্র হইয়াছে। ক্রমে যখন অতি ক্ষীণ ও শুক  
হইয়া অস্থি পঞ্জরের পিঞ্জর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন শিষ্যদিগকে  
আজ্ঞান করিয়া নিজ দেহ দেখাটয়া বলিতেন; দেখেছ ? দেখটা কেবল  
যেন একটা ছাড়ের খাঁচা মাত্র, এতে কিছুটা নাট, হয়ও না কিছু, এক  
মাত্র সচ্চিদানন্দই সত্য। মৃত্যু কাল পর্যন্ত শিষ্যদিগকে এইরূপ নানা  
প্রকার গভীর উপদেশ দিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ক দিবস (৩১শে শ্রাবণ  
তাঁহার একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, পাঁজিখান দেখত। শিষ্য  
পাঁজি লইয়া ৩১শে শ্রাবণের সমুদায় বিবরণ পাঠ করিয়া, যেমনই এলা  
ভাত্র পাঠ করিলেন, অমনই পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন, “হইয়াছে,  
আর না”। তৎপর দিবস চিকিৎসক আসিবামাত্র আগ্রহের সহিত  
জিজ্ঞাসা করিলেন তেঁমরা এতদিন ধরিয়া কি করিতেছ ? রোগ কি  
আবোগ্য হবে না ? চিকিৎসক নিরুত্তর হইয়া বলিয়া রহিলেন। তখন  
তিনি একটু মুহু হাসিয়া একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হস্তে তুড়ি  
দিয়া বলিলেন, ওহে ! এরা এতদিন পরে বলে কি ? ক্রমে এলা ভাত্রের  
কাল রাজি আসিয়া উপস্থিত হইল ! ভক্ত গণেরও উৎকর্ষ বুদ্ধি পাইতে  
লাগিল। তাঁহারা সবদে যে দিবস পারসাম প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন।  
তিনিও প্রাপ্ত পারসাম টুকু সে দিবস সমস্তই ভক্ষণ করিলেন, এক-  
বিন্দুও পরিত্যাগ করিলেন না। পরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। রাজি

সার্ক বিপ্রতের সময় নিয়োখিত হইয়া পার্শ্ব শিবাকে ডাকিয়া নিজ উদর দেখাইয়া বলিলেন, দেখেছ ? ইহাকে খাস বলে। এই বলিয়াই সমাহিত হইলেন। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। ১৮০৮ শক ১লা ভাদ্র তারিখে ভক্তকুণ্ডামণি মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস জড়দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ মারামর সংসার ছাড়িয়া কৈবল্য ধামে গমন করিলেন। নিরন্তর বশেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। নিরন্তর ঋণে কাহারও সাধ্য নাই। ঋষি, প্রজ্ঞাদ, নারদ, শুকদেব, ভৃগু, ভার্গব, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, কপিল, বেদবাস, কশ্যপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাসাধকগণও যে নিরন্তর ঋণেই সমর্থ হন নাই, আজ আমাদের ভক্তনর্শন পরমহংসদেবও সেই নিরন্তর বশে এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মানুষ যেখানে যাইবার জন্ত লালারিত সোহান যদি সে দিব্যচক্ষে অবলোকন করে তাহা হইলে কি আর সে এ যন্ত্রায়ন, পাশপূর্ণ বিপদের আকর সংসারে থাকিতে চায় ? কখনই না। সাধক যে জন্ত এখানে আসিয়া থাকেন তাঁহার সেই কার্যটি সিদ্ধ হইলেই তিনি আর এক মুহূর্ত্তও আমাদে- ন্যার নরকীটদিগের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছুক হয়েন না। পরমহংসের উদ্দেশ্য সাধিত হইল তিনি আর সংসারে থাকিবেন কেন, তজ্জন্যই তিনি সমস্ত মায়ী মমতার বিসর্জন দিয়া আশ্রিত শিষ্যদিগকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া চলিয়া গেলেন—পশ্চাৎ বাহা থাকিল তাহা কখনও নষ্ট হয়ও নাই, হইবেও না।

## ব্রহ্মোপাসনা ।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সমুদ্ভূত ফল নহে, নব্য সভ্যতার ধ্বজা নহে এবং সাগর পার হইতে আনীতও নহে বরং তৎসমুদায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী। অধ্যয়নের পবিত্রাচারে ও উপাসনার অবিদ্যা পাশ ছিন্ন হইয়া বিমল ব্রহ্মজ্যোতি বিকাশিত হইয়াছিল। কত মহন্তর চলিয়া গেল, কুটস্থ ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) অচল ভাবে সর্বত্র বিরাজিত থাকিয়া উপাসনা পদ্ধতি ও জ্ঞানীর যোগযুক্ত নির্মল হৃদয়ে ব্রহ্মলুকম্পায়ই উদ্ভাসিত হইয়া আচার্য্য পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পূর্ণ মহুবা প্রথম স্রষ্ট হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই যে সকলের পুণ্যময় আশ্রম-ভূমি, এখানেই বেদ সকল প্রকাশিত হইয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানও পরিপূর্ণ অর্থ্য ভূমিতেই প্রকাশিত হইয়া শিব্য পরম্পরায় স্রসেবিত হইতেছে।

অতি পুরাকাল হইতেই ত্রিবিধ প্রাণী সৃষ্ট হইতেছে। কতক সত্ত্বগুণপ্রধান দেবভাবাপন্ন, কতক রজোগুণপ্রধান মানবভাবাপন্ন, আর কতক তমোগুণ প্রধান পশুভাবাপন্ন। স্পষ্টরূপে বলিতে হইলে দেব, মানব ও পশু বলিলেই হয়। আবার মানুষের মধ্যেও উক্ত ত্রিবিধ প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কেহ ভূমানন্দে আনন্দিত হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে সাধন সকল পরিপালন করিতেছেন, পরকালের জন্য হৃদয়-শতদল ঈশচরণে সমর্পণ করিতেছেন; সংসারের জালা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। রোগের ভীষণ মূর্তিতে, মৃত্যুর বিকট মুখভঙ্গীতে, তাঁহারা ভীত হন না; প্রত্যুত ঐ সকল তাহাদের নিকট একান্ত নিশ্চিন্ত ও মলিন হইয়া সূদূরে পলায়ন করে। কেহবা সংসারকেই নিত্য পরমার্থ জ্ঞান করিয়া বিষয় সূখে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে পরব্রহ্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ বিন্ধিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার জালার দ্বন্দ্ব হইতে থাকে। প্রায়ই তাহাদের মোহ অপসারিত হয় না। কেহ বা নিদ্রিত। সংসারে দেবতা ও অসুর চির বিরাজিত। কখন দেব দলের প্রাবল্য, কখন বা অসুরদলের প্রাবল্য, পরিণামে অসুরদলই পরাজিত হইয়া অরণ্যমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। অসুরদলের মধ্যে

আবার দ্বিবিধ ভাগে শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। এক ভাগ বাহতে পাশব বল প্রকাশ করিয়া সমস্ত আয়ত্ত ও স্বাভিমত করিতে আশপণ চেষ্টা করে, আর এক ভাগ মুখে বাচালতা করিয়া ছলে কৌশলে অতীষ্ট সাধন করিতে চায়। উভয়েরই শেষ ফল স্বার্থ সাধন, কেহ একাঞ্চে কেহ তলে তলে। এই অসুর ভাবাপন্নগণ ব্রহ্মজ্ঞানের চির বিরোধী। ইহারা পূর্ব মধ্য ও বর্তমান কালে বিরাজিত। উহারা সকলেই সময়ে সময়ে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোপাসনার বিপ্রতিপত্তি ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং নানাবিধ উপধর্মের সৃষ্টি করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অনেকের হৃৎকল মন সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইয়া উঠে। আবার অলক্ষ্য গতি কাল প্রভাবে দেশের অবস্থাও ভিন্ন ভাব ধারণ করে। যখন মহামুদ্রের শিষ্যগণ নানা অসত্বপায়ে ভারতের অধিকাংশ স্থল আয়ত্ত করিয়া সর্বত্র শোষণে তৎপর হইয়া উঠিল, দিল্লীর পবিত্র তোরণ-দ্বার অর্ধচন্দ্র পতাকায় হীন খ্রী ধারণ করিতে লাগিল, তখন ভারত ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। ধর্মগ্রন্থ সকল নষ্ট হইতে লাগিল, আচার্য্যগণ সত্ত্ব শক্তিত ও ব্রহ্ম। তখন অনেক লোক প্রলোভনে স্বার্থ সাধনে বা বিপাকে অনিচ্ছায় পরধর্মে ও পরাচারে আত্ম বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বৃত্তি সকল উচ্ছিন্ন হওয়াতে অর্থার্জন লালস্য তদানীন্তন বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন ও বেশ ভূষার সমাদর করিতে লাগিলেন। কিস্তি পরিমাণে স্বাস্থ্য শিষ্টাচার ও আর্ধ্যগরিমা বিলুপ্ত হইতে বসিল। তখন কতিপয় উপধর্মের সৃষ্টি হইয়া এক এক সম্প্রদায় গঠিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের প্রবলতায় যখন বিজাতীয় রাজার অভ্যাচার ও প্রভুশক্তি একান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তখন নানা কৌশলে খৃষ্ট শিষ্যগণ বর্ণধৃতি ছাড়িয়া ভারতের রাজলক্ষ্মীকে করতল গত করিতে লাগিলেন, ক্রমে ভারত ভারতুর পরিগ্রহ করিতে লাগিল। বর্ণিত সময়ের লোভের অভাব ছিল না, স্বার্থের হ্রাস ছিল না, অনেকেই খৃষ্টমত্রে দীক্ষিত হইলেন। বাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তাহারাও সুশীতল দেশ সমুদ্র আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ণতা সাধনের পূর্বে অনেক ব্রাহ্মণ কর্মোপলক্ষে রঙ্গপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে ভোগ বাগনা একান্ত বলবতী ছিল, রঙ্গপুরের নদিকট তামকাট নামক গ্রামে যবনী ললনার আশ্রিত হইলেন, সমাজে বিকৃত হইয়া পরিভ্রমণ

কালীতেও প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হইতে পারিলেন না । সমাজে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যখন সংস্কেত দোষে পরিভ্যক্ত দলের একাংশে পরিগৃহীত হইলেন এবং একটি উপধর্মের সৃষ্টি করিলেন । পরিণামে তাহাও রূপান্তরিত হইয়া ঐতিহ্যের প্রকার ভেদ মাত্র হইয়া উঠিল । দেশীয়গণ পরমার্থ পরিভ্যাগ করিয়া অর্থায়নে অর্থকরী ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । বালাবধি আজীবন উহারই আলোচনা; কাজেই অনেকে পবিত্র আর্থ্যধর্মে আর্থাচারে ও আর্থ্যশাস্ত্রে অন্ধ হইয়া উপধর্ম ও বিধর্মে, অনাচারে ও বিজাতীয় আচারে মনঃ সংযোগ করিতে লাগিলেন । কর্মনোবে অনেকেই আজ বিস্মৃত হইয়া স্বীয় গৌরব বিসর্জন পূর্বক জাতীয় প্রতিষ্ঠার মস্তকে কুঠারঘাত করিতে লাগিলেন এবং নবীন মস্ত্রে যুক্ত হইলেন । বিদেশীদের হাস্য ও বিক্রম বাক্য তাহাদের কর্মকুহরে পৌঁছইছে না । দেশীয় অমৃতময় ও প্রীতিপ্রদ উপদেশাবলীতে আস্থা না থাকায় দেশের দুর্দশার ইয়ত্তা রহিল না । পদে পদে লাঞ্ছনা, তথাপি সেই বিভ্রমবাহী একমাত্র প্রার্থনীয় । সুতরাং এইরূপ দুর্দশারদিনে “ব্রহ্মোপাসনার” বিবম ধূয়া পরিলক্ষিত হইবে না কেন ?

ব্রহ্মোপাসনা কথাটি যত সরল কাজ তত সুগম নহে । “ব্রহ্ম ব্রহ্ম” ইত্যাকার ধ্বনি করিতে সকলেই সমর্থ, পরোক্ষানুভব ভিন্ন কেবল ব্রহ্ম শব্দে মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে না । ঔষধের নাম গ্রহণে আমর অপসারিত হয় না, সহপান বা অমুপান সহকারে সেবন করিলেই ব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে । সুতরাং পরোক্ষানুভবের উপযুক্ত হওয়া সর্বপ্রথমে সুবিহিত । তদনুকূল উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে । তিনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্বক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রত্যক্ষীকৃত সাধন সকল শিক্ষা দিবেন । সৃষ্টির আরম্ভাবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত বেদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তদ্ব্যক্ত সাধনে উপাসিত, সংরাধিত ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি-সাধন-প্রয়াস একান্ত বালকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এখন দেখা কর্তব্য সনাতন শাস্ত্রে তদুপযোগী সাধন প্রভৃতির বিধি নিবেদন কি রহিয়াছে এবং তাহা কতদূর পরিপালিত হইতে পারে । অন্যথা বাসণের ক্ষয় সঙ্গতি লাভের ন্যায় হাস্যাত্মক হওয়া অথবা বাত-বিকৃতি প্রদর্শনের কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না ।

ব্রহ্ম অভিয্যিস্য । দর্শনে তাঁহার দর্শন হয় না, শ্রবণে শ্রবণ হয় না,

রসনার রসন হয় না, ভুগে স্পর্শ হয় না, নানিকায় আশ্রয় হয় না, এমন কি ব্রহ্ম স্বরূপ মনেও মনন হয় না। কলকথা ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে অস্তি-নাস্তি কোন শব্দই প্রকাশ হয় না। তখন এবস্তৃত অতীন্দ্রিয় নিত্য সত্য পরব্রহ্মজ্ঞানের অন্য আশ্রয়-বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হইবে, আশ্রয়াক্যামূলক যুক্তি তর্কের অমুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ অন্ধকারে বিচরণ করিতে হইবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপক্ষে পাদ বিক্ষেপ করিতে হইবে, নিবৃত্তি তাহার শূন্যে অবস্থিত ও লুকায়িত। সেই আশ্রয়াক্য বেদ বেদান্তাদি। সর্বাভ্যাসকরণে, পুত হৃদয় হইয়া তাহাই পরিপালন করা সাধুজনোচিত কর্তব্য কর্ম।

অনুষ্ঠান কার্যের সৌকর্য্য বিধান জন্য একই বেদ শাখা চতুষ্টয়ে বিভক্ত। সেই শাখোচতুষ্টয় ক্রটি জনদগম্ভীরস্বরে একতানে বলিলেন সৃষ্টির পূর্বে এক পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না\*। তখন ব্রহ্ম নিগুণ নির্লেপ নিরঞ্জন অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয়। তাঁহারই অভিধ্যানে জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইতেছে। জগৎ পরব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত ত্রিপাদ স্বরস্ত্রভ। তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঐ উপাদান বিবর্ত উপাদান, পরিণাম নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সর্পের যে উপাদান তাহা বিবর্ত উপাদান। নির্বিকারের পরিণাম সম্ভবেনা। স্বরূপ নাম্শানন্তর অবস্থান্তর উৎপত্তির নাম পরিণাম। বিবর্ত উপাদানে স্বরূপের নাশ হয় না। যখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান হইল তখন তিনি মারারূপ উপাধিতে উপহিত, স্তূতরাং মায়াময় সত্ত্ব। ব্রহ্ম এক হইয়াও উপাধির বাহুল্যে বহু বলিয়া ব্যপদেশ হইয়া থাকেন। এখন দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বর ত্রিবিধ সত্ত্বার প্রতিভাত হইয়া থাকেন। পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। আবার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি জন্য কোন অবলম্বন করিতে হইবে, নচেৎ স্বরূপাধিপম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটা বিষয়ের সংক্ষেপ

\* "নদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। হালোগ্য ক্রটিঃ।

"আত্মা-বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" বহু ক্রটিঃ।

"তদেতদ্ ব্রহ্ম পূর্ন মন পূর মনস্তরমবাহ মদাম্মা ব্রহ্ম সর্ভানুভূঃ"। বহুঃ।

"ব্রহ্মৈবেদমবৃত্তং পুরতাদ্"। আধর্মণিক ক্রটিঃ।

আলোচনা করা বাইতেছে। যেমন কাল নীরূপ। নীরূপ কালের সম্বন্ধ উপলব্ধি নিমিত্ত স্বর্ষ্যোদয়াদি অবলম্বন ও অপেক্ষা করিতে হইবে, আবার ঘটিকাবল অবলম্বন করিয়া আরও কালের ক্ষুদ্রাংশ বিভাগ হইয়া থাকে। এখন ব্যবহারিক সম্বন্ধ পল, বিপদাদি ক্রমে কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারমার্থিক সম্বন্ধ তাহার কদাপি বিভাগ হয় না, তাহা নীরূপ অথও, কিন্তু আমরা তাহাকে ক্ষুদ্র তম ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। সর্পে রজ্জু ভ্রম হইয়া থাকে, শুক্তিতে রজ্জু ভ্রম হইয়া থাকে। যাবৎ সর্প ও রজ্জুভেদ মিথ্যাত্ব বিনিশ্চিত নাহয় তাবৎ সর্প ও রজ্জুত বলিয়া দৃঢ়প্রভৃতি আছে। অধ্যায়োপে রজ্জু ও শুক্তিতে অন্যরস্তুর আরোপ জ্ঞান হইয়া থাকে। উহা অজ্ঞান, অজ্ঞানের আবরণ শক্তিতে স্বরূপের বিরোধান হয়। স্বরূপকে আবরণ করিয়া অন্তরূপের স্বার্থাভ্যাস, বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি সমন্বিত অজ্ঞান, জ্ঞানের বিরোধী। ঐ অজ্ঞান বস্তুও নয় অবস্তুও নয়, জ্ঞানে উহার বিনাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞান ত্রিগুণময় জ্ঞানের বিরোধী। \* স্রীয মাতেই কোন না কোন রূপে অজ্ঞান অবস্থিতি করে, স্মৃতরাং ইহা একবারেই অবস্তু নহে। আবার জ্ঞানের বিকাশ হইলে ইহার বিনাশ হয়, একান্ত পূর্ণ সত্য পরব্রহ্মের ন্যায় ইহা বস্তুও নহে। অতএব ইহার প্রকৃত স্বরূপ দুর্নির্ণয় বলিয়া, অনির্কচনীয় বলাহইল। অনির্কচনীয় শব্দে বাহার কোনরূপ নির্কচন বা নির্ণয় হয়না তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলাও যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ “আমি যখন অজ্ঞান ছিলাম তখন কিছুই জানিতামনা” ইত্যাদি অমৃতবে জ্ঞানাভাবেও “জানিতাম না জ্ঞানের স্পৃতি হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানের বিরোধীকেই অজ্ঞান বলিয়া কথিত ও ব্যবহৃত হয়। এই অজ্ঞান ত্রিগুণময়, স্মৃতরাং অজ্ঞান অনিত প্রত্যেক পদার্থে সবাদি গুণ ভ্রম লক্ষিত হয়। পরিসৃষ্টমান বিশ্বসংসার ত্রিগুণময়। যেহেলে জ্ঞান সৈধানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না; এই কারণে অজ্ঞান, জ্ঞান বিরোধী। প্রত্যেক পদার্থ অজ্ঞান আছে, অমৃতবে ইহা বুঝা বাইতে পারে। “আমি

\* “অজ্ঞানত্ব সদস্যত্বাননির্কচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোধি ভাবরূপং ব্যক্তিকিঞ্চিতি বদন্তি।” ইত্যাদি বেদান্তসার।



অজ্ঞা\* এতোক ব্যক্তিই এরূপ বলেন ও ব্যবহার করেন। হুতং সকলেই যে অজ্ঞানপ্রভু তাহা প্রতিপাদন করা বাহ্যল। এই অজ্ঞানকে অবিদ্যাও বলে। অবিদ্যা প্রভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া বর্তমান অগতের সত্য প্রতীতি হইয়া থাকে। পরমেশ্বর ত্রিআর কিছুই সত্য নহে, ইচ্ছাশালবৎ অনিত্য, অবস্থ।

“সত্যঃ জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম,, ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। বাহাই সং তাহাকে সত্য বলে। বেক্রপে বাহা নিশ্চিত হয়, কদাপি তৎকালের ব্যভিচার হয় না, তাহাকে সত্য বলে। \* বাহ্যর ব্যভিচার হয় তাহা অন্তত অতএব বিকারময়। সত্য শব্দে ব্রহ্ম নির্বিকার নিরঞ্জনরূপে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম কারণ স্বরূপ। কারণ স্বরূপ হইলে ঘটের কারণ সৃষ্টিকার ন্যায় অচেতন বলিলে সন্দেহ হইতে পারে, অগত স্বরূপের বিকাশ হয় না, এতন্ত তাঁহাকে জ্ঞান বলা যায়। বাহা জ্ঞান তাহাই চিৎ। জ্ঞান ব্রহ্মের রূপ, জ্ঞপ্তি, অববোধ প্রভৃতি জ্ঞানের পর্যায়। আবার বাহা সত্য ও জ্ঞানময় তাহা সীমাবদ্ধ ও ঋণহইতে পারে, ক্রমে সে আশঙ্কাও অপনোদন করিবার অস্ত্র শ্রুতি বলিলেন, ব্রহ্ম অনন্ত। বাহা কোনও রূপে প্রবিভক্ত হয়না তাহাকে অনন্ত বলে †। পরব্রহ্ম অস্বাদ্যের সত রূপে রূপবান্ নহেন, কিন্তু সত্য জ্ঞানানন্ত রূপে রূপী। এই জন্য তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াও পুজিত হইয়া থাকেন।

পারমার্থিক সত্যের সৈশ্বর, নিগুণ অবাস্তবস গোচর। চিত্তের সত্য ও জ্ঞানময়। তাঁহারই শক্তি মায়। পরব্রহ্ম মায়াতে উপহিত হইয়া গুণময়, অতএব পরমেশ্বরের নিগুণ ও সগুণ ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রথম তটস্থ লক্ষণের ‡ অথবা নিগুণ ভাব পরিগ্রহ অন্য সগুণ ভাব আদৌ বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্বরূপ ছাড়িয়া কুরূপে বা অসঙ্গুপে চেষ্টা ন্যস্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন পরম কাকণিক পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করা বাইতেছে।

\* “ব্রহ্মপেণ সন্নিহিতং তৎকপং ন ব্যভিকরতি তৎসত্যং।

ব্রহ্মপেণ নিশ্চিতং ব্রহ্মরূপং ব্যভিকরনমৃতমিভ্যাত্যতে ॥” শব্দর ভাব্য।

† “বন্ধি ন কৃতকিং প্রবিভজ্যতে তদনন্তম্”। শব্দর ভাব্যম্।

‡ “স্বরূপাতিরিক্ত বিশেষণে।

আমরা ধরাধামে অন্তঃকরণ ও চক্ষু কণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্পাদে সম্পন্ন হইয়া জ্ঞান পরিগ্রহ করিয়াছি। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামের পরিচালনা দ্বারা তাহাদের শক্তির অল্পরূপ ব্যবহার কার্য্য করণে আমরা সমর্থ হই, তদতি রিক্ত বিষয় আমাদের স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই। চক্ষু রূপ ভিন্ন নীরূপ গ্রহণ করিতে পারেনা। রসনা মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায় ও অন্ন প্রভৃতি রসভিন্ন আর কিছুই স্বাদগ্রহণ করিতে পারেনা। শ্রবণ দ্বারা ও প্রতিঘাতের ফল ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারেনা। নাসিকা পার্শ্বিক গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় স্পর্শ করিতে পারেনা। ত্বক স্পর্শ জনিত জ্ঞানের সাধন। অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে আপাততঃ দুই ভাগে বিভক্ত। অন্তঃকরণের যে কার্য্যে নিশ্চয়তা আছে তাহাকে বুদ্ধি বৃত্তি বলে, আর যে কার্য্যে বিমর্শ অথবা সঙ্কল্প বিকল্প হয় তাহাকে মন বলে। অন্তঃকরণের এক এক কার্য্যকে কিংবা সময়ে সময়ে অন্তঃকরণে যে এক এক ভাব হয় তাহাকে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বৃত্তি বলে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলের পরিচালক, মন পরিচালন রজ্জ্ব স্বরূপ। যেমন রথে অশ্ব যোজিত হইয়া সারথি কর্তৃক পরিচালিত হয়, সারথি প্রগ্রহ ( লাগাম ) গ্রহণ করিয়া সংযোজিত অশ্বকে বথেচ্ছা পথে বিচালিত করিয়া থাকে। তেমনি দেহী জীব রখিভূল্য, শরীর তাহার রথ, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ, ইন্দ্রিয় পঞ্চক অশ্ব। অশ্বের গমন ভিন্ন প্রগ্রহের কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না, তবে কেবল সারথির করে স্পন্দিত হইতে পারে মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটাকে বিষয় বলে। এই বিষয় পঞ্চক পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। উহা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আর কোনও বিষয়ে সংপৃক্ত হওয়ার সাধ্য নাই। আক্ষালন কর, বাহবাক্ষোটন কর, আর বিজ্ঞানই খাটাও বিষয় ভিন্ন অবিসয়ে ইন্দ্রিয়ের শক্তি অকর্ম্মণ্য হইবেই হইবে।—

ক্রমশঃ

## বাল্য-বিবাহ ।

সদ্যঃ রোপিত আশ্রের কলমে মুকুল হইলে সকলেই তাহা ভাঙিয়া দেয়। অপরিণত নারিকেল বৃক্ষে মোচ পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভাঙিয়া দেয়। কেন দেয়? পাছে বৃক্ষ নিস্তেজ হইয়া ভবিষ্যতে মারা পড়ে; প্রত্যুত বৃক্ষের পরিণত অবস্থায় ফল হইলে ফলও পরিপুষ্ট হয়, অপেক্ষাকৃত বৃক্ষও সতেজ থাকে। চিরকাল পূর্ববৎ মোচ ও মুকুল ভাঙিয়া দিলে বৃক্ষ আরও সতেজ থাকিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে যে অভিপ্রায়ে বৃক্ষ রোপন করে, সে অভিপ্রায় সিক হয় না, বলিয়াই চিরকাল কেহ মুকুলাদি নষ্ট করে না। এই সকল যুক্তি-বলে বা ইত্যাদি ভ্রমদর্শনে সাধারণের ধারণা হইয়াছে—বাল্য-বিবাহ আমাদের সমধিক অনিষ্টকর। এই ধারণা অহিন্দুগণের ও হিন্দুচন্দ্রাচ্ছাদিত সংস্কারক দলের। তাঁহার আরও ২। ১টী দৃষ্টান্তবলে ও পাশ্চাত্য শিক্ষারও সভ্যতার ভাবে বাল্য-বিবাহের নিতান্ত বিরোধী; কিন্তু প্রাচীন আচার-প্রিয় হিন্দুগণ ইহার নিতান্ত পক্ষপাতী। উভয়দলই স্বপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি—এই সঙ্ঘর্ষে সত্যের আবরণ উন্মোচিত হইবে। এসম্বন্ধে ভ্রম আন্দোলনে সমাজের ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না। তবে যদি আমাদের কপালক্রমে ঠাকুর গড়িতে মেকুর হয়, তবে উহা কালের প্রভাব বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

প্রাচীনকালে হিন্দু-সমাজ কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন বলে চালিত হইত, কিন্তু তাহাই বলিয়া যুক্তির বলও কম ছিলনা। তবে পূর্বে শাস্ত্রানুসারিনী যুক্তি ছিল, এক্ষণে যুক্ত্যানুসারী শাস্ত্র হইয়াছে। বাস্তবিক, “যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রে যুক্তির আসন সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বকালের যুক্তি এক জাতীয় ছিল, আধুনিক যুক্তি অন্য জাতীয় হইয়াছে। যদিও যুক্তি মানসিক-স্বভাব-স্থলভ শক্তিসমুত; তথাপি যুক্তিশক্তি শিক্ষার যাজ্জিত হইয়া শিক্ষানুসারিনী হয়। তুমি ইংরেজি দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছ, তোমার যুক্তি এক প্রকারের, আমি আর্য্যদর্শন শাস্ত্র পড়িয়াছি, আমার যুক্তি

অন্য প্রকারের। শিকাই এই ভিন্নমুখী যুক্তির কারণ। আবার তুমি পাশ্চাত্য দর্শন অধিক পড়িয়াছ, আমি অল্প পড়িয়াছি, সুতরাং তোমার আমার যুক্তিতে স্বর্গমর্ত ভেদ থাকিবে, এই কারণে যুক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না—কণে কণে বহুত্ব হয়। তথাপি যুক্তি কাচাও অনুপাদেয় নহে; কেন না ‘যুক্তি দ্বারা কিছুই স্থির হয় না’ যদি এট সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাও যুক্তিবলে করিতে হইবে। তথাপি যুক্তির আলোর বাতীত আমাদের আর অন্তোপায় নাই। তবে এট মাত্র বলি—অর্থা আচার ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত যদি যুক্তিবলে স্থির করিতে হয়, তবে অর্থ্য দর্শন-শাস্ত্রের শিক্ষামার্জিত যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করাই উচিত। সম্প্রদায় বিশেষ সম্বন্ধ, দেশ, কাল, পাত্র, আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও শক্তির অনুসারে যুক্তির আকার গঠিত হওয়া উচিত। আর একটা কথা বলি,—যদি পিতার আশ্রিত বিষয়ে পুত্র যুক্তির অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে যেমন পিতার অপমান করা হয়, সেইরূপ আমরা নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে মহাদি মহাবীর আদিষ্ট বিষয়ে যুক্তির অনুসন্ধান করিয়া পদে পদে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছি। কালের ধর্ম অবশ্য সহনীয়।

আমি বলি, আয়ের মুকুল না ভাঙিয়া বাহ্যপ্রক্রিয়ার দ্বারা তাহার কতিপূরণ করিয়া অল্পকালে ফলভোগ করাইতো ভাল। ফলের জন্যই এত আয়াস ও এত উৎসাহে বৃক্ষরোপন। তোমার ইংরেজি যুক্তি—তুমি বলিবে, “বৃক্ষই ভাল”। কিন্তু হিন্দু সমাজ এরূপ ফলহীন ক্রোটনের পক্ষপাতী নয়, ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষের পক্ষপাতী। তাই তাহাদের শাস্ত্রীয় উপদেশ আছে—

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা পুত্রপিও প্রয়োজনঃ।” হিন্দুগণ ফল চায় বলিয়া বৃক্ষেরও অনাদর করে না—সহকারিতায় যে সুখোদয় হইতে পারে, তাহাও অনুভব করিতে পরাঘ্নু্য নয়। তাই তাহাদের শাস্ত্রে

“অগ্রে কলার্থে নির্মিতে ছায়াগন্ধাহ্যপদ্যতে

এবং ধর্মং চর্য্যমাণমর্থ্য্য অপ্যুৎপদ্যতে

বাহারা ইজিরস্বথকেই পরম পুরুবার্থ জ্ঞান করে—জীর বাহ্য সৌন্দর্যই একমাত্র সুখের নিদান বিবেচনা করে; তাহারা বাচিয়া শুচিয়া বোধগী রূপণী বা বর্ষারণী বিবাহ করুক। আর বাহারা সৎপুত্রপ্রার্থী—পারা-

লৌকিক সদগতি লাভই একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহাদের পিতা প্রভৃতি অভিবাচকগণের প্রতিই কুল, শীল ও সৌন্দর্যাদি বাহার ভার থাকাত উচিত ।

বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে । ভারত জাত শস্যে আমাদের উদর পূর্ণ হইবে না—এ আপত্তি অতীব অকিঞ্চিৎকর । “জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি ।” সুতরাং তোমার আমার সেভাবনার অধিকার নাই । যাহার ভাবনা—সে ভাবিবে ।

আর এক কথা—বাল্যকালে সংপ্রবৃত্তি সকল ক্ষুরিত হয় না ! সুতরাং অক্ষুরিত সংপ্রবৃত্তির অবস্থায় উৎপন্ন সন্তানও তাদৃশ প্রবৃত্তিমান হইয়া থাকে । হিন্দুরা সন্তানান্তর স্বীকার করেন । এক জন্মে সংপ্রবৃত্তি উন্নত জতি অন্নই হয়, হয় না বলিলেও চলে । আমার বয়স ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল । এযাবৎ সংপ্রবৃত্তি মার্জিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তথাপি মার্জিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে । যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকি, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চরিত্র সংশোধন করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকে, তবে এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে কিয়দংশ চরিত্র বা প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইতে পারে । ভগবানের ত্রিমুখের বাণী—

“অনেক জন্ম সংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিং ॥

সুতরাং এক জন্মে ৫ । ৬ বৎসরের অগ্রপশ্চাতে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করা কখনই সম্ভবপর নহে । ইহা ব্যতীত হিন্দুগণ আবার প্রারব্ধবাদী । প্রারব্ধে যেরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা অচলস্থায়ী, হিন্দুর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস । সুতরাং বালিকার গর্ভজাত সন্তান হউক অথবা পৌত্রার গর্ভজাত সন্তান হউক সে যদি দুর্বল অথবা সৎ বল হয় তাহা তাহারই প্রারব্ধ লক্ষ ফল, অতএব ভুমি আমি যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া প্রারব্ধ কি করিয়া নষ্ট করিব । সুতরাং প্রারব্ধবাদী হিন্দুর নিকট এ সব যুক্তি লাগান বৃথা শ্রম ।

আর্য্য মহার্ঘগণ শরীরের প্রতি তাদৃশ আস্থা বান্ধা ছিলেন না ; কেন না শরীরের সহিত একজন্মের সম্বন্ধ । কিন্তু মনের সহিত শত শত জন্মের সম্বন্ধ । সুতরাং তাহারা শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বলে অধিক বলীয়ান হইতে প্রয়াস পাইতেন । আর্য্যদর্শনের দৃষ্টি মনোব্যাপারের প্রতি, পান্ধাত্য দর্শনের দৃষ্টি শারীরিক বা বাহ্য ব্যাপারের প্রতি । তাহাই তাহাদের দর্শন শাস্ত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ক, অধুনিক দর্শন শাস্ত্র বাহ্য বিষয়ক ।

ভাহারা মানসিক অঙ্গের পোষণ এবং কেবল শারীরিক অঙ্গের পোষণ চাহিতেন না—অনিবার্য বলিবর্ধবৎ শারীরিক বলের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই ভাহারা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, ইহাবা বিরোধী। বাল্যবিবাহে যে পরিমাণে শারীরিক বলক্ষয় হয়, প্রৌঢ় বিবাহে তাহার পূরণ মানসিক বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। ক্রুধা হইলেই খাইবার ইচ্ছা হয়। যদি ক্ষুদ্রবৃত্তির বস্তু গৃহে থাকে, তাহা হইলে মন আশস্ত থাকে। যদি গৃহে তাহার অভাব থাকে, তাহা হইলে চৌর্যাদি বৃত্তির সহায়তায় সে অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছাহইতে পারে। অনেক সময়ে কার্য্যতঃ ও তাহাই ঘটে; সুতরাং ঐ সকল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাহার জীবনের অনেক উদ্বেগ সাধিত হয় না। তখন অরচিতা চমৎকারা 'বাণার পেটেভরা' হইয়া উঠে। তবেই দেখুন ক্ষুদ্রবৃত্তির বস্তু গৃহে থাকা প্রার্থনীয় কি না? একবারে দুস্ত্রবৃত্তি যদিয়ার মাতঙ্গারা হইলে সম্ভবতঃ কেহ সে নেশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে একবার কুকার্য্য করে, বারান্তরে অন্ততঃ তাহার সে কার্য্য করিতে তত আশঙ্কা হয় না। অপিচ তখন অপেক্ষাকৃত শারীরিক বলের ক্ষয় অধিক হইবার সম্ভব। তুমি বলিতে পার বালকগণকে নৈতিক বলে বলীয়ান করিতে পারিলে সে অনিষ্টের আশঙ্কা নাহি। আমি বলি তোমার সে সকল প্রভিমন্থন নৈতিক বল, বাক্যে,—কার্য্যে পরিণত হওয়া সুকঠিন। যদি শিক্ষার ক্ষমতা বালকগণকে বনে পাঠাইতে পার; তবে বলি—  
“ত্রিশব্দযোষেহৎ কন্যাং; হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ধিকীঃ,”

ক্রুধা হইলে খাওয়া উচিত, তাই বলিয়া গণ্ডে পিণ্ডে খাওয়া উচিত নয়। বালকের দন্তোদগম হইলেই তাহাকে দুধে দাঁতের উপযুক্ত কিছু কিছু চব্য বস্তু দেওয়া উচিত, তাই বলিয়া ছোলা ভাজা বা নিরত চব্য বস্তু দেওয়া বুদ্ধি সঙ্গত নয়। এরূপ অবধাভোজনে কি বালক কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ—সকলেরই যে অনিষ্ট হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশ্বে বৎসরের জীব সহিত অথবা ব্যবহারে প্রাণহারাণও বা আর পঁচিশ বৎসরে তাদৃশ আচরণের ফলও তাই। এরূপ চরিত্র বৎসর অধিক বাঁচিলে সামাজিক উন্নতি কিছুই সাধিত হয় না। তবে মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারিলে অবধা ব্যবহারে শারীরিক বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে ঘটনেরও অন্তরায় ভূত আমরা হইরাছি।

অপরিশুদ্ধ বয়স্কেরা বাহাদের চরিত্র অম্লকরণ করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে, অথবা তাঁহাদের এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি তাঁহারা স্ত্রীর সহিত পণ্ডবৎ ব্যবহার নাকরেন, তিথি নক্ষত্র (ধর্মশাস্ত্রে বেরূপ নিষিদ্ধ কাল নির্দিষ্ট আছে) বাছিয়া স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হন, তাহা হইলে পরবর্তী অল্প বয়স্কেরাও তাহাই অম্লকরণ করে—

“যদ্ যদাচরতি প্রাজ্ঞস্তদেবেতরে জনাঃ ।

সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদম্বর্ততে ॥”

এই মহাশব্দ্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে আর পদে পদে বিভ্রান্ত হইতে হয় না।

প্রথমতঃ বালকগণের আদর্শ মলিন। দ্বিতীয়তঃ যে বাণেশ বেটা—মানসিক বৃত্তিও তদ্রূপ মলিন, তৃতীয়তঃ শিক্ষা মলিন—এই ত্রিপুরস্করার বালকগণের পরকাল নষ্ট হইতেছে। পণ্ডবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের অ'চরণ পবিত্র কর, সেই সঙ্গে সঙ্গে বালকগণকে ধর্মশাস্ত্রসম্বৃত নৈতিক শিক্ষার পুস্তক অধ্যাপনা করাও, তখন বুঝিবে পারিবে বাল্য বিবাহ শুভ ফলপ্রদ কি অশুভ ফলপ্রদ। রোগ নির্মল হইয়াছে, কিন্তু প্রতীকারের উপায় নির্ণীত হয় নাই। পায়ে বিস্ফোটক হইয়াছে, হাতে অস্ত্র করিলে কি হইবে? বাঙ্গালি শিক্ষার ও অম্লকরণের অম্লযায়ী ব্যবহারে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। এ দুর্বলতার কারণ বাল্যবিবাহ নয়।” উদ্যোগ পিণ্ডি বুধের ঘাড়ে চাপাইয়া কি হইবে?

কেহ যেম বিবেচনা না করেন, ছাদশবৎসর বয়স্ক বালকের বিবাহের পক্ষপাতী। প্রকৃতি আমাদেরকে যে সময়ে বিবাহ দিতে ঈচ্ছিত করে, সেই সময়ে বিবাহ দেওয়া উচিত। শাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্যে বিধি বিধান করিয়াছেন। এবার পূর্ববন্ধ পক্ষেই অধিক কথা লিখিলাম। বারাস্তরে বালিকা বিবাহ সম্বন্ধে পাঠকগণের গোচরে পুনর্বার উপস্থিত করিব।

## বেদবাক্য ।

আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাত্য বিদ্যার আন্দোলনার, পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে লোকের মতি গতি ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই হেমিওপ্যাথিক মাত্রায় সকল বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আপনা-দিগকে পরম বিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন; মধুমক্ষিকার তায় নানাবিধ শাস্ত্র কুন্ময় হইতে কণা কণা মধু সংগ্রহ করিয়া একত্রে সকল মিসাইয়া এক অপূর্ব রসের মধুচক্র প্রস্তুত করিয়া লন এবং শুক্রবৃদ্ধিগকে দংশন জ্বালায় অগ্নির করিয়া তোলেন। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানময় মধুচক্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অভ্যন্তরিত্ত বিবরণ আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাঁহারা সকল বিষয়েরই যুক্তি শুনিতে চাহেন। যুক্তি না পাইলে তাঁহারা কোন কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহেন। বিশেষ বেদবাক্য। বেদে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উল্লেখ আছে। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তি না পাইলে তাঁহারা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার যুক্তি নাই। বেদ বলেন অমুক বজ্র করিলে অমুক ফল হয়, কিন্তু কেন হয়, তাহার যুক্তি দেন নাই। হয় কি না হয়, তাহা ত পরকালের কথা; প্রত্যক্ষ হইবে না; অথচ যুক্তি ও নাই। এই জন্য বেদবাক্য তাঁহাদের নিকট নিতান্তই অগ্রাহ্য। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, বেদবাক্যে প্রমাণের আবশ্যক করে না। বেদ যাহা বলেন, তাহাই ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেন? ইহারই বা যুক্তি কি? ইহার যুক্তি দেখাইতে পারিলে আর প্রত্যেক বাক্যের যুক্তি দেখান আবশ্যক হইবে না। মূল সেচন করিলে তাহাতেই শাখা প্রশাখারও সেচন করা হয়। তাই আজ ইহারই যুক্তি দেখাইতে অগ্রসর হইব। সে যুক্তি এই।—

বেদ বল, পুরাণ বল, কাব্য বল, সকলই উপদেশময়। লোককে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করা ও সৎপথে প্রবৃত্ত করা সকলেরই উদ্দেশ্য। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উপদেশ। শাস্ত্রকার গণই বলিয়াছেন, সেই উপদেশ ত্রিবিধ, কান্তাসম্বিত, সুহৃৎ সম্বিত ও প্রভুসম্বিত। কাব্যের মূল পুরাণ, পুরাণের মূল বেদ।



কাব্যে কান্তাসম্বিত উপদেশ আছে, পুরাণে সুহৃৎসম্বিত উপদেশ আছে এবং বেদে প্রভুসম্বিত উপদেশ আছে। কান্তা বধন স্বামীকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন অগ্রে তাঁহার মধুর বচনেই স্বামীর মন আকৃষ্ট হয়, তার পর তিনি তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইতে উৎসুক হন, এবং সেই মর্ম্ম তাঁহার মর্ম্ম স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ্য হয়। কাব্যও সেইরূপ। তাহার সুমধুর পদাবলী শ্রবণেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও নিকট কোন একটী কবিতা গ্রহ আকৃতি করিলে, সে তাহার অর্থ করিতে সমর্থ্য না হইলেও প্রথমতঃ ঐটি শুনিবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তার পর উহার অর্থ জানিতে উৎসুক হয়। তেমন হয় ত, উহা উৎকণ্ঠা করিয়া ফেলে বা লিপি করিয়া নয়। সেই মধুর বচন বিনাস্ত উপদেশ তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া থাকে। এই ত গেল কাব্যের উপদেশ।

পুরাণের উপদেশ সুহৃৎসম্বিত। বন্ধু বন্ধুকে সৎপথে আনিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কেবল উপদেশ দিয়াই কান্ত থাকেন না; তাহার হুই একটী উদাহরণ দিয়া উহা বন্ধুর মনে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করেন। তিনি বন্ধুকে প্রথম বলিলেন ভাই মদ্য পান করিও না, উহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, মদ্য পান করিলে এলোমেলো বকিয়া লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়, শরীর দিন দিন ক্লম্ব হইয়া পড়ে, অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া শেষে অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হয়।—এই বলিয়াই কান্ত হন নাই। ইহাতে বন্ধুর মন না ফিরিলেও ফিরিতে পারে এবং যদিও ফিরে, তাহাও ক্ষণিক। তার পরক্ষণেই হয়ত ওকথা মিছা মনে করিয়া আবার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; সেই জন্য তিনি আবার কহিলেন। দেখ ভাই, অমুক মদ খাইত। মদ খাইয়া সে রাস্তার ভয়ানক মাতলামি করিত, সেই জন্য তাহাকে কতবার পুলিশে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। ২০০ টাকা বেতনের চাকরি করিত, কিন্তু মাতলামি করার সে চাকরিটি গেল। শেষে খাইতে না পাইয়া চুন্নী করিল, জেল খাটিল, তার পর ঘারে ঘারে ভিক্ষা মাগিয়া খাইল। সে আগে কেমন বলিষ্ঠ ছিল; কিন্তু মদ খরিয়া জীর্ণ জীর্ণ ও ক্লম্ব হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইল।—এ কথার বন্ধুর মন নিশ্চয়ই ফিরিবে। বধন তাহারই

মদ্য পানে অভিস্রাব অগ্নিবে; তখনই সেই ব্যক্তির চূর্ণতির কথা মনে পড়িবে, তখনই একটু ইতস্ততঃ করিবে, এবং তখনই তাহার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া সে সন্তল পরিত্যাগ করিবে। পুরাণও এই রূপ। পুরাণ সংপথে প্রবৃত্ত ও অসংপথ হইতে নিবৃত্ত হইবার কথা বলিয়া তাহার শুভাশুভ পরিণামের কথাও বলিল; শুধু তাই নহে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাম রাবণাদির বিষয় বর্ণনা করিয়া লোকের মনে তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিল।

কিন্তু বেদের উপদেশ প্রভুসম্মিত। প্রভু ভূতাকে আদেশ করিলেন,— অমুককে এখনই ডাকিয়া আন। কেন? কি জন্য? তাহার কিছুই বলিলেন না। ভূতেরও তাহা বিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই।— তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করাই তাহার কর্তব্য।

তাহা না করিয়া কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে বা সে আদেশ প্রতিপালন না করিলে প্রভু কুপিত হইতে পারেন, তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করিতে পারেন। অতএব প্রভু বাক্যের কারণ অনুসন্ধান করা অতীব অনুচিত ও অতিশয় মূঢ়তার কার্য। বেদ বাক্যেও সেইরূপ। বেদ ঈশ্বরের সৃষ্ট। বেদবাক্য ঈশ্বর বাক্য। বেদে বাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে বা তাহার বৃত্তি অনুসন্ধান করিলে ঈশ্বর কুপিত হইবেন; তিনি ভোমাকে নরকে ফেলিবেন। তিনি আমাদের পরম পিতা, পরম প্রভু। তিনি বাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের অবশ্যই হিতকর। একাধিগুণে তাঁহার আদেশ পালন করিলে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করা হইবে এবং আমাদের সুমঙ্গল সাধিত হইবে। তাহা না করিয়া কুতর্ক কলুষিত চিত্তে তাঁহার বাক্যের বৃত্তি অনুসন্ধান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য ও অমঙ্গলের নিদান। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন বেদবাক্যে প্রশংসার আবশ্যকতা নাই। বেদ বাহা বলেন, তাহা অসন্দ্বিগ্ধচিত্তে সত্তত প্রতিপালন করিবে। অতএব বেদবাক্যে আশ্রয়ানু হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য বেদবাক্যে অবিশ্বাস করা বা বৃত্তি অনুসন্ধান করা কোনমতেই উচিত নহে।

## জাতিভেদ ।

বহুদিন হইতে “জাতিভেদ” লইয়া সমাজ মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা যে অত্যন্ত দুষণীয় তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক বহু পরিকর হইয়া তর্ক যুদ্ধে উদ্যত হইয়া ছেন । শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা যে জাতিভেদ রূপ কুসংস্কার নিজ সুসংস্কৃত হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও অভক্ষ্য ও অস্পর্শ প্রবাদি সর্বসমক্ষে অবলীলাক্রমে ভোজন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না । তাঁহারা মনে করেন যেচ্ছাচারীর মত যেখানে সেখানে যেকোন অবস্থার বাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহাই উদরসাৎ করিলেই সভ্যতার আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, ভারত মাতার দুঃখ মোচন হইল এবং ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য পতাকা উড়াইয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইল । ইহারা এতরূপ স্বকপোল কল্পিত বুদ্ধি বলে ভবিষ্যৎ ফলাফল স্থির করিয়া হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র সকলের আদেশ বিধি প্রতি নানাবিধ ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া থাকেন । এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণের জাতিই অধিকাংশ । উহারা সম্ভবত সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণের অতিশয় পদমর্যাদা দৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হইয়া উক্তরূপ পাশবোচিত বৃত্তির প্রস্রাব দিয়া থাকেন । শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য কখনমাত্র ও তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টা হয় না । সুতরাং, শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুস্কর হইয়া উঠে । এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিই আবার আজ কাল ধর্মবিচারক হইয়া সমাজকে পথভ্রান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন । বিভ্রান্ত সমাজও আবার এই সমস্ত মূর্খের কথায় কণপাত করিয়া ইহাদেরই উপদেশ শ্রবণ করিতেছে । যদি সমাজের অন্তঃসারবত্তা থাকিত এবং প্রত্যেক “বিশয়ের” প্রতি অভিনিবেশ থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ভ্রণ ওচ্ছেদ স্রাব সময়ের শ্রোতে ভাসিয়া যাইত না । সমাজনীতি অতি কঠিন নীতি । রাজনীতি বল, ব্যবহার নীতি বল, বাণিজ্য নীতি বল, এক ধর্মনীতি ভিন্ন, সমস্ত নীতিই সমাজ নীতির নিকট অবনত মস্তক । সমাজ একটি দেহ বিশেষ । মনুষ্য দেহের যেরূপ কোন অঙ্গ বিশেষের বিকৃতি অথবা হানি হইলে সমস্ত দেহ একরূপ বিকৃত করিয়া দেয়, সেইরূপ

সমাজ রূপে শরীরে কোন এক অঙ্গের বিপর্যয় হইলে সমস্ত সমাজকে উণ্ডীভূত করিয়া থাকে। বলিতে পার, যে, শরীরের কোন অংশ বিশেষে অথবা স্থান বিশেষে পীড়া হইলে যে রূপ সূচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। আমরা দেহকে সুস্থ ও সবল করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ, সমাজ যদি শরীর বিশেষই হইল, তবে উহারও যদি কোন অংশের অথবা অবস্থার বিশেষের কোন পীড়া অর্থাৎ বিকৃতি হয় তাহা হইলে তাহারও চিকিৎসা করা কি আবশ্যিক নহে? নিশ্চয়ই আবশ্যিক। কিন্তু চিকিৎসা করিবার পূর্বে রোগ নির্ণয় আবশ্যিক। বাহ্যকে তুমি আমি রোগ বলি তাহা প্রকৃত রোগ কি না তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। কারণ আমরা কেহই সূচিকিৎসক নহি। সমাজজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সকলেই প্রায় সমান পণ্ডিত। এতদ্বারা আমাদের ন্যায় অঙ্গের এতবড় গুরুতর বিবরণ কেবল মাত্র “খেরালের” উপর নির্ভর করিয়া বথেষ্টা বিচার বা সিদ্ধান্ত করা অতীব অসুচিৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সমাজের প্রকৃত চিকিৎসক হইতে চাও তবে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ কর। তৎপর সমাজ সম্বন্ধে প্রাচীন, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সূচিকিৎসকগণ কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা সুবিস্তারে আলোচনা করিয়া তেঁমার দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা কর। এই সমস্ত সমাজ নীতিজ্ঞের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য কার্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া তবে যদি তুমি সমাজ সম্বন্ধে ছুই কথা বলিতে অগ্রসর হও, তখন তোমার বাক্য বুদ্ধিমান বক্তার শ্রবণ যোগ্য হইবে। নচেৎ, পামলের মত “আভিভেদ মানি না” আশু বাক্যে বিশ্বাস করি না। “খান্ধ্যাখান্ধ্যের বিচার করি না,” শৌভলিকতার প্রস্তর দিই না” ইত্যাদি রূপ বৃথা চীৎকার করিলে কেবল তোমারই মত ছুই চারি জন মুখি তোমার প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিত হইবে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তোমার উন্নত ভাবিয়া হাস্য করিবেন। অতএব অগ্রে স্থির-চিন্তে ঐবি প্রবীত শাস্ত্রবাক্য অধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে বহুবান্ধু হও, নহুগদেষ্টার আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া অভি-নিবেশ পূর্বক শাস্ত্রাজ্ঞা পালন কর। এই সমস্ত করিয়াও যদি তুমি কোন কল না পাও তখন তুমি শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া কর্ণ-নৃপের নিকেশ করিও, তাহা হইলে আমরাও সানন্দাতরে তোমার

কার্যে সহায়তা করিব। অর্থাৎ বুধা অভিমানের দাস হইয়া আত্ম  
বিক্রমে গড়িয়া সংগত পরিভ্রাণ করিও না। কারণ তাহাতে তুমিত  
উচ্চরে খাইবই আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই কএক জন নিরীহ ব্যক্তিরও  
সর্বনাশ সাধন করিবে। এই যে তুমি “জাতিভেদ কিছু নয় কিছু নয়”  
বলিয়া চীৎকার করিতেছ, যদি তুমি শাস্ত্রোক্ত জাতিভেদের প্রকৃত মর্ম  
বুঝিতে, তাহা হইলে কখন এরূপ বুধা চীৎকারে সমরাজিগাত করিতে  
না। সেই লজ্জা আমরা জাতিভেদ যে কত গুরুতর জিনিষ তাহাই  
অন্য কতকটা দেখাইতে অঙ্গসর হইলাম। ইহাতে আমাদের নিজের  
কল্পনা প্রসূত একটি কথাও থাকিবে না। বাহা শাস্ত্রের মর্ম ও  
মহাজনেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই আবার আমাদের ক্ষুদ্র  
বুদ্ধিতে হতটুকু আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।  
প্রথমে আমরা জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মর্ম কি তাহা বুঝিব, পরে  
অধুনা জাতিভেদ বিরোধীগণ কল্পনা বলে জাতিভেদের যে  
সমস্ত অকিঞ্চিৎকর কারণ নির্দেশ করেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-  
রূপে খণ্ডন করিয়া দেখাইব।

সাধারণতঃ শাস্ত্রে হিন্দুকে চারি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন,—  
ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহা ব্যতিত আরও অনেক অবাস্তব  
জাতি আছে বাহাদিগকে বর্ণ শব্দের জাতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই  
যে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ইহা কোন মনুষ্যের  
অপূর্ব বা অলৌকিক কল্পনা সম্বৃত নহে, অথবা অসভ্য জাতির কুপ্র-  
থাও নহে। উহা জাতি শব্দের যে সাধারণ অর্থ তাহা পরিভ্রাণ  
করে নাই। পশু মধ্যে ব্যাঘ্র জাতি, সিংহ জাতি, শৃগাল জাতি,  
প্রভৃতি স্থলে জাতি শব্দে বাহা বুঝায়, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ  
কত্রিয়াদি জাতি বলিলেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে গুণ  
বা স্বভাব বা যে প্রকৃতি বিশেষ বস্তুর সহজাত, যে গুণ বা স্বভাব বা  
প্রকৃতি দ্বারা বস্তু সকল সাধারণ জ্ঞান হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত  
হয়, যে গুণ বা স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষ দ্বারা কতকগুলি বস্তুকে  
এক জ্ঞানে লওয়া যায়, যে গুণ বা স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষ বস্তুর  
সম্প্রতিহার্য্য ভাব্যই নাম “জাতি”।—

এখন, প্রত্যেক বস্তুতে এইরূপ কতক গুলি করিয়া গুণ বা ধর্ম থাকে,— যেমন, ব্যাঙ্গ্রে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, পণ্ডিত্ব, ব্যাঙ্গত্ব, প্রভৃতি অনেক গুলি ধর্ম আছে। ব্যাঙ্গের যে প্রাণিত্বাদি ধর্ম আছে তাহার সহজাত গুণ বা স্বভাব। প্রাণিত্ব স্বভাব দ্বারাই ব্যাঙ্গ জল সৃষ্টি-কাদি হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত হয়। কিন্তু আবার ঐ প্রাণিত্ব স্বভাব দ্বারা ব্যাঙ্গ, সিংহ, মনুষ্য ও অন্য সীমন্ত পশু পক্ষী প্রভৃতিকে এক জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ প্রাণিত্ব মনুষ্যোও আছে, পক্ষাদিতেও আছে। এই প্রাণিত্বাদি স্বভাব ব্যাঙ্গের দুষ্পরিহার্য্য এইরূপ জঙ্গমত্ব ব্যাঙ্গের একটা সহজাত স্বভাব। জঙ্গমত্ব দ্বারা ব্যাঙ্গ জলের জঙ্গম প্রাণী হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। জঙ্গমত্ব স্বভাব দ্বারা ব্যাঙ্গকে মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদির এক জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ঐ জঙ্গমত্ব মনুষ্যোও আছে পক্ষাদিতেও আছে। জঙ্গমত্ব স্বভাব ও ব্যাঙ্গের দুষ্পরিহার্য্য। আবার পণ্ডিত্ব ও ব্যাঙ্গত্ব সম্বন্ধে ও ঐরূপ যথা সম্ভব বোঝনা করা বাইতে পারে। অতএব যখন প্রাণিত্বভাবে লক্ষ্য করা যায়, তখন ব্যাঙ্গ, মনুষ্য, পক্ষাদি সমস্তই এক জাতি বলিতে হইবে। তজ্জপ আবার কেবল জঙ্গমত্ব দৃষ্টিতে পশু ও মনুষ্য এক জাতি। কিন্তু পণ্ডিত্ব বা ব্যাঙ্গত্ব দ্বারা ব্যাঙ্গকে মনুষ্য হইতে পৃথক করা যায়। কারণ মনুষ্যের মধ্যে পণ্ডিত্ব বা ব্যাঙ্গত্ব প্রকৃতি বা স্বভাব নাই, কিন্তু ব্যাঙ্গ মধ্যে এতটাই আছে। সুতরাং আমরা এক দৃষ্টিতে ব্যাঙ্গ এবং মনুষ্যকে এক জাতি মধ্যে পরিগণিত করিলাম, আবার অন্য দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিত্বাদি অংশে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া লইলাম। ব্যাঙ্গের পণ্ডিত্ব ও ব্যাঙ্গত্ব এই পার্থক্যের কারণ। আবার ব্যাঙ্গ পণ্ডিত্বাংশে অন্য পশুর সহিত এক জ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্গত্বাংশে অন্য পশু হইতে পৃথক জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যাঙ্গও পশু সিংহও পশু। সুতরাং পণ্ডিত্বাংশে ব্যাঙ্গ ও সিংহ একই জাতি, কিন্তু ব্যাঙ্গত্ব এবং সিংহত্বাংশে এতদুভয়ই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি।

এইরূপ মনুষ্য মধ্যেও কতক গুলি করিয়া ধর্ম আছে। যেমন কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব; কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব ও কজিরত্ব, কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব বৈশ্যত্ব ইত্যাদি। প্রাণিত্ব জঙ্গমত্বাদি মনুষ্যের বৈকল্পিক সহজাত গুণ ব্রাহ্মণত্ব কজিরত্বাদিও তজ্জপ মনুষ্যের সহজাত গুণ। পশু মধ্যে ব্যাঙ্গের, ব্যাঙ্গত্ব সিংহের সিংহত্ব, সাধারণ পশু জাতিতে এক হইয়াও, বৈকল্পিক বিসদৃশ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও কজিরের কজিরত্ব প্রভৃতিতে সাধারণ ভাবে মনুষ্যজাতিতে এক হইয়াও, পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ব্যাঙ্গে ও সিংহে বাহ্যিক আকৃতিতে বৈকল্পিক পরিমলকিত হয়, কৈ ব্রাহ্মণে কজিরে সেরূপ আকৃতিতে বৈকল্পিক পরিমলকিত হয় না কেন? আমরা বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও কজিরাদিতেও পার্থক্য আছে।

ব্রাহ্মণ ও সিংহের আকৃতিতে বেল্লগ বিসদৃশ ভাব, ব্রাহ্মণ কজিরাদির আকৃতিতে ভদ্রপেকা অধিক বিসদৃশভাব আছে । একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও একজন প্রকৃত কজির যদি একত্রে কখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে বিসদৃশ ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । এখন যে আমরা আকৃতিগত পার্থক্য দেখিতে পাই না তাহার মূল কারণ, যে এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ কি প্রকৃত কজির, কি বৈশ্য, কি শূদ্র নাই । এখন এ জাতি চতুর্ভু-রই বিকৃত । যদি বলেন যে ব্রাহ্মণ সিংহের এ বিকৃতদশা হয় না কেন ? উহাদেরও আকৃতি চিরকাল পরস্পর ভিন্ন । ইহা সত্য । কিন্তু কথা এই, যে মনুষ্য অন্তরে এমন একটি শক্তি আছে বাহার বলে সে আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়, বাহা কেবল মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণির নাই,—সে পরিবর্তন চাই ভালর দিকে হইতে পারে, মন্দের দিকেও হইতে পারে । উহার নাম বুদ্ধি । সেই অন্য মনুষ্য কখন পণ্ড, আবার কখন দেবতা । বর্তমান সময়ে ঐ বুদ্ধি শক্তির গতি অধঃপতনের দিকে চলিয়াছে, সুতরাং মনুষ্য আপন ভাগ্য লব্ধ শক্তি বলে নিজের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইতেছে । ব্রাহ্মণ অধঃ-পতিত হইয়া নানাবিধ বিরোধী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া নিজ মান-সিক প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক আকৃতিরও পরিবর্তন হইয়াছে । তাহাই আর সেরূপ তপস্বেজ সম্পন্ন সাক্ষাৎ সত্যের মূর্তি ব্রাহ্মণ জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না । সময়ে এসমস্ত ঘটনাকে জানিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণের, দ্বিজ, কজির, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, ব্রহ্ম, যবন প্রভৃতি দশ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন । এইরূপ পরিবর্তন ব্রাহ্মণের জাতিতে ঘটাইয়াছে । কাজেই এখন আর পরস্পরের আকৃতিগত পার্থক্য বুঝা যায় না । তথাপি স্পষ্টভাবে উহাদের পরস্পর পার্থক্য আছে । বাঁহারা দিব্য চক্ষু সম্পন্ন তাঁহারা তাহা স্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করিতে পারেন । এরূপ পাণ্ডু সন্ন্যাসী আমরা অনেক দেখিবাছি বাঁহারা মনুষ্যের বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই তিনি কোন বর্ণের তাহা তৎক্ষণাৎ বলিয়াদেন । অত-এব ব্রাহ্মণাদি জাতি যে মনুষ্যের প্রকৃত স্বভাব বিশেষ তাহা সম্পূর্ণ সত্য । ইহা মনুষ্যগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয় নাই, সুতরাং মানুষের সাধ্য নাই ইহার উচ্ছেদ সাধন করে । তুমি “মানি না” বলিলে যেমন ব্রাহ্মণ সিংহের জাতি নামক পৃথক পৃথক স্বভাবের উচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ কজিরাদি জাতি নামক পৃথক পৃথক স্বভাবের উচ্ছেদও সম্ভব নহে ।



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

১১শ খণ্ড।

## পরকাল।

মায়াময় এই সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করা যায় বৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কেহ কেহ সেই বৈচিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া বৈচিত্রের আধার, বিষয় নিচয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তাহাদিগকে অত্যাধর করিতে থাকেন। এইরূপ আদর করিতে করিতে শ্বন মহাজালে জড়িত হইয়া পড়েন। সামান্য তৃণ পর্যন্ত অপসারিত হইলে ইহাদের মর্মে আঘাত লাগে। কোন কিছুর নাশ আশঙ্কা উহাদের বিষয় প্রবণ অন্তরকে সময়ে উৎকলিকাকুল করিয়া তুলে। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে অচিরে মোহপটে আচ্ছাদন করিয়া আবার বিষয় মমতায় সমাকুল করে। সংসারের অধিকাংশ লোকই এইরূপ। কে নাজানে! যে এ সংসারভবন অতিথি-শালা সদৃশ! তথাপি চিরবাসস্থান বলিয়া মনের ধারণা হয়। প্রণয় প্রতিমা ধর্মপত্নী, স্নেহ পুত্রলিকা পুত্রকন্যা, পরমারাধ্য জনক জননী, ও দক্ষিণাজ স্বরূপ ভাতৃবর্গ যেই হউক না কেন এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, হয় তাঁহারা আমাকে ক্রমে ক্রমে চির পরিত্যাগ করিবে, অথবা আমিই তাহাদিগকে শোক-



সাগরের সুগভীরতলে নিক্ষেপ করিয়া ধরাধাম হইতে প্রজন্মের মত বিদায় লইব। ইহা জানি, কিন্তু এই জ্ঞান থাকে না। তড়িৎ রেখার স্তায় কক্ষচিৎ দেখাদিলেও অজ্ঞান-মেঘেরকোলে বিলীন হইয়া যায়। বিষয়-প্রশক্তি, অন্তরে প্রবল হইলে আপাততঃ বিষয় ভোগবাসনাকেই সুখজনক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। “আমার মৃত্যু হইবে” এই বোধ প্রায়ই হয় না। এতাদৃশ বিষয়-বিমুক্ত ব্যক্তির মনে পরকাল তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। সংসারই তাহার আরম্ভ ও অন্ত।

অপর কেহ, পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতি ফলে, ব্রহ্মচর্যা প্রভৃতি দ্বারা বিষয়কে বিষজ্ঞানে একান্ত হয়ে স্থির করিয়াছেন। বিষয় বৈচিত্র্যের উর্দ্ধে অবস্থান পূর্বক ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পরম কারুণিক গুরুর অনুকম্পায় অজ্ঞান ভিমির অপসারিত হইয়া জ্ঞান-বিভার পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। ইহারা মৃত্যুকে ভয় না করিয়া আল্লাদে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। পরকালের জন্ম তাহারা সংসারকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া পদস্থলিত করিতেছেন। পরকাল তত্ত্ব তাদৃশ ধার্মিক-প্রবরের জ্ঞানময় পবিত্র প্রসন্ন নয়নে যেরূপ স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বিষয় প্রসক্ত দেহ ভিমানীবিন্ধ-মোহ-মুঢ় প্রমত্ত ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রায়ই ব্যাকুল হয় না এবং তদ্রূপ পরকাল বুঝিতেও সক্ষম হয় না। কঠোরতার যম ও নচিকেতা সংবাদই তাহার অত্যাৎকষ্ট জলন্ত উদাহরণ। নচিকেতা কত উন্নত ও পবিত্র হইয়া পরকাল বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যম চিত্ত পরীক্ষণ বাসনার অপেক্ষা প্রলোভনে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন পরকাল মীমাংসার উপদেশ পরশুদ্বারা নচিকেতার হৃদয়স্থিত সংশয় তরুর ছিন্ন করিলেন। এবং শেষে বলিয়াছিলেন—

“ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদান্তং বিত্তমোহেন মৃচ্ছ।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমা পদ্যতে ॥

কঠ প্রতিঃ।

যাহারা বালক অর্থাৎ অব্যবহিক, প্রমাদকারী পুত্র পুত্র প্রভৃতি আসক্তমন্যু, বিতাদি নিমিত্ত অব্যবহিক দ্বারা অজ্ঞান তামসাত্মক ব্যক্তি, তাহাদের মিকট পরকাল প্রয়োজন প্রতিভাত হয় না। এবং তাহারা প্রলোভনে আনাশ্রয় হইয়া দুঃস্থমান ক্রী অন্ন পানাদি বিষয়ে আসক্ত হয়।

পরিণেবে তাহারই চিন্তায় বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার (যত্নের) বশ প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি হুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

অধিকাংশ লোকই এইরূপ । ভাষ্যকার গুরুদেবও ইহাই বলিয়াছেন । “প্রায়েণ হ্যেবং বিধ এবলোকঃ । আমরা সকলেই যদি জগৎ-তত্ত্ব পর্যালোচনা করি তবে ক্রমে ক্রমে আমাদের বিষয় বিভ্রাণ উপস্থিত হইতে পারে । কারণ বাহ্য অনিত্য তাহার জন্য ঘেঁহ ও যত্নের দৃঢ়তা থাকে না । যাহা আমরা আপাততঃ সুখকর বলিয়া আসক্ত হই, তাহাও হৃদয়ের তমঃপঠ অপসারণ করিয়া পরিত্র দৃষ্টিতে দর্শন করিলে পরিণাম বুঝিতে পারিব । ইহা নিশ্চয় যে সকলকেই এক সময়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে । প্রাণাধিক পুত্রকেও এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহ ও স্বজীবন রক্ষা করিতে দেখা যায় । সেই দেহ জীবন ও এক সময়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে । দেহী ও দেহের এবং বিধবিরোগ সাধন অহরহ হইতেছে । সতত ইহার প্রত্যক্ষ হইতে কাহারও বাকি নাই । নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে ইহা বলা একান্ত বাহুল্য । জন্ম হইলেই ঐব মৃত্যু । এই ভগবদ্ভাক্য হেলন করিবার সাধ্য ভগবান ভিন্ন মানুষের নাই । এখন দেখা যাউক জন্ম কি ? প্রাণিমাাত্রই কোনও বীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন । উহা অচেতন পদার্থ । অচেতন হইতে কখনও চেতন হয় না । অসৎ হইতে সৎপত্তি ঘটে না । চেতন ও অচেতন আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ । এক পদার্থ হইতে তাহার বিপরীত পদার্থের উদ্ভব হয় না । প্রাণী উৎপন্ন হইতে কেবল বীৰ্য্যাদানই যে একমাত্র কারণ তাহাও বলা বাইতে পারে না । যদি পদার্থের মিশ্রণে দ্রব্যগুণে অচেতন হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এরূপ বলিতে ইচ্ছা থাকে, তবে চার্বাকের দোহাও প্রত্যয় ষণ্ডনবাদ সঙ্গর্শন করিলেই মনের খাঁদা দূর হইতে পারে । দর্শন শাস্ত্রে উহার বিচার ষণ্ডন আছে । এস্থলে উহার উল্লেখ তত আবশ্যক নাই । গিষ্ঠ পেষণ কে করে ? তবে বলিতে হইবে বীৰ্য্যের মধ্যে চেতনাকর নিহিত থাকে তাহাই ক্রমে বীৰ্য্যযোগে একটা প্রাণী-রূপে পরিণত হয় । হানোধ্য ঋত্বির পঞ্চাশি বিদ্যায় উহা বর্ণিত আছে । সুক্ক শবীর ক্রমে আহাৰ্য্য দ্রব্যে সংশ্লিষ্ট হয় তাহাই বায়োর

পরিণাম ভুলে অবহেলা করে। কালে উহা জঠরে বলকতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রসূত হইয়া একটী জীব রূপে প্রকাশিত হয়।

যদি বল যে আজ বাহার জন্ম হইল এই তাহার প্রথম জন্ম একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি ইহাই প্রথম জন্ম হয় তবে অল্পে অল্পে পরমেশ্বরে পর্যন্ত বৈষম্য নৈমিত্ত্য প্রভৃতি দোষ সংস্পর্শ হয়। একজনে সহজেই বুদ্ধিমান ও মনস্বী, অল্পে চেষ্টা করিয়াও কিকিৎ মেধাবী বা প্রতিভাশালী হইতে পারে না, ইহার কারণ কি? একজন দরিদ্র-গৃহে জন্ম লাভ করিয়া আজীবন দৈন্যদুঃখে অতিবাহিত করে, অন্যে চিরদিন সুখসাগরে সন্তরণ করিয়া নিশ্চিন্ত। একে বিষয় বিশেষে নৈপুণ্য-পরিচয় প্রদান করিয়া যশস্বী হইতেছে, আত্মপ্রসাদে চিত্ত প্রশম, অল্পে সেই ক্ষমতার অভাব বলিয়া ক্ষোভে ম্লান, বিষমতা তাহার সহচর। একে সুস্বাদু উপাদেয় আহাৰ্য্য আহার করিয়া পরিভৃষ্ট এবং ঔদার্য্যবশতঃ অপরের জঠরাকলে পূর্ণাহতি প্রদান করিতেছে; অন্যে স্বোদর পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে বাচ্ঞা করিতেছে। ভাগ্যবশে ক্ষুত্রিবৃত্তি হইলেই আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে। একে জন্মিয়া ইঞ্জিয় গ্রাসে বিষয় সুখ অনুভব করিতেছে অন্যে কোনও ইঞ্জিয় বিহীন হইয়া মনস্তাপে দীন ক্ষীণ ও মলিন। একে দিব্য চক্ষে স্রষ্টার অশূর্য্য কোশল সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট অন্যে অন্ধ হইয়া অশেষ দুর্গতি লাভ করিতেছে। একে সভ্য মানব অন্যে অসভ্য পশুপক্ষ। একদল প্রাণী মানব। অন্য দল পশু তির্য্যক ও স্থাবর প্রভৃতি। জগতে এই বৈষম্যের কারণ কি? পরমেশ্বর বৈষম্য দোষে ছুটি নহে। পরব্রহ্ম নিরঞ্জন, নিলেপ যুক্ত বুদ্ধ, ঈশ্বর বালকের ন্যায় ক্রীড়া পরতন্ত্র হইয়া কাহাকে দুঃখী বা সুখী করিতেছেন ইহা মুখে আনা দূরে থাকুক মনে করিলে ও পাপস্পর্শ ঘটে। বিবেক-বিশিষ্ট ভিন্ন পরমেশ্বরে দোষ প্রদান কেহ করিতে পারে না। যদি পাপ-বিষেক নিবন্ধন পিতামাতার স্বর্কে অকৃত্য মুকৃত্য প্রভৃতি হৃদ্য-প্যের নিদান বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাও তাহাও অযৌক্তিক। একের দোষের ফল অন্যে ভোগ করিবে কেন? জগৎপাতার নিয়-মিত্তি রাজ্যে এ অবিচার কদাপি সম্ভবে না। একে পাপ করিবে অল্পে ফল ভোগ করিবে ইহা প্রতিমাস লোকের ননোমন্দিরে ভ্রমেও প্রতি-

স্তিত হয় না\*। তবে জগতে একুপ বৈষম্য কেন একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিতে ভাবিতে চিন্তের অবসাদ উপস্থিত হইবে তথাপি তত্ত্বনির্ভারিত হইবার নহে। তবে একটি মাত্র কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে বাহ্য প্রোত, সুতরাং অপৌরুষের নিত্য বলি এবং শিষ্টানু-মোদিত। সেই কারণটি “কর্ম”। জীব কর্মানুসারে অসংখ্য বোন পরিভ্রমণ করিয়া এক এক জন্মে স্বীয় স্বীয় কর্ম ফল ভোগ করে। এবং বাহার যেমন কর্ম তেমন ফল ঘটে। পরমেশ্বর কর্মানুসারে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। তাহা ভিন্ন তিনি ক্রীড়ণকের ন্যায় যথেষ্ট ব্যবহার করেন না। বাহার পিতা মাতার অনুষ্ঠিত কর্মফল সম্ভানের হুর্গতি লাভ স্থির করেন তাহারাও হুর্গতির কারণ, কর্ম স্থির করিয়া থাকেন, তাহাতে এই একটি বিস্ময়কর মীমাংসার অবতরণ করেন যে, একের দোষের ফল অন্ত্রে ভোগ করিয়া হুঃখী বা সুখী হয়। কর্মস্বীকার করিতে হইলে সনাতন পবিত্র বেদ শাস্ত্রানুরূপ প্রকৃত কর্ম স্বীকার করিলেই কোন আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে না। কর্মানুসারে জীবে বৈষম্য অবস্থা ঘটয়া থাকে এতদসম্বন্ধে অতি সজ্ঞেয়পে শাস্ত্র তাৎপর্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“এষ হেব সারু কর্ম কারয়তি তং যমেত্যো লোকেত্য উন্নীষত

এষউ এবামাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনিষতে” ইতিশ্রুতিঃ

পুন্যো বৈ পুন্যেন কন্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি”

এবং বিধ বহু শ্রুতি বাক্য ভিন্ন স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে প্রাণি কর্ম বিশেষের অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন।

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্”। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান ভাব্যকার উহার বিস্তার করিয়াছেন।

“রুদি হি নিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরো বিযমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে স্যাতা-  
মেত্যো দৌর্বো বৈষম্যং নৈর্থ্যঞ্চ, নতু নিরপেক্ষস্ত নির্মিত্বমস্তি,  
সাপেক্ষো হীশ্বরো বিযমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষতে, ইতিচেৎ,

\* কোন ফলে পিতামাতার রোগ সম্ভানে প্রাপ্ত হয়। মৌলিক রোগও কর্মদোষের ফল ভাবিলেই বুঝা যায়।

ধর্মাধর্ম্যাব পেক্ষতে ইতি বদামঃ । অতঃ স্বজ্যমান প্রাণি ধর্মাপেক্ষা বিষম্য  
সৃষ্টি রিতি, নাম, মীশ্বরস্যাঃপরাধঃ” ।

পরমেশ্বর যদি কোন কিছু অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিষম  
সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাহাতে বৈষম্য ও নৈঘর্ন্য \* দোষ  
স্পর্শ হইত । বাস্তবিক ঈশ্বর নির্দোষ, অতএব নিরপেক্ষ ঈশ্বরের নির্মাতৃত্ব  
নাই । ঈশ্বর কোন কিছু (কর্ম) অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি করিয়া-  
ছেন । যদি বল কি অপেক্ষায় এইরূপ সৃষ্টি হইল ? ধর্মাধর্ম্য অপেক্ষা  
করিয়া এইরূপ সৃষ্টি হইল । অতএব স্বজ্যমান প্রাণিজাতের ধর্মাধর্ম্যানু-  
সারে বিষম সৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই । তাহার  
পর ভাষ্যকার আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

“ঈশ্বরস্ত পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ । যথা হি পর্জন্যো ব্রীহি যবাদি  
সৃষ্টৌ সাধারণ কারণ ভবতি, ব্রীহিষবাদি বৈষম্যে তু তন্তং বীজ  
গতাত্ত্বো সাধারণানি সমর্থানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি  
সৃষ্টৌ সাধারণ কারণ ভবতি । দেব মনুষ্যাদি বৈষম্যেতু তন্তজীব  
গতাত্ত্বো সাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি ” । এস্থলে ঈশ্বরকে  
পর্জন্যবৎ (মেঘের জায়) দেখিতে হইবে অর্থাৎ যেমন ব্রীহি যবাদি  
সৃষ্টিতে মেঘ সাধারণ কারণ, ব্রীহি যবাদির বৈষম্যের কারণ মেঘ নহে ;  
তন্তং বীজ গত বৈষম্যেই বিষম হইয়া থাকে তদ্রূপ ঈশ্বরও দেব  
মনুষ্যাদি বিষম সৃষ্টির সাধারণ কারণ, জীব গত কর্ম্মই তাহার অসাধারণ  
কারণ হয় ।

এইরূপ ভূরি ভূরি আগোপদেশে আমরা এই বুঝিতে পারি, যে,  
কর্ম্মানুসারে বিষম সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম ফল ভোগের জন্ত পুনঃ  
পুনঃ জন্মাদি হইয়া থাকে । শাস্ত্র ও যুক্তি বিশদরূপে দেখাইয়া দিতেছে,  
কর্ম্মফল ভোগের জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম ও বৈষম্য, তবে মোহপটে অস্তর  
সমাচ্ছাদিত, দর্শন অবিদ্যা কলুষে কলুষিত সেইজন্ত বুঝিয়াও বুঝিনা  
দেখিয়াও দেখিনা ।

কর্ম্মফল ভোগের জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় এই কথায় শাস্ত্র-শ্রদ্ধা-  
বিরহিত অথবা সন্দিক্ত ব্যক্তিগণ ছুই একটা আপত্তি উত্থাপন করিতে

\* যথা, অর্থ জুড়পসা দয়া প্রভৃতি, নৈর্ঘ্য নির্ঘ্যতা প্রভৃতি ।

পারেন। আমরা বলি আপত্তি না করাই ভাল, ভগবান বলিয়াছেন “অজ্ঞানচাপ্রদধানশ্চ সংশয়াহা বিনশ্চতি”। অজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও সন্দিক্ত ইহারা বিনাশ পায়। এই ভগবদ্বাক্য অবহেলা করিয়া মূলশূন্য তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তত্ত্ব স্থির হইবে না। কেবল আপত্তিকারীরাই বুদ্ধিমান ও তর্ক কুশল আর আমরা কিছু বুঝি না এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কেবল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। অতীন্দ্রিয় বিষয় তর্কে স্থির করিতে না গিয়া সনাতন বেদের সুশীতল ছায়ায় বিরাম করাই কর্তব্য। যদি শোনিতির উচ্চতায় আমাদের এই সমস্ত কথার বীতশ্রেদ্ধ হইয়া অবহেলা পূর্বক তর্ক করিতে প্রয়াস থাকে তাহাতেও আমরা পশ্চাৎ পদ হইতে অভিল্য করি না এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও উহা সবিস্তর লিপিবদ্ধ হইবে, তথাপি এস্থলে দুই একটি প্রধান তর্কের অবতারণা করিয়া আপত্তির নিরসন করা যাইতেছে।

প্রথম আপত্তি কর্ম্মাধীন জীবের পুনঃ পুনঃ জনন মরণ হইলে প্রথম জীব না হইলে কর্ম্ম কিরূপে হইল? আমরা বলি অনাদি সংসারে বসতি করিয়া এরূপ আপত্তি কেন? কিরূপে তর্কমুখে স্থির করিবে যে, প্রথম দম্পতী এ ধরাধামে আবির্ভূত হইল। ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার অসীমতা ভিন্ন আর কি হইবে? সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি, তাহার প্রথম কি? যে চক্র নিয়ত ঘূর্ণায়মান তাহার প্রথম ঘূর্ণন কি? যদি বল প্রলয় হইয়া যখন সৃষ্টিপ্রবাহ নাশ পাইয়া আবার সৃষ্টি হইবে তখনই প্রথম, তাহাও নহে। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি এই ক্রম সতত প্রচলিত, তবে প্রথম কাহাকে বলিবে? মানব কার্যের প্রথম ও শেষ আছে, ঐশিক কার্যের প্রথম কি? ঈশ্বর ভূমা সর্ব গত নিত্য, নিত্যের কার্য প্রথম কি? জগৎসৃষ্টি সৃষ্টি প্রলয় নিয়তই হইতেছে এইজন্য সৃষ্টি অনাদি\*। অনাদি সংসারে কর্ম্ম প্রথম কি জীব প্রথম এরূপ প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এইকথার যথার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। ঈশ্বর যতদিন সৃষ্টি প্রবাহ ও ততদিন, উহার আর প্রথম কি? এখন আর এক প্রশ্ন হইতে পারে এই যে পূর্বজন্মার্জিত কর্ম্ম ফলানুসারে সুখ দুঃখাদি ঘটিলে প্রতিকার চেষ্টা বুঝা। তাহাও নহে।

\*ভাষ্যম্বলি বেদব্যাঙ্গের ঐহিক চক্রকাল ন্যায়লব্ধারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংসার প্রায়ই ত্রিভাপে তপ্ত। তাপত্রয়ের উন্মূলন ক্ষমতা মানুষের আছে। ওরুর কৃপায় তঁহা উন্মূলিত অথবা উন্মূলনে অধিকতর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য চেষ্টার আবশ্যকতা। আবার কৰ্ম সকলও কৰ্ম, অকৰ্ম ও বিকৰ্ম ভেদে বিভক্ত কতক কৰ্ম নিত্য, কতক কৰ্ম বিহিত, কতক নিষিদ্ধ। কাহার ভোগে, কাহার প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পর্য্যবসান হয়। সেইহেতু কোন হুঃখের প্রতীকার চেষ্টাসাধ্য কোনটী বা শতচেষ্টায়ও পরিহার করা যায় না। তপস্যা বিমুখ, নিষিদ্ধসেবী, নিত্য কৰ্মের অননুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্ত পরামুখগণ কোন্ কৰ্মের কিরূপ ফল তাহাঁ বুঝিতে পারে না, এইজন্য প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া কৰ্তব্য। একটী উন্নত শৃগাল গৃহমধ্যস্থ অনেক লোকের মধ্যে একটীকে দংশন করিয়া কোথায় পলায়ন করিল। এস্থলে অন্য লোক থাকিতে সেই একব্যক্তি দংশিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বসিল কেন? এইরূপ ঘটনা অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মাণ্ডব্য মুনি পূৰ্বজন্মার্জিত পতঙ্গ বিদ্ধ করা পাশে শূলারোহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টান্তে এরূপ ভুরিভুরি উদাহরণ পাওয়া যাইবে যে, অদৃষ্ট দোষে হর্ষিপাক ঘটিয়া থাকে। কোন সময় কোন ক্রেশের প্রতীকার জন্ত উপযুক্ত আয়োজন বিদ্যমানে ও প্রতীকার না হইয়া শেষ ফল ফলিয়া থাকে। তখন তাহার উত্তরে হ্রদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়। যদিও আমরা এস্থলে সম্মুখে কৰ্মের গতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলাম, তথাপি ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে কৰ্মের বিপক্ষে যে কোন আপত্তির উত্থাপন কর তাহা নিরস্ত হইবে এবং অন্তিমে কৰ্মের শরণ না লইয়া আর গত্যন্তর নাই। জীবকে যদি নিয়ত কৰ্মফল ভোগ করিতে হয় তবে অবশ্যই ভোগের জন্য বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইতে হইবে। সেই জন্য এক একরূপে জন্ম হয় ও ভোগান্তে তৎকালোপাত্ত কৰ্মফল ভোগ জন্ত আবার দেহান্তর প্রাপ্তির আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং জন্ম-অবশ্যস্তাবী। জন্ম হইলেই মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আবার মৃত্যুসদনে উপস্থিত হইতে হইবে। মৃত্যুর পরে পূৰ্ব জীবনে উপার্জিত কৰ্মফল ভোগ করিতে হইবে। কুচেৎ কৃত নাশ ও অকৃত প্রাপ্তি দোষের উপস্থিতি হইয়া থাকে।

“কৃতনাশ। কৃতাত্যাগময়োঃ কোবারকোভবেৎ ॥৮৫

চিত্রাঙ্গী পঞ্চদশী।

“কৃত্যোঃ পুণ্যপাপয়োভোগমন্তরেণ নাশঃ” কৃত্যনাশঃ, অকৃত্যো-  
রকস্মাৎ ফলভোগভুক্তমকৃত্যভোগম এতদ্ব্যবহাৰং । সাত্বানোহনিত্যত্বা-  
ভ্যাপগমে ভবেৎ” । টীকা

মৃত্যুমাগ্রেই সমস্ত কুরাইয়া গেলে, অথবা পুনর্জন্ম স্বীকার করিয়া  
পরকালে অনন্ত উন্নতি বলিলে কৃত্যনাশদোষ ও অকৃত্য কর্মের অকস্মাৎ  
ফল ভোগ হয় কি না পাঠকগণ বিবেচনা করুন! মৃত্যু হইলে যদি  
সমস্ত কুরাইয়া যায়, ইহজীবনের সহিত তৎকৃত কার্যের ফল না থাকে  
তবে পাপ ও পুণ্যের ভোগ ভিন্নই সমস্ত শেষ হইল। ইহাকেই কৃত-  
নাশ দোষ বলে। আবার পাপের ভোগ হইল না পরকালে অনন্ত  
উন্নতি হইল স্বীকার করিলেও সেইরূপ দোষ হয়। অধিকন্তু বাহা  
করে নাই তাহার ফল,—অনন্ত উন্নতি হইল। পাপ করিয়া থাকিলে  
মরণান্তে পাপের ফল হুঃখ হইল না, যেহেতু অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ;  
অতএব অকৃত্য কর্মফল লাভ হইল, এইরূপ পরকাল স্বীকার করিয়া আন্তিক  
হওয়ার সাধ বুঝি। প্রকারান্তরে নাস্তিকতার হুর্গন্ধ সমস্ত বিকীর্ণ হইয়া  
থাকে। আর্ধ্যগণ দিব্যচক্ষে উহা দেখিয়া বুঝিয়াছেন। বালক অথবা  
অনার্য্যগণেই পরকালে বিপ্রতিপত্তি দেখাইয়া নরকপথানুসরণে প্রবৃত্ত  
হয়। পরকালে যাহার আস্থা আছে, পরকালে অনন্ত সুখভোগের  
বাসনা আছে, সে, বিষয় বাসনা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিত্য-  
কর্ম কাণ্ড যথারীতি সমাপন পূর্বক শ্রীমদ্ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া  
থাকে। আর্ধ্যশাস্ত্র তাহার গতি। বেদ বাহাদের প্রাণ, উপনিষদ  
আত্মা, জ্যোতিষ-গণিত বাহাদের বীজ্ঞণ, দর্শন বাহাদের দর্শন, পুরাণ  
বাহাদের বাহ, তাহারা কখনই পরকালতত্ত্ব বিমুখ নহে। বরং তাহাদের  
জ্ঞানময় অন্তর হইতে ঈশ্বরানুগ্রহে বাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই  
সত্য। সেই সত্যপথের পাছ হইয়া মোক্ষধামে গমন করিতে প্রয়াস  
পাওয়া অবশ্যকর্তব্য। দিন যায়, আয়ুঃ যায়, যাইতে যাইতে সমস্তই যাইবে,  
জীব কেবল সঞ্চিত অদৃষ্ট সম্বলে পুনঃ পুনঃ বাতায়াত করিবে। সেই  
বাতায়াত নিবৃত্তির ক্ষমতা অধিকারানুরূপ সকলেরই আছে। কেহ ইহ-  
জীবনেই জীবমুক্ত কেহ বা দুইতিন জন্মের পর মুক্তিলাভ করিয়াছে ইতি-  
হাসে ইহার উদাহরণের অসম্ভাব নাই। লোকে আর কিছুকে ভয় না  
করিলেও মৃত্যুকে এক সময়ে ভয় করিয়া থাকে। সেই মৃত্যুও যাহার ভয়ে



ভীত, শাসনে শিষ্ট সেই যুক্তি দিতা, অতএব জনন নাশক জনান্বিনের  
শরণ লও, অবশুই ভবন্তর বিধ্বস্ত হইবে। বিষয় স্থখের প্রায়ই তর্পণ  
নাই, উপভোগে দ্রাস পায় না, বরং বর্জিত হয়। অতএব এইবেলা  
বিষয় বিরাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হও, স্নেহাচার হইতে সর্ব্বধা বিরত হও,  
এবং নাস্তিকগণের আপাত মনোরম পরিণাম বহু ক্রেশপ্রদ ইন্দ্রজাল  
বাক্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মনাশ করিও না। আত্মহত্যা মহাপাপ। বাহ্য  
ভোগ হইতেছে তাহাও একজীবনের পরকাল ভোগ। আবার এখনকার  
কার্য্য ফল পরকালে ভোগ হইবে; এইরূপ জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ ভোগ-  
করিতে হইবে।

আমরা জীব কি? পরকাল কি? কেন পুনর্জন্ম হয় তাহা পূর্বাগর  
বলিয়াছি। শাস্ত্রের মর্ম্ম সজ্ঞেপে বুঝাইয়াছি পূর্বাগর পর্যালোচনা  
করিলে বোধ হয় বুঝিতে বাকি থাকিবেনা। তথাপি যদি ইহা অসম্পূর্ণ  
বোধহইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে আরও লিখিব। অবসর হইলে ভোগ  
ও গতির বিষয় আলোচনা করিব। আগামীতে খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের  
সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব এরূপ বাসনা আছে। বর্ত্তমান সময়ে  
ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি। কারণ লোভও স্নেহাচারে অনেকের  
রুচি দেখা যাইতেছে।

## পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

পরিশিষ্ট ।

ভগবন্তরূপ যখন জগতে ধর্ম্মপ্রচার মানসে জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বয়ং  
ভগবান্ বেন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য অসংখ্য প্রবল শত্রু  
দ্বারা তাঁহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া নিত্য নব নব লীলা প্রদর্শন করেন।  
ঈশ্বর, প্রহ্লাদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই তাহার জলন্ত  
দুষ্টান্ত। সুতরাং ইতিহাস দেখিয়া মনে হয় যে, যখন “বড় লোক” হইলেই  
তাঁহার শত্রু-অনিবার্য্য, তখন শত্রু সংখ্যা অধিক থাকা একরূপ মড়কোকে

চিহ্ন বিশেষ । শক্তরাই গুণের প্রকৃত গুণ প্রচার করে, পরীক্ষার প্রচণ্ড অনলে পরিপক করিয়া দেয়, মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভাবরাশিকে উন্মোচিত করিয়া তুলে । হিরণ্যকশিপু যদি সন্তানের উপর খড়্গহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে শিশু প্রজ্ঞাদেরও হরির শ্রীপাদপদ্ম কামনায় এত অধিক উৎসাহ হইত না, ভগবানেরও ভক্তকে “রক্ষা” করিবার জন্ত আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হইত না, এবং যদি বিমাতা কর্তৃক অতি ঘৃণিত ভাবে ধিকৃত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের সে উত্তেজনাও হইত না তাঁহার পদপলাশলোচনের দর্শনাকাজক্ষাও চরিতার্থ হইত না, সেইরূপই যদি শঙ্করা-বতার শঙ্করাচার্য্য, ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যপ্রভু সর্বদা প্রবল শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিপীড়িত না হইতেন তাহা হইলে কদাচ তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনে এত উদ্যম ও উৎসাহ দেখা যাইত না । পরমহংসদেবেরও সেইরূপ শত্রুর অভাব ছিল না । যতই তাঁহার মহিমা প্রচার হইতে লাগিল ততই তাঁহার শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তাঁহাকে অপদম্ব করিবার জন্ত বহুজনে তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুবোগ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তিনি যে অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক তাহাই প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিল । তাঁহার প্রতি প্রথম অভিযোগ,—তিনি অত্যন্ত যশো-লিপ্সু ছিলেন । দ্বিতীয়,—সেই যশোমিয়ার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন ও তাহাদের মনস্তৃষ্টির জন্ত অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের অনুকূলে মত দিতেন । তৃতীয়,—তিনি অত্যন্ত কদর্য্য প্রকৃতির লোকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়ার তাহারা তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার আশ্রয় বিশেষ অবনতি সংসাধিত করিয়াছে । চতুর্থ,—তিনি এদিকে পরমহংস ছিলেন অথচ তাঁহার সকের পরিসীমা ছিল না ।

এখন আমরা এগুলি প্রকৃত অভিযোগের যোগ্য কি না তাহাই আলোচনা করিব । মানুষের “চেষ্টা” দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় স্থির করিতে হয় । সুতরাং পরমহংসদেবের যে যশঃ প্রাপ্তি অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা তাঁহার চেষ্টা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে । কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনে কোনরূপ চেষ্টার কার্য্য দেখিতে পাই না । তাঁহার নিজের (স্বার্থ, আত্মসম্মতি) কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ছিল না । সুতরাং তিনি কোনো মতে পরমহংস ভক্তদের কর্তৃক অনুকৃত হইয়া কখনো পরমহংস ভাবের

আবাসে গমন করিয়া সংকীর্ণনাদির দ্বারা অমূল্য উপদেশ রাশি বিতরণ করিতেন। ইহাই যদি তাঁহার বশোলিঙ্গার কারণ হয়, সে কারণ সহস্রবার প্রার্থনীয়। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য, যে সম্প্রদায় বিশেষের সহিত তিনি কি স্বয়ং উপঘাটক হইয়া বনিষ্ঠতা করিতেন, না তাঁহার। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বনিষ্ঠতা প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদের আকাজক্ষা পূরণ করিতেন? ভগবন্তকৃত কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। তিনি সকল ধর্মই ঈশ্বরের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। জগতে যত প্রকার ধর্ম সম্প্রদায় আছে সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। যদি উদ্দেশ্য সকলের একই হয়, তবে তাহার ভিন্নতায় কোনটা অধিকার্য্য-সাধ্য, কোনটা অসম্ভব, এইমাত্র বলিতে পারা যায়। চরমে কিন্তু জীব মাত্রেরই একই গতি ইহা নিশ্চয়। ইহাই হিন্দুর মত ও বিশ্বাস। হিন্দু বলেন যেখানে অকপট ভগবন্তভক্তি আছে সেই খানেই সত্যের জ্যোতিঃ কিছু না কিছু বিভাসিত হইয়া থাকে। সত্য বাহা তাহা সকল সম্প্রদায়েই এক। সুতরাং পরমহংসদেব যখন সত্যধর্ম প্রচার করিতেন, তখন যেখানে সত্য আছে তাহার সহিত একত্ব সম্পাদিত হইবেই হইবে। এই কারণেই পরমহংসদেবের কথা সকল সম্প্রদায়ের অনুকূল বলিয়া মনে হইত। তৃতীয় অভিযোগ শুনিয়া আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়; মনে হয়, যে ইহারা ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ কি তাহাও অবগত নহে। ভক্তজীবনের লক্ষ্যই পতিতের উদ্ধার সাধন। তাই ভক্ত যতই ভক্তি সমুদ্রে ডুবিতে থাকেন ততই আনন্দে নাচিয়া বলেন “পান কর আর দান কর”। ভক্ত নিজের জন্তও যেমন কাতর জীবের জন্তও তেমনি কাতর। স্ত্রীজাতি সরলা, অথলা,—স্ত্রীজাতি দেবী; কেন না তাহারা একাকি আনন্দ উপভোগে নিতান্তই অক্ষম। সরল ভক্তও তদ্রূপ একক ভগবৎপ্রেমানন্দ ভোগ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবদেব। ভক্তপ্রবর পরমহংসের সরল প্রাণ দীন, হীন, পতিত দেখিলে কাঁদিয়া উঠিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোড় প্রসারণ করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইতেন। আমরা বিশ্বাস করি যে পতিতের সংস্পর্শে ভক্তের উপার্জিত সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায় সত্য,—কিন্তু ভক্তের যে মূল মন্ত্র “পান কর আর দান কর”। বিতরণ করিয়া না ধাইলে সে অমৃত পরিপাক হয় না। সুতরাং সহস্র জাতি স্বীকার করিয়াও ভক্তগণ সর্বদা বিতরণ তৎপর। পরমহংস

দেবও সেই জন্ত অবাধে আশ্রিতদিগকে স্থান দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ভক্তোচিত কার্যই হইয়াছে। চতুর্থ অভিযোগটী শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। পরমহংস,—বৈরাগ্য অবতার পরমহংস কি না সোধিন্ ? হাসিও পায়, হৃৎকণ্ড হয়। তাঁহাকে নানারূপ বসন ভূষণ পরিতে দেখিয়া লোকে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহাকে অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্ত দেখিলে এইরূপই অনুমিতি হইবার অধিক সম্ভব। কেন না, আদর করিয়া যে ভক্ত বেক্রপ ভাবে তাঁহাকে বেশ ভূষায় ভূষিত করিতে ভাল বাসিতেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে সাজাইতেন, তাহাতে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দ্রব্য তাঁহার সাধনার প্রতিকূলে না দাঁড়াইত ততক্ষণ তাহার একখানিও পরিত্যাগ করিতেন না, বালকের গ্রায় সজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তদবস্থায় তাঁহাকে যিনি দেখিতেন তাঁহারই ঐরূপ ভ্রান্তি হইত। এইরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই তাঁহার নানারূপ কুৎসা রটাইত। কিন্তু মুঢ়েরা জানে না, যে ইতিহাস জলন্ত ভাবে দিন দিন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে “সকল স্থানেই ভগবন্তের জয় অনিবার্য। কাহার সাধ্য ভক্তের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার কৃতি করিতে সক্ষম হয় সুতরাং এখানেও ভক্তেরই জয় হইল। শত্রুদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। পরমহংসদেবের মূলদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহার অঙ্গর অমর নিত্য বুদ্ধ যুক্তাস্তা তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে জলন্ত ভাবে দেদীপ্যমান থাকিয়া কার্য করিতেছে। সাংসারিক লোক তাঁহাকে জানিল না তাহাতে তাঁহার কৃতিও নাই, বুদ্ধিও নাই। ভক্ত সমাজে, ধর্ম পিপাসুর নিকট, গুণীর কাছে তিনি যাবৎ “চন্দ্র সূর্য্য” বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎ তিনি সমাদৃত ও পূজিত হইবেন। লোকে তাঁহার এই অপূর্ব চরিতামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে।

আমরা এইরূপ সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনের মূল মূল ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিবদ করিয়া পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

## নবমী পূজা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস।—অবলাচরণের পূজা কিরূপ তাহা আমি দেখি নাই।

জ্ঞানানন্দ।—দেখেন নাই! তবে প্রথম হইতেই বলিতেছি শুনুন,—  
দাদা! অবলাচরণ যে মাকে খড়ম, ছাতা পাখা, শাঁখা, আয়না, চিরণ, কোঁটা,  
এবং খাট বিছানাদি উপদ্রব্য গুলি দিয়াছে, তাহা দেখিলে মায়ের দুর্গতি  
মনে করিয়া কান্না আসে। হতভাগা অবলা, ষষ্ঠদুমুরের আটখানি চেলা  
কাঠে বলি লাগাইয়া মায়ের চারি জোড় খড়ম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু  
উহার নিজের পায়ের খড়মজুড়ীর মূল্য বেধেই হটাকার কম নয়। তৎ-  
পর আস্ত-আস্ত এবং পরস্পরে-অসংযুক্ত কএকটি তালপাতা আনিয়া,  
তাহা নারিকেলের শলা দিয়া বিঁধিয়া, মায়ের ছত্র (?) দিয়াছে! কিন্তু  
দুর্ভাগ্য অবলা, সহস্র ছত্র ক্রয়েও কিছুমাত্র অসমর্থ নয়। তৎপর শাঁখা!  
দাদা মহাশয়! মায়ের সুবর্ণময় করপদ্মকয়টি যখন মনে পড়ে, তখন  
তাহাতে ঐ শাঁখা দিয়া সাজান, মনেতে কল্পনা করিলেও কখন উপস্থিত  
হয়। অবলা যেন কোথা হইতে আস্ত-আস্ত কতকগুলি কাটাশাঁখ  
(ছালী) আনিয়াছে তাহাতে আবার এক একটু হিঙ্গুল দেওয়া আছে,  
তাহাই মাকে শাঁখা (?) দিয়াছে! কিন্তু উহার স্ত্রীর গায়ে দশ হাজার  
টাকার গহনা! তদ্ব্যতীত, এক পরসার চারিখানি আয়না এবং এক  
পরসার চারিখানি চিরণ দিয়াছে। তৎপর, খাট ও বিছানার যে দুর্দশা,  
তাহা দেখিলেই খশান খাট মনে পড়ে। কিন্তু উহার নিজের শয়নের  
খাট, বিছানা ও মসারি বোধ হয় তিনশত টাকায়ও নিম্পন্ন হয় নাই।  
তৎপর ভোগের দ্রব্য।—অবলা ব্রাহ্মণের ঘরে জমিয়াছে, সুতরাং রমণী-  
দাসের ভ্রাতৃ “ইজুর প’ড়ে মুছা যাওয়ার” অবস্থা করিতে পারে নাই,  
দায় পড়িয়া উহাকে কিছু কিছু ভোগ দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাও  
অতি অল্পত।—দাদা মহাশয়! অবলার ভোগের কথা বলিতে গিয়া  
তাহা হইতেও অল্পততর ভামিনীচরণ রায়ের ভোগের কথা মনে পড়িল।  
অতএব তাহাই আগে বলি,—ওঃ! কি পৈশাচিক ব্যাপার! দাদা

গো! ভামির বাড়ী লুচি পুরির ভোগ দেওয়ার নাম আছে; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ শুধু—ভামিনী পাকের পূর্বে, নিজের পরিবার কএকটি এবং যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করে তাহাদেরই খাওয়ার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করায়। তৎপর—তাহার কিছু কিছু অংশ, একবার মায়ের ঘরে দেখাইয়া আনিয়া আপনারা খায়, এবং ঠিক ঠিক সেই নিমন্ত্রিত লোক কএকটিকে দেয়, কিন্তু তাহার নিয়ম আরও অধিকতর অদ্ভুত।

উহার বাড়ীতে, যাহাদের প্রণামী দেওয়া নাই, তাহাদের নিমন্ত্রণও নাই। কিন্তু প্রণামীও অংশই সকলে সমভাবে দিতে পারে না; সুতরাং চারি টাকা দুইটাকা এবং এক টাকা এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে। তন্মধ্যে, যে চারি টাকা প্রণামী দেয়, তাহাকে চারি আনা মূল্যের দ্রব্য খাওয়ায়, আর ৩৫০ আনা লাভ থাকে। যে দুই টাকা দেয়, তাহাকে দুই আনার খাদ্য দিয়া অবশিষ্ট ১৫০ আনা লাভ করে। আর যে একটাকা দেয়, তাহাকে ১০ আনার খাদ্য খাওয়াইয়া ৫০ আনা লাভ করে। আর যাহারা কিছুই দেয় না, তাহাদের “প্রবেশনিষেধ”। তবে যদি কাহারও অনুরোধ উপরোধে, একখানি টিকিট বাহির করিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহার সেই প্রবেশ মাত্রই ফল। এইরূপ ভোগের দ্বারা ভামুর প্রায় ৩০০ টাকা লাভ থাকে, এবং তাহার দ্বারা কতকগুলি বেছা এবং মনের কাজটা চলিয়া যায়। ইহাই ভামুর ভোগ।

কিন্তু অবলাচরণ চিরদিন পাড়ারগায়ে থাকে, কলিকাতায় কখনই যায় নাই। সুতরাং চক্ষুলাজ্জাটা একবারে এড়াইতে পারে নাই। এই জন্ত ভামুর তায় ভাতের ব্যবসায় করিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি উহার ভোগ মায়ের গ্রহণীয় হয় না। দাদা গো! অবলা অনেক গুলি ডাল চাল পাক করাইয়া থাকে, কিন্তু সমস্তই উফো এবং অপরিষ্কৃত, সুতরাং মায়ের ভোগে লাগে না, দেয়ও না কিন্তু কেবল যশঃখ্যাতির নিমিত্ত। কতকগুলি লোক জনকে তাহা খাওয়ায়। আর মায়ের নিমিত্ত কেবল ১১ সের আতপ চাল আর একপো ডাল এবং তিনখানি বেগুন ভাজা মাত্র হবিষ্যের ঘরে রাখাইয়া থাকে। তৎপর, ছাগলটাকেও “তুভ্যমহং সম্প্রদদে” বলিয়া বধ করিয়া নানা রসে, নানা রঙ্গে পাক করিয়া নিজেরা খায়। হতভাগার

সেই অর্থব্যয়ও হয় পরিশ্রমও হয়, তথাপি মাকে দেওয়া হয় না। মাকে কেবল এক মুঠো আলোচনের হবিষ্য দিয়াই সারে। অশ্রান্ত সকল প্রকার উপকরণ সম্বন্ধেও মাকে এইরূপ বঞ্চনাই করে। তৎপর উহার পুরোহিত ;— দাদা মহাশয় ! পুরোহিতের কথা আর বলিবার নয় ! অবলার বাড়ীতে হুজু পুরোহিত থাকে, কিন্তু হতভাগ্য অবলা, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া, যেটা অধিকতর মূর্থ সেই টাকেই মায়ের পূজক কার্যে নিযুক্ত করে, আর যেটা কিছু কম মূর্থ সেইটাকেই তন্ত্রধারক করে ; কিন্তু উভয়েই, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বা আচার নিষ্ঠার অণুমাত্র ধার ধারে না। দাদা মহাশয় ! এই হুজুনে একত্রিত হইয়া অবলার মণ্ডপে যাহা করে তাহা দেখিলে, এক সময়েই আদি, করুণ ও শাস্তরস ব্যতীত, আর ষট্‌রসেরই উদ্দীপনা হয়। উহা অতীব অদ্বুত ! দাদা গো ! ওদের সে দিনকর একটা কার্য শুনুন, তবেই সমস্ত মূর্থ বুঝিতে পারিবেন।

বোধনের দিন সন্ধ্যা বেলায় উহারা হুজুনে একত্রিত হইয়া বেলতলায় গিয়াছে, বোধনের উদ্যোগাদিও হইয়াছে। তৎপর তন্ত্রধারক পুথি খুলিয়া বলিল,—“ অথ রোধনং ” তৎপর, পূজক কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—“ হাঁগা ! একি বল্যে ? “ অথ রোধনং ? ” ইহার যে কোন অর্থই খুজিয়া পাই না ? তোমার বোধ হয় দেখতে ভুল হ'য়েচে, অথবা পুতিথেই অন্তর আছে। কিন্তু আমার বিবেচনা হয় ঐ “রো”এর পরের অক্ষর “ধ” নয়, ওটা “দ” হইবে, “ অথ রোদনং ” এইরূপ পাঠ হবে ; তা হলেই অর্থটাও বেশ বুঝা যায়।

তন্ত্রধারক। হ্যা তাতো বটে, “রোদনং এর অর্থটাতো সোজাই হয় বটে, কিন্তু এইরূপ পাঠটা যেন কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না ?

পূজক। তুমি উপবাসে ভুলে গিয়েছ, বাস্তবিক “রোদনং ” পাঠই ঠিক।

তন্ত্রধারক। তবে হবে কিন্তু তা কে ক'রবে ? কর্তা না পুরুত ?

পূজক। এ সকল ব্যাপার ইতিকর্তব্যতার মধ্যে গণ্য, উহা কর্তাই ক'রবেন, পুরুত কেবল মন্ত্র পড়ার দায়ী, অতএব কর্তাকে ডাক।

তন্ত্রধারক। ওরে ! কে আছিস, একবার বাবুরে ডাক, শীগ্‌গির ক'রে ডাক, সময় ব'য়ে যায়।

( পুরোহিতের ডাকে অগত্যা অবলাকে আসিতে হইল,  
এবং আসিয়া বলিল )—

অবলা। কি ঠাকুর! আমাকে কি ক'র্তে হবে?

তন্ত্রধারক। একটা কথা কি, শাস্ত্রে যা থাকে, তা ছোট বড় সকলকেই ক'র্তে হয়, তাতে মানাপমান বোধ কিছা লজ্জা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের উপরোধে রাণী স্বর্ণময়ীকেও “স্বর্ণময়ী দাস্তা” বলিতে হয়, আবার শাস্ত্রের সময়ে কুলবধূকেও স্বামীর নাম লইতে হয়—

অবলা। ও সকল বলতে হবে না, আমাকে কি ক'র্তে হবে তাই বলুন না?

তন্ত্র। না এমন বেশি কিছু না, তা অন্যো না শুনিলেও কোনরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়; এই পূজার কাছে ব'সে, আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ একটু রো—রো—রোদন ক'র্তে লেখা আছে।”

দাদা মহাশয়! তন্ত্রধারকের এই কথা শুনিয়া অবলাচরণ নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিল, বাড়ীতে তুমুল হুলস্থূল পড়িল। অন্তঃপুরে তব্ব গেল, তখন গোব্রাহ্মণ বধভীরু অবলার মাতা “কি হয়েছে কি হয়েছে” বলিতে বলিতে দৌড়িয়া বিশ্বমূলে আসিলেন এবং আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া মনে করিলেন “এখন পুরোহিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে “কুল পুরোহিত” থাকে না, অবলা এখনই উহাদিগকে তাড়ায়ে দিবে, কুল পুরোহিত পরিত্যাগ মহাপাপ, অতএব পুরোহিত রক্ষা করাই ক'র্তব্য” এই স্থির করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ,—তাইতো, একটু কা'ন্তেইতো হয়! আমি চিরদিন দেখেছি একটু কা'ন্তেই হয়, পুরুত ঠাকুর (অদৃষ্টের) লেখা কথাই ব'লেছেন, তোমরা মিছা গোল ক'রো না। কিন্তু যার নামে সঙ্কল্প হয় তাকেই কা'ন্তে হয়। ক'র্তার মৃত্যুর পর আমার নামেই সঙ্কল্প হয়, সুতরাং আমিই চিরদিন কেঁদে থাকি এবারও আমাকেই কা'ন্তে হবে। তোমরা ওদিক্ যাও” এই বলিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া “নাতিভীত ভীতিমূহ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন পুরোহিতদ্বয়ের বিদ্যাভিমান জলচ্ছিৎ হইয়া উঠিল এবং পরস্পরে চুপেচুপে বলিতে লাগিলেন।

পুরোহিতদ্বয়। দেখ তাই, যদি কা'ন্তে না বলতেম তবে সর্বনাশ ঘটত, “পূজার অঙ্গহীন” হয়েছে বলে এখনই অবলার মা



এসে কত তিরস্কার ক'র্তো । আজ ঈশ্বর বড় রক্ষা ক'রেছেন,” ইত্যাদি ।

এমন সময়ে আমার পুরোহিত ভট্টাচার্য মহাশয় এখানে আসিতে ছিলেন, তিনি হঠাৎ ওখানে ক্রন্দন শুনিয়া ত্রস্তভাবে গিয়া বলিলেন,—

ভট্টাচার্য ।—এ কি ? কি হ'য়েছে ? হঠাৎ কান্নাকাটা কেন ? কোন ছেলেপিলের কোন বিপত্তি হয়েছে কি ?

পুরোহিতদ্বয় ।—না মহাশয়, না, কোন বিপদ না, অবলা বাবুর মা পূজার কান্নাটুকু কান্দছেন ।

ভট্টাচার্য ।—পূজার কান্না !—তোমরা হুজুদ পুরোহিত হ'য়েছ ব'লে কান্না ?

পুরোহিতদ্বয় ।—আপনি প্রাচীন লোক, বিজ্ঞপ করা আপনার ভাল দেখায় না । পুথির সর্ব প্রথমেই “অথ রোদনং” লেখা নাই কি ?

ভট্টাচার্য ।—সে “রোদনং” বজ্রমান পুরোহিত উভয়ে মিলে ক'ন্মেই তো উচিত হয় ।

পুরো ।—( সরোবে ) আপনি বারম্বার বিজ্ঞপ ক'চ্ছেন কেন ?

ভট্টাচার্য ।—হতভাগ্য ! ওটা “অথ রোদনং” নয়, ওটা “অথ বোধনম্”; “ইহার পর দেবীর বোধন বিষয় বলা যাইতেছে” ইহাই ঐ কথার অর্থ ।

পুরো ।—আমরা বালককাল হ'তে শুনে আছি যে “বেদে উহা নাই” অতএব আপনার কথানুসারে পুথিকাটিতে পারিব না ।

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় আর কিছু না বলিয়া অবলার পূজার দশা চিন্তা করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন ইহাই অবলার পূজা ! \*

নবমী পূজার এই পর্বান্ত সমাপ্ত হইয়াই এ প্রবন্ধ এখানেই শেষ হইল । কারণ এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে বিশেষরূপ সংবর্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । এখন যদি পুস্তক হইতে কাটিয়া বেদব্যাসে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা যায় তাহা দেখিতে ভাল বোধ হয় না । সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়াই এ প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ করিলাম ।      বে: সং ।

\* এই প্রসঙ্গের মূল বর্ণিত সভা, এবং ইহার সমজাতীয় ঘটনা অনেক হাদেই ঘটয়া থাকে সুতরাং ইহাতে সমস্তের প্রকৃত চিত্রই প্রদর্শিত হইল, অতএব রহস্য মনে করিবেন না ।

## প্রাতঃকৃত ।

( অনুষ্ঠ )

পৃথিবীর উপর প্রথম পদক্ষেপের পূর্বে “প্রিয়দত্তারৈ ভূবে নমঃ” এই বলিয়া নমস্কার করিবার তাৎপর্য আছে। পার্শ্বভৌতিক মানব-দেহে পার্থিব উপাদানই প্রধান বা সর্বাধিক এবং বহুধা মাতা মানব শরীরাবস্থানের একমাত্র অবলম্বন ও জীবিকা নির্বাহের মুখ্য উপায়। আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে শয্যাশয়ন পর্য্যন্ত অনন্তোপায় হইয়া সেই পৃথিবীর উপর পাদ তাড়না করিয়া থাকি। রজনীতে শয়ন সময়ে সেই অপরাধের ক্ষণমাত্র অবসান হয়, আবার প্রতি প্রাতঃকালে তাহার প্রত্যারম্ভ হয়। বহুধা মাতা ক্রমাশীলা জননীর দ্বায় সর্ব্বংসহা হইলেও অপরাধের সূচনায়ই অণুমাত্র পরিহার স্বরূপ নমস্কার করা বিধেয়। উক্তমন্ত্র মাতৃ-পুত্রভাবে পরিচায়ক বটে। প্রিয়দত্তার অর্থ (প্রিয়ায় স্নিহায় অপত্যায় দত্তা ত্যক্তা) প্রিয় সন্তানের জন্ত আত্ম-ত্যাগিনী।

কৃতজ্ঞ,—হৃদয়ে সেই ধরা দেবীকে নমস্কার করা কর্তব্য। আধ্য-গণ আরও জানিতেন এই প্রকাণ্ড পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত ও অপরি-চ্ছিন্ন সৃষ্টিাদি প্রকট পদার্থ সমুদায় জগন্ময় ভগবানের একটি একটি উৎকর্ষ শক্তি কর্তৃক অধিকৃত, তাহাই অধিদেবতা পদ বাচ্য। যেমন মৃদাদি অচেতন বস্তুর সমষ্টি স্বরূপ জড়দেহ সঞ্জীবনী [শক্তি কর্তৃক পরিচলিত এবং সেই শক্তি সকলের কার্যের লক্ষ্য ও মৃদাদি জড়পিণ্ড নহে। তদ্রূপ পৃথিব্যাदि জড় বস্তুস্থিত অধিদেবতা আমাদেরিগের অভিবাদনের উদ্দেশ্য। সেই প্রাণি দেহস্থ জড়পিণ্ডের প্রতি অত্যাচার বা সদাচরণ করিলে সঞ্জীবনী শক্তির রোষ বা তোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্থূল পৃথিব্যাदि যন্ত্রের প্রতি কোন আচরণ করিলে তদীয় অধিদেবতা রোষ করেন। এই জন্ত শাস্ত্রে পৃথিব্যাদি মহাভূতকে দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তিভেদ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। মনুষ্যাদি জন্ম শরীরে সঞ্জীবনী শক্তি বাত্শ স্থূল দৃষ্টিতে অনুভূত হয়, বুদ্ধাদি উন্নিদে তদ-গোচর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থূল

পদার্থের অধিনায়িকা শক্তির অনুভবে আরও হৃদয়তম দৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, সেই জ্ঞান সাধন সাপেক্ষ ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নলাদি রাজর্ষিগণের নাম কীর্তনের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন কি ? ক্রমে তাহার নির্দেশ করা বাইতেছে।

(১) মানসিক, বাচনিক ও কার্যিক এই তিন প্রকার সাধন। তন্মধ্যে নামকীর্তন,—স্তব পাঠাদির দ্বারা বাচনিক সাধন সম্পাদন হয়। শাস্ত্র বলেন—

“মনসা সংকল্পয়তি, বাচাভিলপতি, কৰ্ম্মনাচোপ পাদয়তি”

হারীত সংহিতা।

(২) শেযোক্ত উপায়দ্বয় দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ করাই মুখ্য লক্ষ্য। নামকীর্তন, স্তব পাঠাদির দ্বারা তদীয় মহিমা হৃদয়াকর্ষী হইয়া তাহার বিরক্তি করিয়া দেয়। অমনসি লোকের শুদ্ধ স্মরণ হওয়া দুর্ঘট। অর্থ-গ্রহ ও মধুর স্বর সংযোগে পাঠ বা কীর্তন করিলে সাধারণের সেই লক্ষ্য দেবতা বা দেবোপম মানুষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবেই, গান তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। শাস্ত্রে বিম্পষ্টতা, স্থিরভাব কলসুর সংযোগ, অর্থবোধ ও তন্মনস্কতা সহকারে পাঠের ব্যবহার উল্লেখ আছে।

“বিশ্পষ্টমদ্রুতং শাস্ত্রং সপষ্টাক্ষর পদং তথা। কলসুর সমায়ুক্তং রসতাব সমন্বিতম্। বুধ্যমানঃ সদা শুদ্ধো গ্রহার্থ্য কল্পশৌনপঃ”

ভবিষ্য পুরাণ।

“শুদ্ধেনানন্ত চিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।

নকার্য্যাসক্ত মনসা কার্য্যঃ স্তোত্রস্ত বাচনম্”

মংস্ত হৃত ও বারহী উক্ত।

(৩) সুসুরাদি সংযোগে নাম কীর্তনাদি দ্বারা যে কেবল উচ্চারণিতার মনে ভক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, প্রোত্ত্বগণের ও চিত্ত বৈচিত্র্য হইবেক। যিনি বারাণসীতে ভগবান বিশ্বনাথের সান্ধ্য আরতি গাথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি এই রহস্তের মৰ্ম্ম বিশেষ প্রকারে বুঝিবেন।

এই জগৎ পার্থিব দেবতা ও নর চরিতের চরমোৎকর্ষ আদর্শ রাজর্ষি নল, কার্তবীৰ্য্যার্জুন, যুধিষ্ঠির ও নারীরত্ন দময়ন্তী প্রভৃতির প্রতি প্রাতঃ-কালে শষাভ্যাগ পূর্বক বহির্দেশে আসিয়া নাম কীর্তনের বিধান হইয়াছে।

এতদ্বারা গৃহপতি কেবল মাত্র স্বয়ং উপকার লাভ করিবেন না, কিন্তু সংসার ভুক্ত পুরুষ ও নারীদিগকে অলৌকিক চরিতের প্রগাঢ় শিক্ষা দিবেন । উচ্চৈসূত্রে উচ্চারণকে কীর্তন বলে ।

“কক্কেটিকস্ত নীগস্ত দময়ন্ত্যা নলস্যচ”

ঋত পৰ্ণস্ত রাজর্ষেঃ কীর্তনঃ কলিনাশনম্ ॥”

মহাভারত ।

“কার্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বাহু সহস্রভুং ।

যোহস্ত সংকীর্তয়েন্নাম প্রোতরুথায় মানবঃ ।

নতস্ত বিস্তনাশঃ স্মারষ্টক লভতে পুনঃ ॥”

মৎস্ত পুরাণ ।

যিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে, রাজর্ষি নল কতদূর চরিতোৎকর্ষশালী ছিলেন । এইজন্য তাঁহাকে পুণ্যশ্লোক বলিত । যিনি শত সহস্র অশান্তির কারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অপ্রহতচিত্তে কেবল সহিষ্ণুতা গুণ ও ধর্মের বশবর্তী হইয়া কলি বা অশান্তির অধিনায়ককে জয় করিয়াছিলেন, তিনি কি সাধারণের আরাধ্য বা অনুকার্য্য নহেন ? যিনি দিক্‌পালগণের দৌত্য অনুরোধে হস্তগত নারীরত্ন দময়ন্তীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নল কি মানুষ ? যে দময়ন্তী দিক্‌পালগণকে ও উপেক্ষা করিয়া পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে মনুষ্য নলে অনুরক্তা ও তন্নিমিত্ত অশেষ দাতনা ভোগ করিতেও অকুণ্ঠিত, তিনি কি সতীগণের শির স্থানীয় নহেন ? কলি কেবল নল ও দময়ন্তীর নিকটে পরাজিত নহে, কিন্তু তদীয় বিপদঙ্গু কৃতজ্ঞ কক্কেটিক ও রাজর্ষি ঋতপর্ণ ষটিত উপাখ্যান যেখানে আলোচিত হইবেক্ সেইখানে কলহদেবের বাইবার অধিকার নাই । কলি শব্দের অর্থ—কলহ বা অশান্তি, তাহার অধিদেবতা বলিয়া চতুর্থ যুগরাজ কলি নামে অভিহিত ।

“তদর্থ মত্যাৰ্থ কলি বভূব” ।

বিষ্ণুপুরাণ,

এইজন্য কলিশব্দ কলহার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । আৰ্য্যগণ একান্ত শান্তি পরায়ণ ছিলেন । শান্তির পূর্ণাবস্থাই মুক্তি ।

“শান্তি মাশ্রোতি নৈষ্টিকীম্ ।”

ভগবদ্গীতা ।

এইরূপ শান্তি বিধবধি—কলি-জরী-ব্যক্তি কি আৰ্য্য গৃহে প্রোতঃস্বরণীয় নহেন ? কলি যে সকল আপদের অভিনেতা ; অহুদিন তাহাকে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। ছন্দোপ পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে।

“প্রোত্রিষ্য হৃতগা মগ্নি গার্কোবাগ্নিচিত্তস্তথা।

প্রাতরুখায় যঃ পশ্চেৎ আপদাতাঃ সবিস্মৃতাতে ॥

পর্ণপিঠং হৃতগোঃ মদ্যং নম্নমুৎকৃত্ত নাসিকং।

প্রাতরুখায় যঃ পশ্চেৎ তৎকালে রূপ লক্ষণম্ ॥”

বেদবিৎ ও কৰ্ম্ম নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সতী স্ত্রী, মানব জাতির চির জীবনের উপকারী এবং শান্ত পশু গরু, আৰ্য্য সম্ভানগণের সকল সংস্কার ও ব্যবহারের প্রধান সাধক ; গুরু হানীয় অগ্নি এবং সেই অগ্নি সিদ্ধ বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রোতঃকালে দর্শন করিলে আপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেক। প্রোত্রিয়াদি দর্শন করিলে মনে শান্তি বা শুদ্ধভাবে উদয় হয় না কি ? পক্ষান্তরে কলি সহচর বা অশান্তির উদ্দীপক যের পাপাসক্তজনগণ, অসতী স্ত্রী, মানসিক বিকার বর্ধক বিবসন ও নাসিকা বিহীন ব্যক্তিকে দেখিতে নিষেধ আছে।

আমরা অনেক পূর্বে বলিয়াছি যে, আৰ্য্যগণ সূৰ্ণ ও সংসার, ধন্য ও কাম, যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্য প্রয়োগ পরায়ণ ছিলেন এবং প্রতিরূপে তজ্জপ শিক্ষা দিতে বাঞ্ছা ছিলেন ॥ সেই জন্ত আৰ্য্য শাস্ত্রে প্রোতাহ অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রবল পরাক্রমশালী ও ধন্য প্রাণ.নলাদি রাজর্ষি (রাজা-অধিষ্ঠান ঋষিগণের নাম কীর্তনের ব্যবস্থা।

রাজর্ষি কার্তবীৰ্য্যার্জুন এই নিমিত্তই প্রোতঃকীর্তনীয়।

কার্তবীৰ্য্যের কীর্তি সম্বন্ধে পূর্বাচার্য্যগণ—যাহা বলিয়াছেন—তাহা এই।

“নন্দনঃ কার্তবীৰ্য্যস্ত গতি যান্তস্তি পার্থিবাঃ। বজ্রৈর্দানৈ স্তপোতিৰ্কী।  
প্রাক্রয়েণ ক্রতেন বা ॥ ১ ॥” আবার

“সংগ্রাম নিৰ্কিষ্ট সহস্র বাহঃ অষ্টাদশ বীপ নিখাত যুগঃ।

অনন্ত সাধারণ রাজ শব্দো ; বভূব যোগী কিল কার্ত বীৰ্য্যঃ ॥ ১।

এইরূপ বাহ ও আন্তরিক সম্পত্তির অধিকারী কার্তবীৰ্য্য বাহার অহুকার্য্য, তাহার সম্পত্তির কি বিপত্তি আছে?

ক্রমশঃ

## আত্মা ।

আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় দার্শনিক দিগের মতামত তুলনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

মিল, বেন, হিউম প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা কেবল অনুভূতি সমূহের সমষ্টি (Series of the states of consciousness) আত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত নহেন । এই সঙ্গে তাঁহারা একটি গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন যে বর্তমান বিষয়মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে । কিন্তু যদি আত্মাকে অথবা “আমাকে” কেবল অনুভূতির সমষ্টি বলা যায় তবে অনুভূতির সমষ্টি কিরূপে গতবিষয় “স্মরণ” করিয়া থাকে, কিরূপেই বা ভবিষ্যত বিষয় “আশা” করিতে পারে । “consciousness is only present, how can it expect & remember” মিল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি এই প্রবন্ধের সীমাংসা করিতে অসমর্থ । দার্শনিক গণের মতে “আত্মা কি” ইহা স্থির হইল না । জার্মান দেশীয় প্রধান দার্শনিক ক্যান্ট আত্মাকে আর একপদ উর্দ্ধে তুলিয়াছেন । ক্যান্ট বলেন যে আত্মা কেবল অনুভূতি সমূহের সমষ্টি নহে । কিন্তু যে অন্তর্নিহিত শক্তি মনের সমস্ত কার্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে এই সমস্ত মানসিক কার্য “আমার” তাহার নাম আত্মা । “State of consciousness belong to me; this uniting principle or the Synthetic unity of apperception is আত্মা ।

ক্যান্ট ইহার অধিক স্বীকার করেন নাই । তাহার মতে আত্মা যে আছে এইটুকু মাত্র আমরা অনুভব করিতে পারি । কিন্তু আত্মার স্বরূপ কি, কিরূপে আত্মার কার্য হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি মানবের আদৌ নাই । শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মাত্র আমরা প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে নানাবিধ ভ্রমে পতিত হইতে হয় । ইংলণ্ডে ক্যান্টের একদল শিষ্য আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মা সম্বন্ধে আরও অধিক স্বীকার করিয়া

ছেন। ম্যানসেল বলেন, যে, আমরা যে কেবল মাত্র আত্মার অস্তিত্ব মাত্র জানি এরূপ নহে, আমরা আত্মার স্বরূপও কতক অংশে নির্ণয় করিতে পারি। অর্থাৎ আত্মা যে নিজেকেই নিজের বিষয়, নিজের কার্য্য জানিতে পারে, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি (self is conscious of its own nature)। জর্মন দেশীয় আর একজন পণ্ডিত উপরোক্ত মতের বিরোধী। ইউবারভেগ বলেন যে মানসিক কার্য্যের অনুভূতি মধ্যে একটি আর একটিকে অনুভব করে এই কথা বলা যায় না। এখানে কর্তা কর্ম্মের প্রভেদ নাই, যিনিই অনুভব করিতেছেন তিনিই অনুভূত পদার্থ। অর্থাৎ অনুভব কর্তা ও অনুভূত বিষয় মানসিক ব্যাপার, দুই এক, (In internal perception there is no distinction between subject and object &c)। দর্শন ও দৃষ্টে কর্তা ও কর্ম্ম; অনুভব কর্তা ও অনুভূত পদার্থ, এইরূপ প্রভেদ আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুভূতিতেও হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন আমি আমার নিজের অভ্যন্তরিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তখন যিনি দর্শক তিনিই দৃষ্ট বস্তু। কিন্তু যখন বহির্জগতের কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন দর্শক ও দৃষ্ট বস্তুতে পার্থক্য থাকে। আমি দর্শক এবং বস্তু দৃষ্ট পদার্থ। কিন্তু এখানেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে আমি ও আমার ক্রোধ এক বস্তু নহে; আমি দর্শক আমার ক্রোধ দৃষ্ট পদার্থ। উদ্যুবারবেগ এইরূপ প্রভেদ স্বীকার করিয়াও প্রমাণ করেন যে ক্রোধ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যে মুহূর্ত্তে ক্রোধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে সেই মুহূর্ত্তেই ইহা আত্মার অংশ হইয়া যায়। যখন ইহা আত্মার অংশ হইয়া যায় তখন এই পূর্ণ আত্মা আপনার অংশকে (যাহাকে ক্রোধ বলা হইয়াছে) অবলোকন করিতে থাকে। এইরূপে আত্মা প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও সমস্ত মানসিক পদার্থ এই আত্মার মধ্যে বীজ রূপে নিহিত থাকে, তথাপি আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুস্থ বিষয় গুলি ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইতে থাকে। এই কারণে এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর ন্যায় আত্মাও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বাহ্য হউক এক্ষণে বিলিতি

মতে দেখান গেল কিরূপে আত্মা নিজের অস্তিত্ব ও কার্য অনুভব করে। ঐগ দেশীয় দার্শনিক প্লেটো জার্মান দেশীয় হেগেল আত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলিয়াছেন তাহা এখানে বিচার করিবার আবশ্যিক নাই। আমরা সংস্কৃতমতে আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে আত্মা,

(১) অনুভূতি সমষ্টি।

(২) কেবল অনুভূতির সমষ্টি নহে কিন্তু মানসিক কার্য সমূহ আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে শক্তি তাহাই আত্মা। ইহার অস্তিত্বমাত্র আমরা জানিতে পারি।

(৩) শুদ্ধ অস্তিত্ব জানিতে পারি এরূপ নহে, কিন্তু আত্মা নিজে নিজের কার্য অবলোকন করে।

(৪) আত্মা ও আত্মার কার্য দুই বস্তু নহে, আত্মা তাহার অনুভূতির বস্তুকে নিজের অংশ করিয়া লইয়া তাহাই অবলোকন করে ইহা সত্যত পরিবর্তনশীল।

এই সমস্ত মতের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃত দার্শনিকেরা কত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উঠিতে হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে মন, পরে অহংকার, পরে বুদ্ধি ও সর্বশেষে আত্মা আমাদের চিন্তার পদার্থ। এই আত্মার অন্ত নাম পুরুষ।

একগে দেখা যাউক ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রে কি প্রমাণ আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই গুলি মন, রজ ও তম গুণের কার্য। যাহাতে এই ভিন্ন গুণ আছে তাহাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই তিন গুণ একত্র আছে বলিয়া প্রকৃতি সংঘাত পদার্থ। প্রকৃতি সংঘাত পদার্থ মাত্রই পরার্থ। অর্থাৎ গৃহ শয়্যা, প্রভৃতির ন্যায় ইহারও ভোক্তা আছে। অতএব এই পর অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, ইহারই নাম-আত্মা।

দ্বিতীয়তঃ বোধ্য হয় ইহাও বিজ্ঞান বলে দেখান যায় যে উত্তম, মধ্যম, ও অধম গুণত্রয় যদি সমান ভাবে একত্র



করা যায় তবে কোন গুণেরই কার্য্য হইতে পারে না । একান্ত সত্ত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থার কোন কার্য্য হইতে পারে না । কেবলমাত্র উগাদের বৈষম্য হইলেই কার্য্য হইতে পারে । বাহার অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় ঘটয়াছে তাহাই আত্মা বা পুরুষ । এই অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিই প্রধান প্রমাণ । কিন্তু বাহার্য্য যুক্তি ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না তাহাদের জন্য আরও অনেক প্রমাণ আছে । সময়াস্তরে আমরা ইহার শাস্ত্রীয় বিচারে যত্নবান হইব ।

আর্য্যগণ আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরে যুক্তি তর্ক দ্বারা আভাস্তরিক জগতের সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছেন । কিরূপে আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও ভোক্তা ও কিরূপে ইহা সচ্চিদানন্দ, ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন । এই সমস্ত বিষয় এতদূর সূক্ষ্ম যে স্কুলদণ্ডী ব্যক্তি গণের নিকট ইহার সমস্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । বর্তমান অল্প হিন্দুসম্প্রদায়ের ইউরোপীয় সভ্যতা চক্ষু ফুটাইতেছে, কাজেই তাহাদের দৃষ্টি স্থল । স্থল দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বিষয় দেখা যায় না ।

## জাতিভেদ ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

অতএব জাতিভেদ সম্বন্ধ লইয়া মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ঠ চিন্তা করা অতীব হান্স জনক । সিংহ ব্যাঘ্র ও গর্দভ প্রভৃতি পৃথক জাতিভেদ থাকিতে জগতের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ সিংহ ব্যাঘ্রাদিরা প্রাণী হিংসা দ্বারা জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং উহাদের পৃথক অস্তিত্ব না মানিয়া কেবল একই গর্দভ জাতিই মানা বিধেয় ; তাহা হইলে জগতের উপকার হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমন, আর ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ থাকিলে জগতের অনেক অনিষ্ট

হয়, অতএব উহা না মানিয়া কেবল জগতে এক জাতিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলাও তজ্জপ।

এখন আমাদের দেখা আবশ্যক যে কোন সহজাত স্বভাব, কোন অপবিহার্য গুণ, কোন ইতর ব্যবর্তক প্রকৃতি, কোন একতাবোধক শক্তি দ্বারা (যাহাকে জাতি বলিয়া লক্ষ্য করা যায়) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি পৃথক পৃথক জাতীয়।

শাস্ত্রে প্রথমে সাধারণ মনুষ্যকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অবশ্য এ বিভাগেও মূল কারণ,—গুণগত। আৰ্য্য দৃষ্টি সর্বাবস্থায়ই গুণেরই পক্ষপাতি! স্থূলত তাঁহারা আবার এই গুণকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্ত্বং রজঃ স্তম্ভ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সত্ত্বা ॥

নিবন্ধন্তি মহাবাহো দেহি দেহি নমব্যয়ম্ ॥

গীতা

আবার যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন,

চাতুর্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণ কৰ্ম্ম বিভাগশঃ ।

এবং মন্বাদি ধৰ্ম্ম শাস্ত্রে ও যখন উহারই সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় তখন আর আৰ্য্য শাস্ত্র, যে, সৰ্ব্বথা গুণেরই পক্ষপাতি ইহা প্রমাণ করিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না।

এই গুণত্রয়রই আবার চারিটি অবস্থা শাস্ত্রকাবগনই নির্ণয় করিয়াছেন।

১ম। সত্ত্ব বহুল।

২য়। রজঃ বহুল।

৩য়। রজঃ ও তমঃ বহুল।

৪র্থ। তমঃ বহুল।

১ম। অতিশয় শাস্তি, সন্তোষ, বিবেক শক্তি, বৈরাগ্য শক্তি, উদাসীনতা উদারতা প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন অবস্থা,—সত্ত্বগুণ বহুল।

২য়। ভোগলিপ্সা সম্পন্ন,—রজোগুণ বহুল।

৩র্থ। ভোগলিপ্সা দ্বারা বিমুক্ত ও অন্ধ,—তমোগুণ বহুল।

৩য়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অবস্থার মধ্যম অবস্থাপন্ন,—রজ-  
ন্তমো বহুল ।

এই চারি প্রকার স্বভাব হইতে মনুষ্য শরীরে চারি প্রকার  
প্রকৃতি গঠিত হয়। শাস্ত্রমতে বিভিন্ন প্রকৃতিই আকৃতি-পার্শ্ব-  
কোর কারণ। সুতরাং তদ্বারা আকৃতির ও কিছু কিছু পার্শ্বক্য  
হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ও বৈলক্ষণ্য হইয়া  
থাকে।

কি প্রণালীতে গুণভেদে আকৃতির পার্শ্বক্য হয় তাহাও  
মহাত্মাগণ সুবিস্তার মতে বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে  
প্রকৃতি সর্বদাই নিজ ক্রিয়ার অনুকূল পরমাণুর আকর্ষণ করিয়া  
থাকে। সুতরাং মানব যখন যেকোন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া  
থাকে তাহার দেহীয় পরমাণু সকলও সেইরূপ প্রকৃতির অনু-  
মোদিত হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই পরমাণুর পরিবর্তন সংঘ-  
টন হইলে আকৃতিরও পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবি। সুস্বদর্শী আর্ষ্য-  
গণ এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা  
করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্বে মনুষ্যকে যেকোন প্রকৃতিগত চারি ভাগে  
বিভক্ত করিয়া আশিলাম উহাদের আকৃতিগতও তদ্রূপ যে  
সমস্ত পার্শ্বক্য আছে এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

১ম। সদ্ভাষিক প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের জ্ঞাপক স্নায়ু  
মণ্ডলের কাব্য উত্তমরূপে ও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া  
ইহারা স্নায়ুমৎ প্রকৃতির।

২য়। রজাধিক প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের রক্তের মধ্যে  
লৌহাদি সার পদার্থ অধিক থাকে এবং রক্তের ও পরিমাণ  
অধিক,—ইহারা রক্তীয় প্রকৃতির।

৩য়। রজন্তম বহুল মানবের শরীরে পিত্ত অধিক থাকে,  
সুতরাং ইহারা পিত্তাধিক প্রকৃতি।

৪র্থ। তমো বহুলতা প্রযুক্ত বাহাদেব শরীরে, রসমধিক  
শিরা বিশেষ অধিক পরিগৃহ্য তাহারা রসবৎ প্রকৃতি।

ক্রমশঃ ।



২য় ভাগ।

সন ১২৯৪ সাল।

১২শ খণ্ড।

## অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট সম্বন্ধে আজ কাল নানা প্রকার বাদ বিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত লোকেরা বলিয়া থাকে “অদৃষ্ট মানে কপালের লেখা, আমাদের যাহা কিছু হইতেছে ও হইবে, সমস্তই বিধাতা কর্তৃক কপালে লিখিত আছে। সেই লেখা বা অদৃষ্ট ব্যতীত কখনই কাহার কিছু হইতে পারে না।” আবার শাস্ত্রদর্শীগণের মধ্যে আধুনিক নৈয়ায়িকগণ বলেন, “অদৃষ্ট আশ্চর্য এক প্রকার গুণ বিশেষ, উহা কর্মমাত্রেরই কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে কোন বস্তুর যে কোনরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই অদৃষ্ট-জনিত। কুন্তকার যে ঘট্টে উৎপাদন করিতেছে, তাহার কারণ আমাদের অদৃষ্ট, তন্তুকার যন্ত্র বয়ন করিতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট, কর্মকার হল গড়িতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট; বুড়ি, বাঙা, শীত, গ্রীষ্মাদি হইতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট; এবং মৃত্তিকা প্রস্তুত হইতেছে, প্রস্তর মৃত্তিকার পরিণত হইতেছে ইত্যাদি সমস্ত কার্যেরই কারণ আমাদের অদৃষ্ট। আমরা যে হস্ত পদাদির পরিচালনা করিতেছি, কিম্বা জন্তু, পক্ষী

নিষ্ঠীবন, ও শিরঃকম্পনাদি করিতেছি তত্‌সমস্তেরই কারণ আমাদের অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ব্যতীত কখনও কাহার কিছু হইতে পারে না।” আবার পাশ্চাত্য প্রভাব প্রদীপ্ত নব্য সপ্রদায় বলেন, ‘অদৃষ্ট একটা ভূয়ো কথা, উহা দুর্বল হৃদয়ের কল্পনা প্রসূত মিথ্যা সংস্কার মাত্র। এই মিথ্যা-সংস্কার থাকিতে সমাজের ষোর অনিষ্ট হইতেছে, সমাজ দিন দিনই অবনত হইতেছে, পুরুষকারি শূন্য হইয়া অকর্মণ্য ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অতএব এই সর্বানর্থের মূলভূত অদৃষ্ট না থাকে এবং না মানাই ভাল। এই প্রকার আরও অনেক প্রকার বাদ বিবাদ আছে। আমরা মনে করি, অদৃষ্টের প্রকৃততত্ত্ব অজ্ঞাত থাকাই এই সকল বিবাদের মূল। ঐতিহ্য দর্শন প্রসিদ্ধ অদৃষ্টতত্ত্ব সকলে পরিজ্ঞাত থাকিলে বোধ হয় এই বিবাদ থাকিতে পারে না। এজন্যই আমরা অদৃষ্টের তত্ত্ব বাহা জানি, সাধারণকে নিবেদন করিতেছি।

অদৃষ্টতত্ত্বের পর্যালোচনার পূর্বে ধর্ম্যধর্ম্মের লক্ষণ অবগত হওয়া আবশ্যিক, কারণ অদৃষ্ট ধর্ম্ম্যধর্ম্মেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র। বৈশেষিক দর্শনে বলেন “যতোভ্যদয় নিশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ” যে শক্তি বা গুণ বিশেষের দ্বারা আত্মার সদগতি এবং পরমেশ্বরের সহিত একাত্মা হইয়া যায় তাহার নাম ‘ধর্ম্ম’। এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলাতে অধর্ম্মের লক্ষণও সূচিত হইল, বাহা ধর্ম্মের বিপরীত তাহাই অধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্মশব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে,—অর্থাৎ যে শক্তি বা গুণ বিশেষের দ্বারা আত্মা অধোনত হয় এবং ঐশ্বর হইতে দূরবর্তী হয় তাহারই নাম “অধর্ম্ম”। এই হইল বৈশেষিক দর্শনোক্ত ধর্ম্ম্যধর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু এতদ্বারা ধর্ম্ম্যধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটি কি তাহা কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

ভগবান্ কনাদ ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন না কেন? ইহার স্বরূপের কোন নাম নাই, এ নিমিত্ত করিলেন না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম মূলে এক একটা মাত্র পদার্থ হইলেও, ইহাদের অপরিসংখ্যের প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং তাহার নাম হইতে পারে না। তবে সেই মূল পদার্থের নাম আছে বটে, তাহা বুঝান যাইতে পারে। ধর্ম্মের মূল অবস্থার নাম সত্ত্বগুণ, অধর্ম্মের মূল অবস্থার নাম রজোগুণ এবং তমোগুণ। ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন “ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগঃ ঐশ্বর্যং।

মাস্তিকমৈত্রেয়ঃ তামসমস্মাদ্বিপরীতঃ ।” (সাম্বিকারিকা) ধর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য এবং অনিমাди ঐশ্বর্য, সত্ত্বগুণের কার্য; আর অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্যাদি তমঃ এবং রজোগুণের কার্য ।” মূল বীজ স্বরূপ সত্ত্বগুণ হইতেই সমস্ত ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে । এবং রজঃ আর তমোগুণ হইতেই নিখিল অধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে, এজন্ত সমস্ত ধর্মের সমষ্টির নাম সত্ত্বগুণ এবং নিখিল অধর্মের সমষ্টির নাম রজঃ আর তমঃ ।

এখন সত্ত্বগুণাদিরও কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । “সত্ত্বং লঘু প্রকাশ মিষ্টং উপষ্টককলঞ্চ রজঃ গুরু বরণ কমেব তমঃ” (সাম্বিকারিকা) । যে শক্তি বা গুণটী থাকিলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার লঘু লঘু ভাব—হালকা হালকা ভাব অনুভূত হয়, আত্মার জড়তা, মলিনতা নিরাস্তি হইয়া, এক প্রকার প্রকাশভাব—নির্মলভাব অনুভূত হয়, এবং সমস্ত কুপ্রবৃত্তির বিনাশ হইয়া অন্তরে অন্তরে আত্মতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, অপরিমিত তৃপ্তি বা শান্তি স্থলের অনুভব হয়, যাহা আর কিছু অধিক সময় থাকিবার নিমিত্ত মনে মনে আগ্রহ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি । আর যে গুণ বা যে শক্তি সমুদ্ভিক্ত হইলে আত্মার বিকোভ উপস্থিত হইয়া বহিমুখীন গতি হয়, নানাবিধ ভোগ্য বিষয়ের দিকে গতি হয়, পার্থিব পদার্থের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ হয় এবং অন্তরে এক প্রকার তাপ এক প্রকার দুঃখ এক প্রকার অশান্তির অনুভব হয়, তাহাই রাজোগুণ বা রজঃ শক্তি । যে শক্তি বা যে গুণ বিশেষ সমুদ্ভিক্ত হইলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার গুরুত্ব-এক প্রকার ভারি ভাব অনুভূত হয়, আত্মার আন্তরিক দৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া অভ্যন্তরে অন্ধতা উপস্থিত হয়—হিতাহিত বোধ বিরহিত হয়, তাহাই তমঃশক্তি । কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ কিছুই বুঝা যাইতে পারে না, যাহা বিশেষরূপে বুঝা না যায় তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা অসম্ভব । অতএব ধর্ম্মের গ্রহণ এবং অধর্ম্মের পরিত্যাগও অসম্ভব । এজন্ত অপরিসংখ্যেয়-ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশক নাম করা হইয়াছে । তাহাতেই—“বুতিঃ ক্রমাদমোহস্তেষু শৌচমিত্তিয় নিগ্রহঃ । বীর্জিদ্যা সত্য মক্রো-ধোদশকং ধর্ম্ম লক্ষণং ।” বহু । বুতি, ক্রমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইতিয়-

নিগ্রহ, বীৰ্য্যক্তি, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্লোষ প্রভৃতিকে ধর্মের লক্ষণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতক গুলি মুখ্যমুখ্য ধর্মের নাম করা যায়, যথা, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য়, অনুরাগ, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, শাস্তি, সন্তোষ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত আর যে সকল ধর্ম আছে তাহার স্বরূপ প্রকাশক কোন নাম করা যায় না। কিন্তু যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয় সেই সেই ক্রিয়ার নাম দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়া থাকে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এক প্রকার ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহা যজ্ঞজ ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয়, ব্রতের দ্বারা এক প্রকার ধর্ম বিকাশিত হয় তাহা ব্রতজ্ঞ ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হয়, এবং আচার জনিত ধর্মকে আচারজ ধর্ম বলা হয়, নিয়ম-জনিত ধর্মকে নিয়মজ ধর্ম বলা হয়, একাদশী প্রভৃতি উপবাস জনিত ধর্মকে উপবাসজ্ঞ ধর্ম বলা হয়। এইরূপ অপরিসংখ্যের বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা অপরিসংখ্যের প্রকার ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে এই সকল ক্রিয়ার নাম সম্মিলিত করিয়াই প্রতিপাদন করা যায়।

নীমাংসা দর্শনাদি গ্রন্থে যে “চোদনা লক্ষণে ধর্মঃ” এইরূপ সূত্রাদির দ্বারা ব্রতযজ্ঞাদিকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা লাক্ষণিক ভাবে বুঝিতে হইবে। কার্য্যকারণের অভেদ কল্পনা করিয়া ঐরূপ নির্দেশ করিয়াছেন; যজ্ঞব্রতাদির দ্বারা এক একপ্রকার ধর্মের বিকাশ হয়, সূত্রাং ‘উহারা ধর্মের কারণ, এনিমিত্ত যজ্ঞব্রতাদিকেই “ধর্ম” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক ব্রতযজ্ঞাদি ক্রিয়া গুলিই ধর্ম নহে।

অধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতেহইবে; অধর্মেরও কতগুলির স্বরূপ প্রকাশক নাম আছে যথা, ক্লোষ, ঈর্ষা, অহুয়া, হিংসা, দ্রোহ, পিণ্ডণতা, মাংসর্ঘ্য ইত্যাদি। আর কতকগুলি অধর্মের এক এক কারণ সম্মিলিত নাম আছে, যথা,—গোহত্যা জনিত অধর্ম, জীহত্যা জনিত অধর্ম, মিথ্যা প্রয়োগ জনিত অধর্ম ইত্যাদি।

উক্ত ধর্ম আর অধর্মের দুইটি অবস্থা আছে;—একটি-বিকাশাবস্থা, আর একটি লীনাবস্থা। যখন বিকাশাবস্থা হয় তখন ইহাদের নাম “প্রবৃত্তি” বা “বৃত্তি” আর যখন লীনাবস্থা হয় তখন তাহাদের নাম সংকীর্ণ প্রবৃত্তি অবস্থা আর সংস্কারাবস্থার বিশেষ পার্থক্য আছে,—ধর্মাধর্মের।

যখন প্রযুক্তি বা বিকাশাবস্থা হয় তখন ইহাদের ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব সুস্পষ্ট রূপে হৃদয় মধ্যে অনুভব করা যায়। দেহের মধ্যেও তাহা ক্রিয়া হইতে থাকে, এবং দেহের ভাবভঙ্গীরদ্বারাই তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আর যখন সংস্কারাবস্থা হয়, তখন তাহার কোন ক্রিয়া বা অস্তিত্ব মাত্রও কোনমতে অনুভব পোচর হয় না, দেহের মধ্যেও কোন প্রকার ক্রিয়া বা ভাবভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না। মনে করুন, ভক্তি একটি ধর্ম, ইহা যখন কোন কারণে মনের মধ্যে বিকাশিত হয়, তখন আমাদের জীবাত্মার মধ্যে যেন কিরূপ এক শীতবীৰ্য্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া যায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম জালায় সমস্তদিন দগ্ধ হইয়া—‘হা বায়ু, হা জল’ করিতে করিতে পূর্ণ সুধাংশু কিরণাঙ্কিত সায়াংকালে তটীগাভীরে বসিয়া কল্লোলশীকারাভিষিক্ত সমীরণ-সেবায় প্রাণ যাদৃশ সুশীতল হয়, ভক্তির উন্নীলনাবস্থায় যেন তাহার ও সহস্রগুণে, প্রাণটা আপ্যায়িত হয়, আমাদের ‘আঁখির’ প্রতি অণুতে অণুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত আঁখিকে, পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আনন্দের তরঙ্গ যেন উঠিতে থাকে,—আনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা হেলিতে জুলিতে থাকে, তখন যেন কি এক অদৃশ শক্তির তরঙ্গ হয় তাহা হৃদয়ই বুঝিতে পারে। তৎপর বাহির হইতেও অনেক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়? শরীরে এক প্রকার বেপথু হইতে থাকে, কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আইসে, অধরপুট বিকম্পিত হইতে আরম্ভ হয়, অপাঙ্গ দেশ হইতে আনন্দাশ্রুকাণ্ড বিগলিত হয়। আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটী মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না। প্রচুর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাदि দ্বারায় ইষ্ট দেবতার অর্চনা করা কালে হৃদয় মধ্যে কি একরূপ অপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়,—কি একরূপ হাল্কা হাল্কা ভাব হয়—নির্ম্মল পবিত্রতার বিকাশ হয়, তাহা উপাসকগণমাত্রেই হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন, তাহার লক্ষণ বাহির হইতেও কতকটা লক্ষিত হইতে থাকে। এই হইল পূজা-জনিত ধর্মের বিকাশ অবস্থা। আবার যখন ভাবটী সংস্কারাবস্থাপন্ন হয়—হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায়, তখন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। এইরূপ অতিথি সংকার, দান, যজ্ঞকালেও এক এক প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহাই ঐ সকল ধর্মের বিকাশিতাবস্থা। আবার যখন লীনাবস্থা হয় তখন ইহাদের কোনরূপ ক্রিয়া বা অস্তিত্বমাত্রেরও উপলব্ধি হয় না। অর্থস্ব সম্বন্ধেও



এইরূপ,—মিথ্যা প্রয়োধ এবং চৌর্যাদিকালে মনের মধ্যে এক প্রকার রাজস ও তামস ভাব উদ্দীপিত হয় তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়, শরীরের মধ্যেও নানা প্রকার লক্ষণ বিকসিত হয়। তখন ঐ সকল অধর্মের প্রবৃত্তি অবস্থা। আবার যখন ঐ সকল ভাব মনের মধ্যে লীন হইয়া যায় তখন তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, তখন উহার সংস্কারাবস্থা বলা হয়। আরও দেখুন,—ক্রোধ একটি অধর্ম, ইহা যখন মনোমধ্যে বিকসিত হয় তখন ইহার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া হৃদয় মধ্যে অনুভব করা যায়, শরীরেও নানা প্রকার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, চক্ষুদ্বয় রক্তিমাকার গ্রহণ করে, ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডাদি অতিশয় বেগবান হয়, কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হইয়া যায়, তখন ইহার প্রবৃত্তি অবস্থা। আবার যখন ঐ ক্রোধটী মনের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তখন তাহার সংস্কারাবস্থা হয়; তখন তাহার কোন ক্রিয়া বা অস্তিত্বেরও উপলব্ধি হয় না; ইহাই প্রস্তুতি অবস্থা আর সংস্কারাবস্থার পার্থক্য।

এই সংস্কারাবস্থার প্রতি হয়ত অনেকের সংশয় হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সংশয়ের কোন কারণ নাই, ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। কার্যের দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। আমাদের মনের মধ্যে যে কোন ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি বা ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাই সংস্কারাবস্থার থাকে, এবং উপযুক্ত কারণ পাইলে আবার তৎক্ষণাৎ উদ্দীপিত হইয়া সেই সেই প্রবৃত্তির অবস্থায় পরিণত হয়, ইহা নির্কির্বাদে সর্বসম্মত কথা। মনোনিবেশ পূর্বক কোন বস্তু দেখিলে, শুনিলে, কিম্বা স্পর্শনাদি করিলে, উদ্দীপনার কারণ পাইলে, সময় সময় কালান্তরে আবার তাহা মনোমধ্যে উপস্থিত হয়,—যেন ঠিক ঠিক সেই ভাবটী বিকসিত হয়। ৪০ বৎসর ৫০ বৎসর পূর্বে নানা প্রকার গ্রন্থের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, উদ্দীপক কারণ পাইলে যেন কোথা হইতে অবিকল সেই বাক্যাবলী নিহত হইতে থাকে। অতএব ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয় তাহার কোনটিই একবারে বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয় না, উহা স্ফুটভাবে মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। মনের ক্রিয়াগুলি এক একবার উদ্দীপিত হইয়া যদি সমূলেই বিনষ্ট হইত, তবে সহস্র চেষ্টা দ্বারাও অতীত ঘটনাগুলি আমরা মনে করিতে পারিতাম না, সমস্ত বিষয়ই আমাদের নিকট সর্বদা অভিনব থাকিত; পরিচিত বিষয় আর অপরিচিত

বিষয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিত না। কোন বিষয়ের স্বরূপ হইতেও পারিত না। মনের ক্রিয়াগুলি সংস্কার অবস্থায় থাকে বলিয়াই পূর্ক পরিচিত বিষয় আর অজ্ঞাত বিষয়ের পার্থক্য হইয়া থাকে।

মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের দুইটি ভাব মনের মধ্যে বিকাসিত হয় না, উহা পর পর ক্রমে হইয়া থাকে। যখন দর্শন ক্রিয়া হয় তখন শ্রবণ ক্রিয়া হয় না, যখন শ্রবণ ক্রিয়া হয় তখন স্পর্শন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু পরে পরে হয়। আমাদের দর্শন স্পর্শনাদি কোন রূপ ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অত্র আর একটি দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এই শেষের ক্রিয়াটির দ্বারা পূর্বেকার ঐ দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াটি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়। তখন শেষকার দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াটিই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকসিত হয়। এই নিয়মেই আমাদের মনে সকল প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদিচ শেষকার ক্রিয়া দ্বারা পূর্বেকারই বিকাসিত ক্রিয়া গুলি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি পূর্ক প্রকাশিত ক্রিয়া গুলির পুনরুদ্দীপনার চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে, পরে একটুকু সুযোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্বার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হয় এবং পূর্কবৎ ক্রিয়া সাধন করে। মানসিক ক্রিয়ার এইরূপভাবে অবস্থিতিকেই সংস্কারাবস্থা বলে। বিষয়ট বিশদ করার নিমিত্ত আর একটু বিস্তার করা বাইতেছে ;—মনে করুন আপনি রামশূন্যকে দেখিতেছেন, এখন অবশ্যই স্বীকার্য, যে, আপনার মনমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া হইতেছে ; এখন ঐ ক্রিয়া হইতে হইতেই যদি শ্রামশূন্য আসিয়া আপনার সম্মুখস্থ হয়, তবে শ্রামশূন্যের শরীর হইতে তাহার গৌরবীতাদি বর্ণাকার শক্তিটি প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষু প্রণালী দ্বারা মস্তিকে উন্নতি হইবে, পরে মনের উদ্বোধন করিবে ; কিন্তু ঠিক এক সময়ে একরকমের ২টা ক্রিয়া, মনোমধ্যে বিকসিত হইতে পারে না। অগত্যা তখন ঐ রামশূন্য দর্শন করার ক্রিয়াটি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইবে, অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্ত প্রায় হইবে। তখন শ্রামশূন্যেরই দর্শন ক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ হইবে, আপনি তখন রামশূন্যকে ছাড়িয়া শ্রামশূন্যকেই দেখিতে থাকিবেন। আবার শ্রামশূন্যকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস

আসিয়া উপস্থিত হইলেও ঐরূপ ঘটনাই হইবে। কিন্তু ঐ পূর্ব পূর্ব ক্রিয়া গুলি মন হইতে বিদূরিত হয় না, এককালে নিশ্চেষ্ট হইয়া, উহারা পুনরুদ্দীপনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে। উপযুক্ত সহায় পাইলেই পূর্বমত ক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়, সেই ক্রিয়াকেই রাম-সুন্দর, শ্রামসুন্দরের স্মরণ হওয়া বলে।

দর্শন স্পর্শনাদি বৃত্তির ত্রায় সকল প্রকার বৃত্তিরই এই নিয়মে সংস্কারাবস্থাপন্ন এবং এই নিয়মেই পুনরুদ্দীপিত হইয়া থাকে। ভক্তি, প্রজ্ঞা, সন্তোষ প্রভৃতি ধর্ম্য এবং ক্রোধ, ঈর্ষা, অমৃয়া প্রভৃতি অধর্ম্য সকলেরই এই প্রকার প্রবৃত্তি ও সংস্কারাবস্থা আছে। একবার বিকাশিত হইয়া উহারা কেহই সম্মূলে বিনষ্ট বা রিলুপ্ত হয় না, পূর্ব নিয়মানুসারে সকলেই অপর প্রবৃত্তি দ্বারা দুর্বল হইয়া এক এক বার ক্ষীণাবস্থা হয় এবং উপযুক্ত সহায় পাইলে পুনঃপুনঃ উদ্দীপিত হয়। আবার সংস্কারাবস্থা হয়, আবার উদ্দীপিত হয়, আবার সংস্কারাবস্থা হয়, আবার উদ্দীপিত হয়, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। ভক্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকিতে থাকিতে যখন কোন বিষয়ের চিন্তা বা আর কোন প্রকার একটি বৃত্তি মনোমধ্যে বিকসিত হয়, তখন ভক্তি গুণটি সংস্কারাবস্থায় অবস্থিতি করে, এবং উপযুক্ত সহায় পাইলে আবার পরিস্কুরিত হইয়া পূর্ববৎ ক্রিয়াও করে। পূর্বের ত্রায় আনন্দ, পূর্বের ত্রায় তৃপ্তি এবং পূর্বের ত্রায় শান্তি সুখাদির অভিব্যক্তি করে। ব্রত, নিয়ম, অতিথি সংকার, ও উপাসনাদিকালেও আত্মাতে একরূপ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়, আবার অন্য কোন একটি বৃত্তির উদ্দীপনা হইলে সংস্কারাবস্থায় থাকে, এবং উপযুক্ত কারণের সহায়তা পাইলে পুনঃ পুনঃ সেই রূপ ভাব উদ্দীপিত হয় অধর্ম্য সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম। ইহাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—  
 “দ্বয়ে ধর্ম্মী সংস্কারঃ স্মৃতি ক্লেশ হেতবো বাসনারূপাঃ বিপাক হেতবো ধর্ম্মা ধর্ম্মরূপান্তে পূর্বভবাভি সংস্কৃতাঃ পরিণাম চেষ্টা নিরোধ শক্তি জীবন শক্তি বদপরিতৃষ্টা” (পাতঞ্জল ভাষ্য)। ইহার ভাবার্থ এই, আমাদের মনে যে কোন প্রকার শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয়, তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়; তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কার গুলি স্মরণের কারণ এবং অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম “বাসনা” আর যে জাতীয় সংস্কার গুলি আমাদের নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জন্য এবং

দীর্ঘ জীবিতা ও অল্প জীবিতার কারণ তাহাদের নাম ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। এই সমস্ত প্রকার সংস্কারই আমাদের পূর্ব্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়, পূর্ব্বেকার ক্রিয়াগুলিই সংস্কার রূপে মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের বধন সংস্কারাবস্থা হয় তখন মনে মনে তাহার অনুভব করা যায় না, পরিণাম শক্তি এবং জীবন শক্তি প্রভৃতির যেমন অনুভব করা যায় না ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারও তেমন অনুভব করা যায় না। এ নিমিত্ত দৈদৃশ সংস্কারাবস্থার নামই “অ-দৃষ্ট” অর্থাৎ মনের অনুভবের অবিষয়, মনের অগোচর।

এই সংস্কারাবস্থা বা অদৃষ্টের আর একটি নাম আছে “অপূর্ব্ব”। ইহাই দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান্ কার্কাভিনি বলিয়াছেন, “কর্ম্মণ এ বোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাধ্যাপূর্ব্বম্,” (বেদান্ত দর্শন) ইহার অর্থ এই,— যাগযজ্ঞাদি হউক আর গোবধাদি হউক যে কোন বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তৎকালে আত্মার মধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তৎপর তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কারাবস্থাটী) মনের মধ্যে থাকে তাহার নাম ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব”। তন্মধ্যে যে গুলি কুৎসিৎ বা কষ্টদায়ক গুণের সংস্কার তাহাকে হ্রদৃষ্ট বলে, আর যে গুলি ধর্ম্মের সংস্কার তাহার নাম শুভাদৃষ্ট। এইরূপ অদৃষ্টই আর্ধ্যদিগের অভিমত এবং পাঠকগণের ও বোধ হয় এইরূপ অদৃষ্টে কোন আপত্তি হইবে না।

### অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী

অদৃষ্ট কাহাকে বলে তাহা বলা হইয়াছে, এখন তাহার ক্রিয়া প্রণালী বলা আবশ্যক, শুভাদৃষ্ট আর হ্রদৃষ্টের তিন প্রকার প্রণীভেদ আছে। এক জন্মজনক অদৃষ্ট, দ্বিতীয় আয়ুর্জনক অদৃষ্ট, তৃতীয় ভোগজনক অদৃষ্ট। কতকগুলি অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের মনুষ্যাদি দেহ সংগঠিত হয়, তাহাদের নাম জাতি বা জন্মজনক অদৃষ্ট, আর কতকগুলি দ্বারা আমাদের আয়ুর ন্যূনাধিক্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম আয়ুর্জনক অদৃষ্ট, অপর কতকগুলি দ্বারা আমাদের সুখ দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে, তাহার নাম ভোগজনক অদৃষ্ট। সুখ দুঃখের আবার অসংখ্যের বিভাগ আছে। অসংখ্যের কারণে অসংখ্যের সুখ দুঃখাদি হইয়া থাকে,

এবং এক এক প্রকার সুখ দুঃখ এক এক প্রকার অদৃষ্ট দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত ভোগজনক অদৃষ্টের বিভাগ, অপরিসংখ্যায়, তথাপি দিগদর্শনের নিমিত্ত কতকগুলি নাম করা যাইতেছে, যথা—পুত্র লাভজনক অদৃষ্ট, ধন লাভজনক অদৃষ্ট—,খ্যাতি লাভজনক অদৃষ্ট, এবং দারিদ্র্যজনক অদৃষ্ট, পুত্রনাশজনক অদৃষ্ট, রোগজনক অদৃষ্ট ইত্যাদি ।

এখন প্রত্যেকটির কার্য প্রণালী বলা যাইতেছে ।

ক্রমঃ

## ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ ।

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরত ভজন্তে ।

সূতঃ পরপ্রশ্নয় নেয় বুদ্ধিঃ ।

মহুর অষ্টম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

কৃত্রিয়ৈব বৈশ্বাংচ ব্রাহ্মণো বুদ্ধিকর্ষিতৌ ।

বিভ্রাদানুশং স্তেন স্থানিকর্মাণি কারয়ণ । ৪১১ ।

দাস্তন্ত কারয়জ্জোভা ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতানু দ্বিজানু ।

অনিচুতঃ প্রাভবজ্জাত রাজা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ । ৪১২ ।

শূদ্রস্ত কারয়েদাস্তং ক্রীতমক্রীতমেববা ।

দাস্যায়ৈবহিস্রষ্টৌহসৌ ব্রাহ্মণস্যাস্রমুবা । ৪১৩ ।

ব্রাহ্মণ, আশ্রমরক্ষণে অক্ষম কৃত্রিয় এবং বৈশ্বকে অনুশংস ভাবে, নিজ নিজ জাত্যক্ত কর্ম করাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান পূর্বক প্রতিপালন করিবেন । ৪১১ । কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ, লোভনিবন্ধন, কোন সংস্কৃত দ্বিজকে, প্রভুত্বাবলেগে, অনিচ্ছাসত্ত্বে পাদধাবনাদি দাসকার্যে নিযুক্ত করিলে, রাজা তাহাকে ছয়শত পণদণ্ড করিবেন । ৪১২ । পরন্তু ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দাসৈচ্চিত পাদধাবনাদি কর্মে নিযুক্ত করিতে

পারেন। কারণ ব্রাহ্মা শূদ্রদিগকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জগ্জই স্বীকৃত করিয়াছেন। ৪৭৩। এবংবিধ মনুস্ত দৃষ্টার্থব্যবস্থা পাঠে এবং পার্কর্ত্য প্রদেশে—“ভিন্ন” প্রভৃতি অসভ্য লোক দর্শনে, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে—শূদ্রগণ এতদেশে প্রথম আগমন করিয়া অত্রস্থ অধিবাসীদিগকে পরাভব পূর্বক বাস করিয়াছিলেন। বিজিত অধিবাসীগণ—বিজয়ী শূদ্রজাতি কর্তৃক, উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া পর্তত ও অরণ্যে বাস করিতেছে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল পার্কর্ত্য লোক বিলোকিত হয়; ইহারা সেই শূদ্রবিজিত আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপস্থিত হইয়া শূদ্রদিগকে পরাজিত এবং দাস দশায় পাতিত করেন।”

যদিও হিন্দু শাস্ত্রে কুত্ৰাপি দ্বিজজাতি কর্তৃক শূদ্রের পরাজয় বৃত্তান্ত উপলব্ধি হয় নাই; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিগ্রহ নানাস্থানে দর্শন করিয়া “ব্রাহ্মণ গণ গৃহবিদ্বেষে ভয়ে দ্বিজ শূদ্র বিগ্রহ বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছেন” এতাদৃশ অনুমাণ করিতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কুটি হয় না। তথাপি এতদেশীয় এক সংপ্রদায় সরলভাবে, এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয়বাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া নানাবিধ রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মবিষয়ক নূতন নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন না—

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ ।

তথৈব পরিপাল্যোহসৌ যদাবশমুপাগতঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা । ১ম

অধ্যায় ৩৪৩ শ্লোক ।

দেশস্য জাতেঃ সজ্জন্ত ধর্মোগ্রামস্ত যোভূণ্ডঃ ।

উদিতঃ স্যাৎ স তৈ নৈব দদেভাগং প্রকল্পয়েৎ ॥

দায়তত্ত্ব দ্বিত কাত্যায়নবচন ।

যে ব্রাহ্মণগণ বৈদেশিক নীতিতে, দায় ও অপরাধাদি বিষয়ে এতাদৃশ উদার নীতির অনুসরণ করিতেন; তাহারা এক বিজয়ী জাতিকে বিজিত করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ছিলেন—বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা বিশ্বাস করা এবং তহুপরি দণ্ডায়মান হইয়া নানাবিধ অতিনব

সিদ্ধান্ত অবতারণা করা আমাদের বিবেচনায় যুক্ততা বলিয়া বোধ হয়। শূদ্রগণ যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতি কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিল এতদ্বিষয়ে বাচনিক কোন প্রমাণ নাই। অধিকন্তু আনুসঙ্গিক কোন নির্ভর যোগ্য প্রমাণ ও উপলব্ধ হয় না—দেখ ব্রাহ্মণগণ কিছু শূদ্রজাতিকে নিরস্ত্র করিবার কোন বিধি করেন নাই। বাস্তবিক কোন ইতিহাস বা পুরাণে দ্বিজগণ কোন জাতিকে নিরস্ত্র করিয়াছেন অদ্য পর্য্যন্ত শুনি নাই। বিশেষতঃ নারদসংহিতা প্রভৃতি দর্শনে, সুস্পষ্ট অনুভূত হয় শূদ্রগণ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিত—অথচ তাহারা কখনো কালেও ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে নাই। ইহা কখনও বিজিত জাতির লক্ষণ নহে। অপিচ জাতিবিশেষের প্রতি কৰ্ম্ম বিশেষের তার আখ্য সমাজের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়—তদ্বারা কোন জাতিকে পরাজিত বলিয়া অনুমান করিতে হইলে বৈশ্য জাতিকেও পরাজিত বলিয়া মনে করিতে হয়—যথা মনু বলিয়াছেন “বৈশ্য শূদ্রো প্রযত্নেন স্থানি কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ। তৌহিচ্যুতো স্বকদ্বভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ।” রাজা যত পূৰ্ব্বক বৈশ্য শূদ্র দ্বারা নিজ নিজ জাত্যুক্ত কৃষি বাণিজ্য ও সেবাদি করাইবেন। কারণ তাহারা স্বকৰ্ম্মাচ্যুত হইলে, এই জগৎ ব্যাকুলিত হয়।

৮অ। ৪১৮।

ইহা দ্বারা দৃষ্ট হয় যখন যে রাজার অধিকার ছিল তিনি বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা স্ব স্ব জাত্যুক্ত কৰ্ম্ম করাইতে পারিতেন। অন্ততঃ তাহারা বাহাতে স্বজাত্যুক্ত কৰ্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এতাদৃশ ভাবে রাজ্য শাসন করিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলেন।

আর দেখ আমেরিকা নামে এক প্রকাণ্ড দেশ যুক্তানেরা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে। ঐ দেশের পূৰ্ব্ব অধিবাসিগণ এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। যুক্তানগণ এই অতি কলঙ্কর ব্যাপারের উপপাদনের নিমিত্ত, এক নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন—যাহা শ্রবণ করিলে গাত্র রোমাঙ্কিত এবং শরীরের শোণিত শীতল হয়। সিদ্ধান্তটি এই “প্রবলাবলসমাগমে প্রবল শেব”—অর্থাৎ কোন প্রবলজাতির সহিত দুৰ্ব্বলজাতি একত্র বাস করিলে দুৰ্ব্বল জাতি বিলুপ্ত হয়, ইতরেরা বুদ্ধিপায় এবং অবশিষ্ট থাকে। এই পৌলস্ত্য কুলোচিত সিদ্ধান্তানুসারে বিচার করিলেও শূদ্রগণ পরাজিত জাতি বলিয়া উপপন্ন হয় না। কারণ, ব্রাহ্মণ যে এক অতি প্রবল জাতি

ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই—মহু ব্রাহ্মণ জাতির অতীতপ্রভাব বিষয়ে  
কি বলেন দেখুন—

পরামপ্যাপদংপ্রাপ্য ব্রাহ্মণান্ন প্রাকোপয়েৎ ।

তেহেনং কুপিতাহন্যঃ সদ্যঃ সকল বাহনম্ । ৩১৩ ।

লোকানন্যান্ সৃজের্যৈ লোকপুলাংশচকোণিতাঃ ।

দেবানুকুৰ্য্যুর্দৈবাংশচকঃ ক্ষিধ্বন্তানুগমুদ্রয়াৎ । ৩১৪ ।

যানুপাশ্রিত্যতিষ্ঠন্তি লোকাদেবাশ্চসর্কদা ।

ব্রহ্মচৈব ধনংযেষাং কোহিংস্যান্তান্ জিজীবিষুঃ । ৩১৫ ।

রাজা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে কোপিত করিবেন না ।

তাহারা কুপিত হইলে তৎক্ষণাৎ সবলবাহন রাজাকে বিনাশকরিতে  
পারেন । ৩১৩ । যাহারা কুপিত হইলে, অন্য লোক সকলকে ও লোকপাল-  
দিগকে সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং দেবতাদিগকে দেবত্ব বিহীন করিতে  
পারেন তাহাদের পীড়া করিয়া কে সমুদ্র হইতে পারে ? । ৩১৪ । যাহা-  
দিগকে আশ্রয় করিয়া সকল লোক এবং দেবতাগণ সর্কদা অবস্থান  
করেন এবং দেব যাহাদের ধন, কোন ব্যক্তি জীবনের আশা করিয়া  
তাহাদের হিংসা করিতে পারে ? । ৩১৫ । এতাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-  
গণের সহিত বিজিত শূদ্রগণ চিরকাল একত্র বাস করিতেছে অথচ  
আমেরিকাবাসীদিগের ন্যায় বিলুপ্ত হয় নাই । ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইতে  
শূদ্রের সংখ্যা কোন অংশে ন্যূন নহে ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে—মহু ব্যবস্থা করিলেন “ব্রাহ্মণ, নিঃশঙ্ক-  
ভাবে শূদ্র হইতে ধনগ্রহণ করিতে পারেন । শূদ্রের কোনধনে স্বত্ত্ব নাই  
তাহার সমুদায় ধনই ভর্তার প্রাপ্য ।” এতাদৃশ নিষ্ঠুর বিধিদর্শনে কাহার  
প্রতীতি না হয় যে, শূদ্রগণ এক সময় নিজের ও দাসীকৃত জাতি  
ছিল ।

পরন্তু ইহা সাধারণ শূদ্রসম্বন্ধে বিহিত নহে । সপ্তবিধ দাস শূদ্র  
সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে যে তাহাদের ধন ব্রাহ্মণ আপদ কালেই রূপ  
পূর্বক গ্রহণ করিলেও তাহাকে রাজদণ্ড-ভোগ করিতে হইবে না ।

ঐ শ্লোকের টীকা দেখ—

মহুর শ্লোক—১৮ । ৪১৭ ।



বিশ্রকং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাং দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ ।

নহিতম্যাস্তিকিঞ্চিং স্বং ভত্ৰ্হাৰ্য্য ধনোহিসঃ ।

টীকা । নিক্কিচিকিৎস মেব প্রকৃতাদাস শূদ্রাং ধনগ্রহণং কুৰ্য্যাৎ ব্রাহ্মণঃ যন্তস্য কিঞ্চিদপি স্বং নাস্তি ; যস্মান্তৰ্ভূতাহত ধনোহসৌ । এব হতাপদি বলাদপি দাসাদব্রহ্মণোধনং গৃহ্নন্ নরাজ্ঞা দণ্ডনীয় ইত্যেবমর্থ নেতহুচ্যতেইতি কুল্লুকভট্টঃ ।

এই সমুদায় পর্যালোচনা করিলে শূদ্রগণ যে পরাজিত ও দাসীকৃত জাতি—আমাদের তাদৃশ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার আস্থা স্থাপন করিতে রুচি হয় না । বিশেষতঃ শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে প্রকার অজ্ঞান্দিবাব ; বিজিত এবং বিজিতার মধ্যে, সকলবিষয়ে সমান, অধিকার লাভ না করিলে, তাহা সম্ভব হয় কি না বিশেষ সংশয়ের বিষয় । অধিকন্তু শূদ্রগণ সমর নির্ভিত এতাদৃশ কোন সংস্কার কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র কাহার মনে নাই । কোন গ্রন্থেও তাদৃশ প্রমাণ বা আখ্যান দৃষ্ট হয় না । বর্তমান বিজয়ী জাতীয় লোক বিজিত জাতিকে যদ্রূপ নিরস্ত্র বা অতি প্রয়োজনীয় লবণাদি শিল্প হইতে ছলে বলে বঞ্চিত করিয়া সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী করিতে চেষ্টা করেন—ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের প্রতি কখনও তাদৃশ কৌশল প্রদর্শন করেন নাই । মনুর দশম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে দৃষ্ট হয়—ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্র সমুদায় জাতির জীবিকা ও বৃত্তি শিক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে উহা উপদেশ দিবেন ও স্বয়ং তাদৃশ নিয়মে রত থাকিবেন । যথা সৰ্ব্বৈষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাং বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি প্রক্ৰুরাদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ং চৈব তথা ভবেৎ ।”

এই জীবিকা বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিসকল শূদ্রের পক্ষে যত অনুকূল ব্রাহ্মণের পক্ষে তদ্রূপ নহে । এই সমুদায় বিবেচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে “শূদ্র কস্মিন্ কালেও পরাজিত জাতি নহে । এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য পাশবল মূলক নহে উহা জ্ঞান ও ধর্ম মূলক । আক্ষেপের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেক “প্রায়োগিকং মাৎসরিকং মাধ্যম্যং পাক্ষপাতিকং । সোপন্যাসক জানীয়াৎ বচঃ সংশয়িতঃ তথা ” এই যড়বিধবাক্য ভেদ নিরূপণে অক্ষমতা নিবন্ধন বিদেশাগত সমুদায় সিদ্ধান্তই বিশ্বাস করিয়া তদ্বারা সমাজে নানা বিপ্লব উপস্থিত করিতেছেন । আমরা তাহাদিগকে

বহুভাষে অনুরোধ করি যে তাহারা ব্রজবিহার ক্রমে যে সকল বৈদেশিক সিদ্ধান্ত এষাবৎ কেবল উদরসাৎ করিয়াছেন; সম্প্রতি রোগছন করিয়া সারাংশ গ্রহণ এবং অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্বক সমাজ দেহের স্বাস্থ্য বিধান করুন ।

ইন্দ্রিয় চাপল্যে কোন কুলকলঙ্কিনী রমণী নিজ কলুষিত কর্মেয় জন্য কোন সজ্জন কর্তৃক অনুযুক্ত হইলে, সে স্বীয় লোষ লাঘবের নিমিত্ত, স্বামী শত্রুর খণ্ডা নন্দা প্রভৃতি স্বামিকুলবাসিজনগণের প্রতি নানাবিধ দোষ আরোপ করিয়া থাকে ;—এই মানসিক দুর্বলতা পূর্বে নারী জাতিতেই পরিলক্ষিত হইত । সম্প্রতি নারী জাতির সাম্য্যভিলাষী এতদ্দেশীয় কোন কোন পুরুষেও ইহা ষোড়শকলায় উপলব্ধ হয় । ইহারা লোভে বা আলসে বা অজ্ঞতা নিবন্ধন নিজকুল, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পৈত্রিক ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলে নানাবিধ কলঙ্কারোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাঁহারা যেন পিতৃকুলের সমালোচন কালে, রসনা সংযম করিতে অভ্যাস করেন । কারণ ইহার অভাবে লোকে তাহাদের বাক্যে, হিমলাঙ্গুল শৃগাল ছায়ে, আস্থা করিতে বিরত হইয়াছে ।

ক্রমশঃ

## বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ।

### ভূমিকা ।

পৃথিবী অনন্ত । কেন না, ইহা কোন সম্বৎসরের কোন মাসের কোন তারিখে কি বারে কত ঘণ্টা কত মিনিটের সময় হষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না, কোনটাই লেখা পড়াও নাই । বাহারা ঐ কথা বলিয়াছে তাহাদের কথা বিজ্ঞানের কাছে উন্নত প্রলাপ হইয়াছে । এইজন্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ তত্ত্ব দর্শী মাত্রেই বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি অনন্ত কাল হইতে, সেকাল মনুষ্যের গণনার মধ্যে আসে না । পৃথিবীর সৃষ্টির ক্রমও অনন্ত রূপ এবং ইহাতে সৃষ্টপদার্থেরও অন্ত নাই ; জল, স্থল, প্রাণী,

উদ্ভিদ, ফল, ফুল বা কিছু দেখ, বাহ্য কিছু শুন, সকলই অনন্ত। অনন্তকাল হইতে উৎপন্ন অনন্তকাল অবধি অবস্থিত এবং কত কালে যে বিলীন হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই।

এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের তুলনায় এই মানুষ একটা নগণ্য কীটানু বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোন বস্তু যদি থাকে তৎসদৃশ হইলে ও অনন্ত। আকার, প্রকার, জাতি, ও স্বভাব ভেদে মনুষ্য অনন্ত। এই অনন্ত মনুষ্যের ভাষা অনন্ত, শাস্ত্র অনন্ত, ধর্ম অনন্ত, ব্যবসায় অনন্ত, রুচি অনন্ত।

অন্ত দেশের কথা বলি না, অন্ত জাতির কথা ছাড়িয়া দিলাম, এই ভারতবর্ষের আৰ্য্য জাতির কথাই বলিতেছি। আৰ্য্য জাতির গ্রন্থ সকল পাঠ কর,—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র পড়িয়া দেখ—দেখিবে এই আৰ্য্য জাতির মধ্যেই অনন্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে, কত ষাৎ প্রতিষাৎ, বিমর্দ সম্বর্দ, জয় পরাজয়, উদয় অস্ত অথবা এক কথায় সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ঘটয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কত রাজবিপ্লব, কত দেশ বিপ্লব, কত ধর্ম বিপ্লব, আর কত যে সমাজ বিপ্লব ঘটয়াছে তাহারও অন্ত নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র হইতে চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত যে কিছু সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া যায় সকল গুলি একটু মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলেই আৰ্য্য জাতির মধ্যে ধর্ম-ভেদ বা সমাজ বিপ্লব একটা নূতন কথা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হইবার অনেক পূর্বেও ভারতে ধর্ম বিপ্লবের কথা শুনা যায়, আদি কাব্য রামায়ণে যোর নাস্তিকের কথা পওয়া যায়। ধর্ম লইয়া ভারতে যত মতভেদ এরূপ আর কোথায়ও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

পূর্বকথা স্মরণ করিয়া দেখিলে পূর্বে পূর্বে যে সকল ধর্ম বিপ্লব হইয়াছে তাহার তুলনায় বর্তমান ধর্ম বিপ্লব কিছুই নয় বলিলেই চলে। আধুনিক ধর্ম বিপ্লব অতি সামান্য হইলেও বর্তমান কলিযুগ প্রভাবেই হউক অথবা অধঃপতন মূলক দূর দৃষ্টির প্রভাবেই হউক আমাদের মধ্যে আর একটি ভয়ানক বিপ্লব ঘটয়াছে। সেইটিই বিশেষ ভয়ের জিনিষ বা অনিষ্টের মূল। সেটি আর কিছুই নয় সত্যের বিপ্লব।

পূর্বকার লোকেরা যে যে ধর্মেই দীক্ষিত হউক না কেন আন্তরিক

বিশ্বাসের সহিতই তাহা প্রতিপালন করিত। এবং কেবল কথায় নিজের ধর্ম বা বিশ্বাস স্থাপন করিত না। তখন “দিনে গৌরব্রাতে বীণাধ্বনি ভজার’ দল ছিল না। তখন যাহারা বৈদিক ধর্ম প্রতিপালন করিতেন, তাহারা অন্তরে বাহিরে ঐ ধর্মের অঙ্গসমূহ করিতেন এবং বিরুদ্ধাচারীর সহিত কোন রূপ সংগ্রহ রাখিতেন না। বৈদিক ধর্ম যাহা এক্ষণে সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি সনাতন প্রতিপালন। সে আচার গুলি প্রতিপালন না করিলেই পাতিত্য ঘটত। একবার পতিত হইলে আর বৈদিক ধর্মাবলম্বীদিগের দলে প্রবেশ করা যাইতে পারিত না। সুতরাং তখন ধর্ম মাধুরী রুচি অবলম্বন করিয়া সুযোগ বুঝে আজ ব্রাহ্ম, কাল হিন্দু হইবার যো ছিল না। অথবা স্বয়ং যথেষ্টাচার করিয়া হিন্দুদিগের মন ভুলাইবার জন্ত কেবল মুখে হিন্দুধর্মের জয় গান করিলে হিন্দু সমাজে প্রবেষ্ট হইতে পারা যাইত না। কারণ প্রধানতঃ আচার রক্ষাই তখন হিন্দুধর্ম পালন বলিয়া গণ্য হইত। এই আচার রক্ষা মুখের কথা নয়, হাতে কলমে করা চাই।

ঐ আচার গুলি বর্ণ এবং আশ্রমভেদে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বর্ণাশ্রমচার নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ বর্ণাশ্রমচার পৃথিবীর আর কোন স্থলে নাই, আর যদিও কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকে—ধর্মের সঙ্গে উহার কোন সংগ্রহ নাই। আচার রক্ষার নাম যে ধর্ম ইহা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভিন্ন আর কেহই বলেন নাই। ধর্মের এ রহস্য আর কেহই বুঝেন নাই এবং সেই জন্তই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশেই সনাতন ধর্ম বলিয়া একটা কথা নাই। সনাতন ধর্ম আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত সনাতনের প্রতিপালন মাত্র। অনন্ত ধর্ম বিপ্লব ঘটয়াছে, অনন্ত চার্কাক্ষ বুদ্ধদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের সমগ্র স্থান প্রায় বিধর্ম্য আচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ণাশ্রমচার যেটুকু কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিত সেই টুকুর মধ্যে অতি পবিত্রতাবেই ছিল ও অতি বিশ্বাসের সহিতই রক্ষিত হইত। এবং সেই পবিত্রতা প্রভাবেই ইহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিধর্ম্য আক্রমণ উৎপীড়ন সহ করিয়া মৃত প্রায় হইয়াও পুনরায় উজ্জীবিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। পুনরায় আবার সমুদয় বাধা

নিরোধ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারত ভূমি আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই বর্ণাশ্রমাচার ভারতবর্ষের স্বভাবানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাণের গতি অনুসারে গঠিত। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন জাতিভেদ নাই একমেবাদ্বিতীয়ংই” পরমধর্ম্ম। আমরাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু এ সব কাহার পক্ষে? সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে, গৃহীর পক্ষে নয়। গৃহীর পক্ষে একমাত্র বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনই ধর্ম্ম।

## খাদ্য ।

শরীরের সহিত শরীরীর সম্বন্ধ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ভৌতিক ভোগ্য-জাত শরীর ধারণের প্রধান সাধন হইবে। তন্মধ্যে, তেজ, বায়ু, জল ও পৃথিবী এই চতুষ্টয়ের আবশ্যকতা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যেও বায়ু, জল ও পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা কতকটা শীঘ্র অনুভব করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু তেজের প্রয়োজন কিঞ্চিৎ অনুধাবন ব্যতীত বোপগম্য হয় না। বায়ু ভিন্ন ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না। জল ভিন্ন কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু অধিক কাল নহে। খাদ্য ভিন্ন দুই একদিন মাত্র প্রাণম্ কার্য্যে সমর্থ হই। পিপাসা ও বভ্রূকা প্রতিদিন আমাদের দর্শন দিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় প্রতিদিন আমরা উপলব্ধি করিতেছি। প্রাণন কার্য্য প্রাণায়াম-পর, যোগী ভিন্ন অস্ত্রের বোধ করিবার অনুমাত্রও শক্তি নাই। কাহার সাধ্য প্রকৃতির সহিত বিরোধ করে? বিরোধ হইলে প্রথমতঃ যাতনা ও অস্তিম্বে শেষ দশা উপনীত হইয়া থাকে। প্রাণি সকল স্বভাবের অনতীক্রমণীয় বিধানে পরিচালিত। প্রকৃতি সুন্দরী বিবিধ বেশে সুসজ্জিত হইয়া বহুবিধ-উপকরণ পূর্ণ-হস্তে প্রত্যেকের নিকট দণ্ডায়মান। সেই দ্রব্য-সম্ভার আমাদের “জীবন ও দেহধারণের প্রধান উপায়।

দেহিগণ বিবিধ বিচিত্র দেহে মান্নার নীলা প্রকটন করিয়া থাকে । দেহি-  
গণের দেহ যেমন বিভিন্ন, খাদ্যও তদ্রূপ বিভিন্ন । ভূচর, খেচর, কলচর  
ও উভচরগণের খাদ্য গ্রহণে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, সুতরাং গ্রহণ-  
সাধন কল সকলও বিভিন্ন । আবার গ্রাহ পদার্থ নিচয়েও সকলের ভুলা  
প্রীতি হয় না । একে যাহা হেয় বলিয়া পরিহার করিয়া থাকে, দ্ব্যপ্য  
বোধে ছর হইতেই বিসর্জন দেয়, অথবা তাহা উপাদেয় স্থির করিয়া সাগ্রহে  
গ্রহণ করে । একের ব্রহ্মত পদার্থ অত্র প্রাণীয় অমৃতোপম । ইহা যেমন  
বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তেমন একাকৃতিক প্রাণীর মধ্যেও দৃষ্ট  
হইয়া থাকে । দেশভেদে রুচিভেদে, অবস্থাভেদে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভেদে  
উহার ভেদ হইয়া থাকে । আৰ্য্য, যবন, শ্বেচ্ছ, শাক ও ফুকশ প্রভৃতির  
খাদ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই উহা দৃষ্ট হয় । যাহারা অসভ্য অজ্ঞ তাহারা  
প্রায়ই পখাদির প্রায় আমাহারে দেহ পোষণ ও জীবন ধারণ করিয়া থাকে ।  
পশুর মধ্যেও উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট আছে । উৎকৃষ্ট পশুগণের আহারও  
শ্বেচ্ছাদির আহার প্রায় একরূপ । মানুষ ও পশু উভয়েই প্রাণী । প্রাণী  
হইয়াও বিবেকবলে মানুষ প্রধান । বিবেক রাহিত্যে পশু অধম । মানব  
বিবেক বলে ইন্দ্রিয় গ্রাম নিরোধ করিতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ মনুষ্যোচিত  
ক্ষমতা আছে, আর যে তাহাতে অক্ষম সেই পশুভূল্য । এই বিবেক ও  
নিরোধগুণে আৰ্য্যগণ জগতের গুরু, সুতরাং ভূদেব । অনাৰ্য্যগণ অবিবেক,  
ও উশৃঙ্খলতায়, নর-পিশাচ ।

আমরা নিয়তই ইহা বলিতেছি যে, ছলে বলে আধিপত্য বিস্তার  
করিতে পারিলেই সভ্য হয় না । যাহাদের যত বিচার শক্তি ও কার্যকল  
বোধে পরিণাম ভাবনা আছে, তাহারা তাবন্মাত্র সভ্য । আৰ্য্য ভিন্ন অজ্ঞ  
জাতির অতি অল্পই বিচার শক্তি আছে । অতএব আৰ্য্য জাতির খাদ্য  
সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলেই খাদ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা  
প্রকটিত হইতে পারে । আৰ্য্যজাতির ইহাই অসাধারণ বিজ্ঞতা ও সভ্যতার  
নিদর্শন যে, উহারা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া খাদ্য জাতের  
বিনির্গয় করিয়াছেন তেমন উহা ধন্যানুগতও করিয়াছেন । ধর্মের সুহিত  
সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আৰ্য্য কার্য্যকলাপ পবিত্র এবং ভব্যতা ও বিজ্ঞতার  
উৎকৃষ্ট চিহ্ন । পরম হিতৈষিনী প্রতি বলিয়াছেন “অন্নময়ং হি সৌম্যমনঃ”  
যে বৈরাগ্য অন্ন অন্ন করে তাহার মনও তদনুরূপই হয় । অন্নই পরিণাম

প্রাপ্ত হইয়া দেহ ধারণ করে। দেহ ও মনের নৈকট্য সম্বন্ধ, সুতরাং  
অম্মাত্মসারে দেহের সংস্থান ও মনের গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে ইহা  
সকলেরই স্বীকার্য। আম্মাত্মসভোজী অসভ্য বর্কর, প্লুট মাংসভোজী  
শ্লেচ্ছ, ও পকমাংসভোজী যবন ইহাদের মনের গতি পর্যালোচনা  
করিলেই উহা আরও বুঝা যাইতে পারে। উহাদের মন বাহ্য জগতেই  
আকৃষ্ট এবং দয়া দাক্ষিণ্য ও শৌচাদি সুগুণ হইতে সুদূরে অবস্থিত।  
অন্তর্জগতের গভীরতবে শেযোক্ত জাতির মন কথঞ্চিৎ প্রধাবিত হইতে  
পারে মাত্র, কিন্তু আধ্যাত্ম বিষয়ে একান্তই দুর্বল, ইহার কারণ কি?  
পাশববলের উপচয় হইলে ও অন্তর্কালে উহারা নিরতিশয় দীন ও রূপণ।  
নিরোধগুণে মানবের মানবত্ব, কিন্তু উহাদের ঐ গুণ অতি অল্পই আছে।

জগৎ মায়াময়। মায়ার উপাদান সত্ত্ব, রজ ও তম। প্রত্যেক পদার্থেই  
ঐ ত্রিগুণ আছে। ঐ ত্রিগুণ বা দ্রব্যত্রয়ই দেহীদিগের দেহে পিত্ত, বাত  
ও শ্লেষ্মারূপে বিরাজিত। উহারা মিশ্রিত ও ক্রম পরিণামে বাত, পিত্ত ও  
শ্লেষ্মারূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্যাদি দর্শন ও বৈদ্যক শাস্ত্র বাহারা  
পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা ইহা অবগত আছেন।

“দোষধাতুগলাদীনাং নেতা শীত্ৰঃ সমীরণঃ ।

রজোশুণময়ঃ সূক্ষ্মো রূক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

বায়ু রজোশুণময়, সূক্ষ্ম, রূক্ষ, শীত, লঘু ও চল। বায়ুই, দোষ, ধাতু  
ও মলাদির নেতা।

পিত্তযুষ্ঠং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্ ।

সরং কটু লঘুন্নিধং তীক্ষ্ণ যক্ষ্মস্ত পাকতঃ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

পিত্ত সত্ত্বগুণময়। উহা নিরাম ও সামভেদে পীত ও নীল, কটু, লঘু,  
নিধ, তীক্ষ্ণ এবং পাকে যক্ষ্ম।

“শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা ।

ভ্রমোণাধিকঃ স্নাত্ত্ববিদগ্ধো লবণোত্তবেৎ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

শ্লেষ্মা তমোগুণাধিক। শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ইত্যাদি।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অবতার ইহাই বলা হইল। মানুষের প্রকৃতিও তদনুসারে গঠিত হয়। বাত প্রকৃতি, পিত্ত প্রকৃতি ও শ্লেষ্মা প্রকৃতি।—মিশ্রণে, বাত-পিত্ত প্রকৃতি কি বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতি ইত্যাদিও হইয়া থাকে। কলতঃ বাহার যে গুণ প্রধান তদনুসারে তৎপ্রকৃতিক বলিয়া অভিহিত হয়। আহার বিহার ও তপস্যা সাহচর্যে প্রকৃত্যন্তর সম্ভটনও ঘটিয়া থাকে। এখন সংক্ষেপতঃ কোন প্রকৃতির কেমন ক্রিয়া ও আচরণ তাহার উল্লেখ করাযাইতেছে।

সত্ত্বগুণ প্রধান মনের লক্ষণ।

“ আন্তিকাং প্রবিত্তজ্যাহভাজন মনুষ্যাপচ তথ্যং বচঃ

মেধাবুদ্ধিধ্বত্তিক্রমাশ্চ করুণা জ্ঞানঞ্চ নির্দম্বতা ।

কর্মানিন্দিতং স্পৃহশ্চ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সর্দৈবাদ-

রাদেতে সত্ত্বগুণাধিতস্ত মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ ॥ ”

ভাব প্রকাশঃ ।

আন্তিকা, প্রবিত্তজ্য ভোজন ( পবিত্র ভোজন অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতিকে প্রদানান্তর যজ্ঞাবশেষ ভোজন ) অক্রোধ, সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি, ইতি, ক্রমা, করুণা, জ্ঞান, ( আত্মজ্ঞান ) নির্দম্বতা, অনিন্দিত কর্ম্ম, নিকাম, বিনয় ও ধর্ম্ম এই সকল গুণ সতত সত্ত্বগুণ প্রধান মানসে বিচরণ করে, ইহা জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছেন ॥

রজোগুণ প্রধান মনের লক্ষণ ।

“ ক্রোধস্তাড়ন শীলতা চ বহলং দুঃখং স্পৃধেচ্ছাধিক।

দগুঃকামুকতাপ্যলীক বচনঞ্চাধীরতাংকৃতিঃ ।

ঐশ্বর্য্যাভিমানিতাতিশয়িতানন্দোদিকশ্চাটনং

প্রখ্যাতাহি রজোগুণেন সহিতৈস্তেতেগুণাশ্চেতসঃ ॥ ”

ভাব প্রকাশঃ ।

চিন্তে রজোগুণাবল্যে নিম্নলিখিতগুণ সমস্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রোধ, তাড়নশীলতা, বহু দুঃখ, অধিক বিষয় স্পৃহাসনা দম্ব, কামুকতা, অলীকবচন অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্যাতির অতিমানে অতি আত্মাদ ও পর্যটন।



তমোগুণ যুক্ত মনের লক্ষণ ।

“নাস্তিক্যং সুবিষয়তাতিশয়িতালস্যং চ দুষ্টমতিঃ ।

প্রীতির্নিদ্দিত কৰ্ম্ম শৰ্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাহর্নিশম্ ।

অজ্ঞানং কিল সৰ্ব্বতোহপি সততং ক্রোধাক্রতা মূঢ়তা ।

প্রখ্যাতাহি তমোগুণের সঙ্গিত সৈতে গুণাশ্চেতসঃ ।

ভাব প্রকাশঃ ।

নাস্তিক্য, সুবিষয়তা, অতিশয় আলস্য, দুষ্টমতি, নিদ্দিত কৰ্ম্মকে স্থখজনক বুদ্ধিয়া তাহাতে প্রীতি, সতত নিদ্রালুতা, সৰ্ব্ব বিষয়ে অজ্ঞান, সৰ্ব্বদা ক্রোধাক্রতা ও মূঢ়তা তমোগুণ প্রধান মানসে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দেহীর উক্তগুণত্রয় বিদ্যমান আছে। যাহাতে যে গুণের আধিক্য তিনি তৎপ্রকৃতিক বলিয়া কথিত হন।

“তত্র প্রভূত সত্ত্বস্ত সাত্ত্বিকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।

রাজসস্তামসশ্চৈব ত্রিবিধাগুণ মানবঃ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

ঐ সকল গুণের মধ্যে প্রভূত সত্ত্বগুণাবিত ব্যক্তি, সাত্ত্বিক, তদ্রূপ রাজস ও তামস ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক্ ঐরূপ মানব সকলের কিরূপ আহারে রুচি হয়।

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ॥”

ভগবদ্বাক্যতা ।

বাহা আহার করিলে আয়ুঃ, চিন্তের স্বেচ্ছা, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবৰ্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিককাল শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা বিকট বা উৎকট গন্ধযুক্ত নহে তাদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

“কটুপ্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরূক্ষ বিদাহিনঃ ।

আহারা রাজস স্যেষ্ঠা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ ॥”

ভগবদ্বাক্যতা ।

যেসকল দ্রব্য অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবন যুক্ত, অত্যধিকবীৰ্য্য, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরিক্তাকারক এবং উত্তাপ বিবৰ্দ্ধক তাহা রাজস প্রকৃতির প্রিয় । এইরূপ আহারদ্বারা হৃৎ শৌক ও নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে ।

“ যাতস্যাসং গত রসং পুতি পশু্যনিতঞ্চ বৎ ।

উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামসুপ্রিয়ম্ । ”

ভগবদ্বাক্যে ।

যাহা অর্ধপক, বিরসতাপ্রাপ্ত, পুতিময়, ( দুগন্ধি ) পশু্যনিত ( বাসি ) উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য, তাহা তামস লোকের প্রিয় ।

আমরা কার্য্য সৌকর্য্য জন্য আরও হইটী কথা বলিয়া রাখি ।

আহার্য্য দ্রব্যের রস ষড়বিধ ।

“ মধুরো লবণস্তিক্তঃ কষায়োহম্লঃ কূটস্থথা । ”

১ মধুরো, ২ লবণ, ৩ তিক্ত, ৪ কষায়, ৫ অম্ল ও ৬ কটু । যাহা ঝাল তাহাই কটু, যথা কটু তৈল ( সার্বপতৈল )

“ কটুস্ত তীক্ষ্ণ সংজ্ঞঃ স্যাৎ নদীচাদৌ সচেয্যতে ” ।

আহার ও ষড়বিধ ।

“ আহারং ষড়বিধং চুযাং পেয়ং লেহস্তথৈবচ ।

ভোজ্যস্তক্ষ্যস্তথাচৰ্য্যং গুরু বিদ্যাৎবথোত্তরম্ ॥ ”

ভাব প্রকাশ ।

১ চুযা, ২ পেয়, ৩ লেহ, ৪ ভোজ্য, ৫ তক্ষ্য, ও ৬ চৰ্য্য । ইহাদের একটি হইতে অপরটী ক্রমে গুরু । চুযা যথা—ইক্ষু দাড়িমাди । পেয়—পানক শর্করোদকাদি । লেহ—রসাল কপিখাদি । ভোজ্য—ব্যঞ্জন প্রভৃতি । তক্ষ্য—লড্ডুক মোদকাদি । চৰ্য্য—চিপটক চণকাদি ।

কতিপয় লোক গোধূম্যঃ আতপতগুল, দ্বত দুগ্ধ শর্করা প্রভৃতি খাদ্যে অনুরক্ত, কেহ মাংস ও অতি তীব্র উপহার ( বাটনা মসলা প্রভৃতি ) সংযুক্ত স্থপাদি বা পলাশ প্রভৃতি আম্র বা রুম্বা বীজ-কীটাদি আহারে সোৎসুক, কেহ বা অমেধ্যোদ্ভব কপি, শালগম, মোদক বিপনির পশুষিত মিষ্টান্ন, এবং বিপনির উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণে ব্যাকুল । পাঠক ! এই ত্রিবিধ

খাদ্য গ্রহণের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলে তোমার কোন্টী প্রিয় হইবে? যদি সাত্ত্বিক হও তবে আতপ তণুল কাচকলা দ্ব্যত, দুধাদি, যদি রাজস হও পলাশাদি, আর যদি তামস হও তবে সস্তর অন্ন-বিপণিতে গমন পূর্বক সদ্য উদর পূরণ করিয়া বাষ্পীয় শকটে আরোহণ কর। সদ্যই গৌরাজ দর্শনে ও স্পর্শনে পুনর্কিত তনু ও অস্তিমে খেত বৈপায়ন ধাম লাভ হইতে পারিবে। আশু প্রীতিকর আহারে উদর পূর্ণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। লোভ অশেষ অনর্থের হেতু, পরিণাম দর্শনে কার্য্য বিচার, বুদ্ধিমান আর্থ্যের কার্য্য। অতএব সকলেরই সাত্ত্বিক আহার করা উচিত এবং সত্ত্ব প্রকৃতিক হওয়া কর্তব্য। কেননা “সত্ত্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানম্”। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

“নাবেদবিদ্বানুতেতমিতি” শ্রুতিঃ

“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু গতি” শ্রুতিঃ

“মুক্তিস্ত ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা”

পঞ্চবঙ্গী।

জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তাহাই মানবের প্রর্থনীয় ও পরম পুরুষার্থ। জ্ঞানের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইলে সাত্ত্বিক আহার করিতে হইবে, স্তূতরাং আহারের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উহা আরও বিশদ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

প্রাণিগণের আহার গ্রহণ স্বাভাবিক। কারণ, আহার ভিন্ন জীবন থাকে না। আহার গ্রহণ করিতে হইলে সেইরূপ আহারই গ্রহণ করা উচিত বাহাতে শরীর ও মন পবিত্র থাকে, দেহধাতু সংরক্ষিত হয়, খাদ্যগুলি সুখাদ্য সারবান হয়, এবং সহজে জীর্ণ হইয়া শরীর কার্য্যে বিনি-  
 যোজিত হয়। আবার সেই দেহ ও দেহজ বলরক্ষণার্থ অল্প প্রাণি-  
 হনন না করিয়া, অস্ত্রের ক্ষতি না জন্মাইয়া, সারবান আহার ক্রহণ করা  
 বিধেয়। আপাততঃ আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন আশু প্রীতিজনক বিষয়ে  
 সহজে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময়ই তাহাতে অশেষ অকল্যাণ জন্মে। কোন্  
 সময় কোন্ বিষয়ের প্রতি নিরাকান্স হইতে হইবে আমাদের ততদূর  
 অতিজ্ঞতা নাই। স্তূতরাং শাস্ত্র ও শিষ্টবুদ্ধির অনুসরণ আবশ্যক। বাহা  
 মেধ্য সারবান, রুচিকর, ও চিস্ত চাক্ষু্যের পরিপন্থী তাহাই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

আবার উহার ভিত্তিতে অপর কণ্ঠস্বর নাই। উহার বাক্য  
অপেক্ষা হয়। সময়ের সহিত ও সম্পর্ক আছে। সময় মত, পরিমাণানুসারে  
উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিতে হইবে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করি-  
বেন। উহার ব্যতিক্রমে ভোজন করিলে বিষমামন হয়।

“বহু স্তোকমকালে চ অশনং বিবমাশনম্”

বৈদ্যক শাস্ত্র।

ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ না হইলে ভোজন করাও মহান দোষ।  
এরূপ ভোজনকে অধ্যশন বলে।

“অজীর্ণে ভুক্ত্যন্তে যত্ত্ব তদধ্যশনমুচ্যতে,

ভাব প্রকাশঃ।

এতদ্ভিন্ন বিরুদ্ধাশনও পরিত্যজ্য। কোন দ্রব্য দ্রব্যস্তরের সহিত  
সংযুক্ত হইলে বিরুদ্ধ হয়। যথা—

“সংযোগ বিরুদ্ধঃ”

“মৎসমানুপ মাংসঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবর্জয়েৎ।

কপোতং সার্বপন্নেঃ ভাজ্জ্বত্পরিবর্জয়েৎ।

মৎস্যানিক্ষেপিকারেণ তথা ক্ষৌদ্রেণ বর্জয়েৎ।

শত্নু মাংস পয়োযুক্তানুক্ষেপং বিবর্জয়েৎ।

উকৈর্নভোহস্থনা ক্ষৌদ্রেণ পারসং কুশরাষিতম্।

রস্তাকলং ত্যজেৎ তক্রে দধি ববফলাষিতম্।

দশাহমুষিতং সর্পিঃ কাংসো মধু স্মৃতং সমম্।

কৃতান্নঞ্চ কষায়ঞ্চ পুনরুক্ষীকৃতং ত্যজেৎ।

একত্র বস্তমাংসানি বিরুদ্ধান্তে পরস্পরম্।

মধুসর্পির্বসা তৈল পানীয়ানি যথা তথা। \* ভাব প্রকাশঃ।

হৃদযুক্ত মৎস্য \* ও মাংস বর্জন করিবে। সার্বপ-তৈল-ভাজিত কপোত

\* মূলে আদুপ বস্তু আছে আমরা সামান্যতঃ মৎসাই নির্ধার্য।

“হলে চরাঃ প্রবাস্তাপি কোণহাঃ পাদিনস্তথা।

মৎস্য একে সমাখ্যাতাঃ পুণ্যানুপ্রজাতয়াঃ।

ভাব প্রকাশঃ।

পরিভাজ্য । শুড়, চিনি ও মধুযুক্ত প্রভৃতি মংস্য বজ্রন করিবে । মাংস বা হৃদযুক্ত শলু (ছাতু) এবং উষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত দধি পরিবর্জনীয় । উষ্ণদ্রব্য বা নন্ত জল যুক্ত মধু এবং পায়স ও খিচুরী সংযুক্ত হইলে বিরুদ্ধ হয় । ঘোলে কদলী, ও বিস্ত্রে দধি বিরুদ্ধ । কাংসপাত্রে স্থত মধু রাখিলে তাহা যেমন বিরুদ্ধ, তেমন দশদিনের অধিক স্থত রাখিলে তাহাও বিরুদ্ধ হয় । অন্ন ও কষায় একবার প্রস্তুত হইলে পুনরবার উষ্ণ করিলে বিরুদ্ধ হয় । বহুমাংস একত্র হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয় । মধুসর্পিবসা তৈল ও পানীয় হইলে ষথাতথা বিরুদ্ধ । \*

### বিরুদ্ধাশনের ফল ।

“ব্যাধিমিস্তেষু দৌর্বল্যং মরণঞ্চাধিগচ্ছতি ।

বিরুদ্ধরস বীৰ্য্যাণি ভুঞ্জানোনাশ্চবান্নরঃ ॥”

বিরুদ্ধরস ও বিরুদ্ধবীৰ্য্য দ্রব্যাহারে ব্যাধি, ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য ও মরণ হয় । আশ্ববান্ (মনদী, জ্ঞানবান্ ইত্যাদি) হওয়া ত ষটেই না ।

‘স্থতস্তৈলঞ্চ পানীয়ে, কষায়ং ব্যঞ্জনয়াদিকম্ ।

পক্ত শীতীকৃতং চোক্ষং তৎসর্ঙ্গংস্যাধিষোপমম্ ॥”

পানীয়ে, স্থত ও তৈল, ও কষায়, ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া একান্ত শীতল অথবা উষ্ণাবস্থা, বিবেক তুল্য হয় ।

### স্বভাবতঃ হিত ।

“শালীনাং লোহিতঃ শালি যষ্টিকেষু চ যষ্টিকা ।

শুকধ্যানেষাপি যবো গোধূমঃ প্রবরো মতঃ ॥

শমীধান্যে বরো মুদ্গো মাস্তুরশ্চাটকীতথা ।

রসেসু মধুরঃ শ্রেষ্ঠো লবণেষু চ সৈন্ধবম্ ।

দাড়িমামলকহ্রাস্কা খৰ্জুরঞ্চ পুরুষকম্ ।

রাজাদনং মাতুলুদং ফলবর্গেষু শম্যতে ॥

\* ইহার অনুবাদে সন্দেহ আছে ।

পত্রশাকেষু বাস্তুকং জীবন্তী পোতিকা করা ।

পটোলং ফলশাকেষু কন্দশাকেষু মূরগম্ ।

এণঃকুরঙ্গো হরিণোজ্জলৈষু প্রশস্যতে ।

পক্ষিগাং তিভিরিলাবো বরোমংস্যোষু রোহিতঃ ।

হরিণ স্তাত্রবর্ণঃস্যাৎএণঃ কৃষ্ণতর্যামতঃ ।

কুরঙ্গ স্তাত্র উদ্ভিষ্টো হরিণাকৃতিকোমহান্ ।

জলৈষু দিব্যং দুক্ষেষু গম্যাজ্যোষু গোরসম্ ।

তৈলেষু তিলজ্জৈল মৈক্ষ্যবষুগিতা হিতো ॥

“শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহঃ সত্বং ধান্য মুচ্যতে” । স্মৃতিঃ । অতএব মাংস্য, মটর, যব, গোধূম, কর্তৃতি, সকলই ধান্য । অধুনা ধান্যশার কেবল শালি জাতিই ব্যবহৃত হয় । উপরিণিখিত বচনগুলি আবৃত্তি মাত্রেই উহার প্রতীতি হইতে পারে ।

শালির মধ্যে লোহিত শালি, ষষ্ঠিকর ষষ্ঠিকা (ষেটেধান), শুকধান্যের মধ্যে যব ও গোধূম শ্রেষ্ঠ । শমীধান্যের মধ্যে মুগ, মধুর আড়কী (রহর বা অরহর) ; রসের মধ্যে মধুর রসা ববণে সৈন্ধব, ফলে দাড়িম, আমলক, ডাঙ্কা, খজুর, পরুষক (পরুযা), রাজাদন (পিয়াল), ও মাতুলঙ্গ (লেবু-বিশেষ) প্রশস্ত । পত্রশাকের মধ্যে বেতুয়া শাক জীবন্তী ও পুইশাক শ্রেষ্ঠ । ফলশাকে পটোল, কন্দশাকে মূরগ (ওল) জঙ্গলের মধ্যে এণব কুরঙ্গ ও হরিণ প্রশস্ত । হরিণ জাতীয়ের মধ্যে তাত্রবর্ণ গুলি হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ গুলি এণ, অতি বৃহৎ তাত্রবর্ণ হরিণ কুরঙ্গ । পক্ষিগণের মধ্যে তিভিরি ও লাব । মংস্যে রোহিত শ্রেষ্ঠ । জলের মধ্যে দিব্য জল, দুষ্কের মধ্যে গোহৃক্ষ, আজ্যে গব্যদুহতং তৈলে তিল তৈল, ইক্ষুজাত -পদার্থে শর্করা প্রশস্ত ।

স্বভাবতঃ হিত ।

শমীষু মাষান্ গ্রীষ্মর্তো লবণেষ্ট্রৌষরং তাজ্যেৎ ।

ফলেষু লকুচং শাকেসার্ষপং নহিতং মতম্ ।

গোমাংসংগ্রাম্য মাংসেবু নহিতা মহিষী বসা ।

মেঘীপয়ঃ কুশুম্ভস্য তৈলস্তু্যাক্যঞ্চ কণিতন্ ।”

ভাব প্রকাশঃ ।

গ্রীষ্মকালে শমী জাতির মধ্যে মাষ, লবণে ঔষর (স্কার লবণ) ফলে লকুচ (তেহরা), শাকের মধ্যে সার্ষপ শাক অহিত। গ্রাম্য মাংসের মধ্যে গোমাংস স্বভাবতঃ অহিত। মহিষী বসা হিত নহে। দুগ্ধের মধ্যে মেঘী দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুশুম্ভ ফুলের বিচির তৈল, ও ফণিত স্বভাবতঃ অহিত। ইক্ষুরস পাকে অর্দ্ধমন হইলে ফণিত হয়।

বাহুল্যভয়ে আর লিখিত হইল না। স্থলভাবে সংক্ষেপে লেখা হইল। আরও সংক্ষেপে বলিতে হইলে ত্রিবিধ অন্নদোষের প্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যথা

“অন্নদোষ ত্রিবিধঃ দৃষ্ট দ্বারকঃ, অদৃষ্টদ্বারকঃ, দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারকঃ। দৃষ্টদ্বারকঃ আয়ুর্বেদোক্তঃ। অদৃষ্টদ্বারকঃ স্মৃত্যুক্তঃ। উভয়োক্তস্ত বলে বৎসা বিবৎসা দুগ্ধাদিদোষো দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারকঃ।” স্মৃতিঃ

আয়ুর্বেদোক্ত দোষ স্মৃত্যুক্ত দোষ অদৃষ্ট দোষ, উভয়োক্ত দোষ দৃষ্টাদৃষ্ট দ্বারক। এই ত্রিবিধ দোষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। তন্মধ্যে স্মৃত্যুক্ত দোষ পরিহার না করিলে মৃত্যুভঙ্গি হয় না। বরং পাপজরোগ-জন্মে, বেদানুগত স্মৃতি সর্বথা মাত্র আয়ুর্বেদে পথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসককেও ধর্মশাস্ত্রানুশাসন যথাসাধ্য পালন করিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে। এইজন্য “সত্যধর্ম পরোষষ্ঠ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।

ক্রমশঃ

## গ্রাহকদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন ।

বারে বারে একটি, দুইটি করিয়া তিনটি বৎসর কাটিবার উপক্রম হইল । আর একটি বাস পত্রই বেদব্যাসের তিনটি বৎসর পূর্ণ হইবে । এই তিন বৎসর আমরা বাসপত্র পাঠকগণের সাহায্য সাধনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি ; কেবল বর্তমান বর্ষে এককালীন কতকগুলি সদচুষ্ঠনের সূত্রপাত হওয়ায় বেদব্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি ক্রটি হইয়াছে । সে সমস্ত ক্রটি আমরা নিজের বুদ্ধিতে পারিষাও অনিবার্য কারণে উহার সংশোধন করিতে পারি নাই । সেই জন্য গ্রাহকগণের নিকটে অনেকটা ক্ষমিত হইয়াছি । বাহাতে বেদব্যাসের কার্য সম্বন্ধে আর কোনরূপ গোলযোগ না হয় তজ্জন্য আমরা এবার হইতে বিশেষ যত্নবান হইব । আমরা অন্যান্য সমস্ত কার্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া বেদব্যাসের সেবা ভীষণ উৎসর্গ করিতে কৃহসংকল্প হইয়াছি । অতএব আমরা বিশেষ ভরসা করি যে আগামী বর্ষে বেদব্যাসের নানাবিধ সংশোধিত দেখিয়া পাঠকগণ সুখী এবং অনুরাগী হইবেন । কিন্তু বেদব্যাসের সমস্ত উদ্দেশ্যই গ্রাহকগণের অনুরাগ ও অনুকম্পার উপর নির্ভর করে । আমাদের মৌভাগ্যের বিষয় যে, অদ্যাবধি বেদব্যাসের কোন গ্রাহকই তাঁহাদের দের্য হৃদয় না দিয়া বেদব্যাসকে বিব্রত করেন নাই । এখন আমাদের বিনীত অনুরোধ যে গ্রাহকগণ পুর্কোর-স্থায় ওঁতাবী গুণ উৎসাহিত হইয়া সমস্ত বেদব্যাসের আগামী বর্ষের প্রাপ্য টাকা প্রেরণ করেন । আমাদের নিরম ৩০ শে চৈত্র পক্ষান্তে কেবল ১/ হিসাবে গ্রাহক পত্র হইবে । তাৎপরে আর কিছুতেই ওরূপ হিসাবে বন্দবস্ত হইবে না ; তখন সমস্ত ২/ টাকা করিয়া দিতে হইবে । ইহা যেন স্মরণ থাকে ।

শেষে বেদব্যাসের মঙ্গলীকাখ্য দিগের প্রতি আমাদের সন্তানর নিবেদন যে, তাঁহার যেদপ বেদব্যাসের প্রতি অনুরাগী ভূক্তপ বেদব্যাসের কল্যাণের জন্য কখন চেষ্টা করেন নাই । বেদব্যাস বাহাতে হিন্দুর প্রতি গৃহে বিরাজ করে তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত । প্রত্যেকে যদি অত্যন্ত পণ্ডিত জ্ঞান করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলেও বেদব্যাসের আরও বহুল প্রচার হয় । বেদব্যাসের কি বাহুল্য প্রচার একান্ত প্রার্থনীয় নহে ? আমরা বতদূর গুনিয়াছি তাহাতে অনেকেই এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন । সেইজন্য, সেই ভরসায় বুক বাধিয়া আমরা পূর্বতন গ্রাহকদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন বেদব্যাসের কল্যাণার্থ যথাক্রমে স্থাৰ্হ-ত্যাগ করিয়া বেদব্যাসের গ্রাহক হওয়ার জন্য যত্নপত্রিকার দেন । আমাদের বিশ্রাস তাঁহাদের সান্নাধ্য চেষ্টাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে । আমরা আশা করি গ্রাহকগণ আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া চিরবাসিত করিবেন ।













